Banglapdf.net Presents

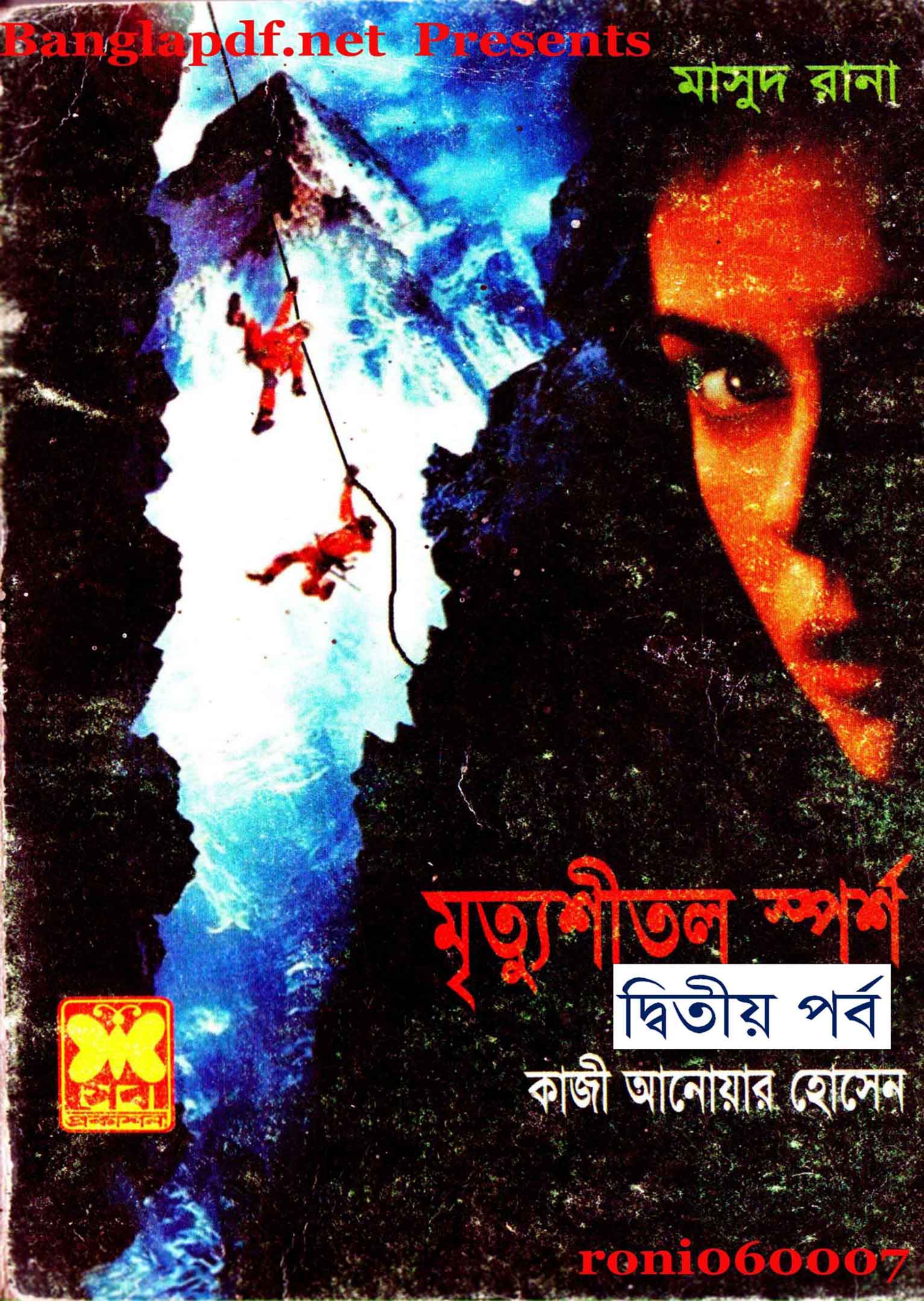

roni60007

Scanned by roni060007

মাসুদ রানা

মৃত্যুশীতল স্পর্শ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

পাঠক, তৈরি হোন রুদ্ধশ্বাস কাহিনির শেষটুকু জানার জন্য।
রুদ্র প্রকৃতি, ভয়ঙ্কর শত্রু আর নিশ্চিত মৃত্যুকে
কীভাবে ফাঁকি দেয় মাসুদ রানা, দেখতে চান? খোলস ভেঙে
লিয়া নোভাক আর দেজান জুরকিচের ভিতরে উঁকি দেবেন?
এয়ারশিপ আর সাবমেরিনের মধ্যে
টাগ-অভ-ওয়ার দেখেছেন কখনও?
স্যাটানস ফিস্ট, রাসপুটিন আর প্যান্ডোরা প্রজেক্টের
আসল রহস্য জানতে চান?
শত্রুদের বিরুদ্ধে রানার নির্মম প্রতিশোধ? আছে তো!
এসবের মধ্যে প্রমোদতরীতে পোপের ধর্মীয় মহাসম্মেলন
আসে কীভাবে? আরে, শেষ লড়াইটা তো ওখানেই!
পাতায় পাতায় চমক, সাসপেন্স আর পাগল করে দেয়া
অ্যাকশন—আছে সবই। নেই শুধু দম ফেলার ফুরসত।
সাবধান! তাই বলে শ্বাস নিতে ভুলবেন না আবার!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা ৩৮৩

মৃত্যুশীতল স্পর্শ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scanned by roni060007

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
(সেগুনবাগিচা) ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7383-5

Scanned by roni060007

এক

জিয়ো-রিসার্চ স্টেশন, গ্রিনল্যান্ড।

দুঃসংবাদটা এল হঠাৎ করে, অযাচিতভাবে। আর খুশির ঠেলায় সেটা জানাতে থেলমা শোয়ার্জ নিজেই হাজির হলো। অপরপক্ষের প্রতিবাদে তেমন বিচলিত হলো না সে, বিজয়ীর ভঙ্গিতে সবার উদ্দেশে বলল, 'তর্ক-বিতর্ক করে কোনও লাভ নেই। কমিউনিকেশন উইন্ডোটা যখন চালু হলো, তখন এখানে থাকলে আপনারাও নিজ কানে শুনতেন—জিয়ো-রিসার্চ ছাড়া বাকি সবাইকে ফিরে যেতে বলেছে ড্যানিশ সরকার। মিছেমিছি সন্দেহ করবেন না, আমি কোনও বানোয়াট কথা বলছি না।'

স্যাম র‍্যামসের চেহারা রাগে লাল হয়ে গেছে। থমথমে গলায় বলল, 'অর্ডারটা নিয়ে সন্দেহ করছি না। কিন্তু আমাদের হয়ে আপনারা কতটুকু লড়াই করেছেন, সেটাই বলুন!'

'কীসের লড়াই?' থেলমার কণ্ঠে বিদ্রূপ। দুহাত বুকের উপর ভাঁজ করা তার, পা ফাঁক করে ডাইনিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেপরোয়া ভঙ্গিতে। জেন্স মুয়েলার পাশেই আছে, তবে নিশ্চুপ। 'দুজন মারা গেছে ইতোমধ্যে, আরও দুজন মরতে বসেছিল... আর ক্যাম্প ডিকেড—যেটার জন্য আপনাদের এখানে আসা—সেটা তো এখন বরফের গায়ে স্রেফ একটা পোড়া গর্ত ছাড়া আর কিছু না।'

'বরফ খুঁড়ে আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি...'

'হাহ্। শুধু শুধু মনকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবেন না, মি. র‍্যামসে।

আপনাদের পেয়ারের মি. মাসুদ রানা, জানি না ইচ্ছে করেই, নাকি অ্যাকসিডেন্টালি আগুন লাগিয়ে ওটার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন। আর কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই ওখানে, কয়লা ছাড়া।'

দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ব্যাপারটা থেলমা উপভোগ করছে। দিনে দিনে পুরো অভিযানে কর্তৃত্ব বাড়ছে তার, মুয়েলার স্রেফ ছায়ায় পরিণত হয়েছে। সুন্দর চেহারার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে হিংস্র, নির্দয় আর ইতর এক নারী, যার ভিতরে কমনীয় বা নমনীয় বলে কিছু নেই।

আগুন লাগাবার অভিযোগটা শুনে রানা প্রতিবাদ করল না, কারণ কথাটা ও-ই প্রচার করেছে। উদ্ধার পাবার পর ববি মুরল্যান্ড আর লিয়া নোভাকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেছে—কেউ যে ওদের খুন করার চেষ্টা করেছে, সেটা জিয়ো-রিসার্চকে জানতে দেয়া যাবে না। এমনিতেই ওদের তাড়াতে উঠেপড়ে লেগেছে থেলমা, এই খবর শুনলে নিরাপত্তার অজুহাতে খেদিয়ে ছাড়বে। তা ছাড়া বোরোশিনের খুনীকে ধরার জন্য ফাঁদ পাততে হবে, মেজর রস কনওয়েরে লাশের হাত থেকে পাওয়া চিরকুটটার মর্ম উদ্ধারেও সময় প্রয়োজন... সব মিলিয়ে নিজের অসতর্কতায় অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বলে ব্যাপারটা ধামাচাপা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানা।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে কৌশলটায় তেমন কাজ হয়নি। ওদের সবাইকে এই অভিযান থেকে তাড়াবার নতুন বুদ্ধি বের করে ফেলেছে থেলমা, অন্যদের অনুপস্থিতির সুযোগে ড্যানিশ সরকারকে কী বুঝিয়েছে সে, খোদাই জানে। আদেশ এসেছে চলে যাবার।

রানার দিকে তাকিয়ে গা-জ্বালানো হাসি হাসছে থেলমা। ও প্রশ্ন করল, 'আমাদের ব্যাপারটা না হয় মানা গেল, কিন্তু ড. জুরকিচ, ডা. নোভাক আর তাঁদের টিমকে চলে যেতে হবে কেন? ক্যাম্প ডিকেড ধ্বংস হওয়ায় ওঁদের রিসার্চের তো কোনও ক্ষতি হয়নি।'

'ম্যাক্সিম বোরোশিন মারা যাওয়ার পর ওদের নেতৃত্ব দেয়ার

আর কেউ নেই, মি. রানা,' জবাব দিল থেলমা। 'ড. জুরকিচ তো সারাদিন ডরমিটরিতে বসে থাকেন। বাকি দুজন মিটিয়োরোলজিস্টও গত ক'দিনে কোনও কাজের কাজ করতে পারেনি। এসব অকর্মণ্যদের দায়িত্ব নিতে রাজি নই আমরা। আর লিয়া নোভাক? হাহ্, সে তো কোনও গবেষকই নয়, শুধু ম্যাক্সিম বোরোশিনের চাপাচাপিতে টিমে জায়গা পেয়েছিল। টিমের সবাই চলে গেলে সে আর থেকে কী করবে?'

পাল্টা জবাব দিতে গিয়ে থমকে গেল রানা, তথ্যটা একেবারেই নতুন। বোরোশিনের কথা শুনে মনে হয়েছিল, লিয়া স্বাভাবিক অ্যাপ্লিক্যান্ট হিসেবে জায়গা পেয়েছে অভিযানে। কিন্তু এখন থেলমার বক্তব্যে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা তা নয়, ওকে কৌশল খাটিয়ে আনা হয়েছে এখানে। সন্দেহটা দৃঢ় হয়ে উঠছে—যতটা দেখায়, লিয়া বোধহয় তারচেয়ে বেশি জানে এই অভিযান সম্পর্কে।

এতক্ষণে মুখ খুলল মুয়েলার। বলল, 'চেঁচামেচি করে লাভ নেই কোনও। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে, সেটা আর বদলানোর উপায় নেই। কাল সকালে ঝড় কেটে যাবার কথা, তখন রি-সাপ্লাইয়ের ডিসি-থ্রী বিমানটা এসে রেইক্ইয়াভিকে নিয়ে যাবে আপনাদের।'

'আবহাওয়ার পূর্বাভাসটা কে দিয়েছে, জানতে পারি?' খোঁচা মেরে বলল মুরল্যান্ড। 'সেই লোক নয়তো, যে হারিকেনের ভিতর ডা. নোভাকসহ চপারটাকে ওড়ার ক্লিয়ারেন্স দিয়েছিল?'

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওর দিকে তাকাল থেলমা, চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে, তবে কোনও কথা বলল না।

জেন্স মুয়েলার কী দেখে এই মেয়ের প্রেমে পড়েছিল, ভেবে পাচ্ছে না রানা। লোকটা শান্ত-শিষ্ট, ভদ্র স্বভাবের; কিন্তু থেলমার আচরণ স্বৈরাচারীর মত, নারীসুলভ কোনও গুণই নেই তার ভিতর। এমন একটা মেয়েকে কেউ ভালবাসতে পারে বলে মনে

হয় না। মুয়েলার অবশ্য বলেছে, জিয়ো-রিসার্চের নতুন মালিকের সঙ্গে মেশার পর থেলমা অনেক বদলে গেছে, আগে এমন ছিল না, তারপরও সন্দেহ থেকে যায়—একজন মানুষ আর কতই বা বদলাতে পারে!

এলোমেলো চিন্তাটা তাড়াতাড়ি মাথা থেকে দূর করল ও, হাতের সমস্যাটায় মনোযোগ দেয়া দরকার আগে। দলনেতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যাম, আপনিই তো লিডার। বলুন, কী করতে চান।'

'বাবা ব্যাপারটায় একদমই খুশি হবে না,' স্যামের গলায় পরাজয়ের সুর। 'এক্সপিডিশনটার পিছে অনেক টাকা ঢেলেছে কি না! কিন্তু এটাও সত্যি—ক্যাম্প ডিকেড ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এখানে আমাদের আর কোনও কাজ নেই।'

'ববি?'

'আমি বলব এখানে খুঁটি গেড়ে পড়ে থাকতে,' নির্বিকার ভঙ্গিতে মত দিল মুরল্যান্ড। 'আমাদের পরিচিত লোকজনের অভাব নেই। আরেকবার কমিউনিকেশন উইন্ডো খুললে ড্যানিশ সরকারের সঙ্গে নিজেরাই বোঝাপড়া করে নিতে পারব।'

কথাটা শুনে ফুঁসে উঠল থেলমা। রানা নিজের মত দেয়ার আগেই চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে কী এত ভোটাভুটি করছেন আপনারা? কে কী বলল, তাতে কিচ্ছু যায় আসে না। সকালে প্লেন এলে অবশ্যই আইসল্যান্ডে ফিরতে হবে আপনাদের। নিজ থেকে না গেলে জোর করে পাঠানো হবে।'

হুমকিটা দিয়েই খালাস, কারও মতামত শোনার অপেক্ষা করল না থেলমা। উল্টো ঘুরে গটমট করে হেঁটে বেরিয়ে গেল মেস হল থেকে। বিষণ্ন দৃষ্টিতে সার্ভেয়ার্স স্যোসাইটি টিমের দিকে তাকাল মুয়েলার, কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল, তারপর সঙ্গিনীকে অনুসরণ করল।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কাটল। ডিনারের জন্য আশপাশের

টেবিলে বসা সবাই আগ্রহ নিয়ে বাক-বিতণ্ডা শুনছিল, এখন আবার সোজা হয়ে খাওয়া-দাওয়া করছে। ভাবখানা এমন, যেন কিছুই হয়নি। মুরল্যান্ড আর স্যামও নিশ্চুপ।

'আমার কফি দরকার,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা।

রান্নার দায়িত্বে নিয়োজিত দুই অ্যাসিসটেন্ট শেফের সঙ্গে গত কয়েকদিনে ভালই খাতির হয়ে গেছে ওর। দুজনই নারী, প্রথমজন অল্পবয়েসী, টেনেটুনে চব্বিশ-পঁচিশ হতে পারে বয়স, নাম হেইডি শুলৎজ। প্যান্ট্রিতে পৌঁছুতেই মেয়েটা নিঃশব্দে ইশারা করল ওকে, তার পিছু পিছু কিচেনে ঢুকতেই দেখল দ্বিতীয়জনও দাঁড়িয়ে আছে—মোটাসোটা শরীরের সিলভিয়া বার্ক, হেইডির চেয়ে অন্তত দশ বছরের বড় সে।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা।

'খবরটা আপনার জানা থাকা দরকার, হের রানা,' বলল সিলভিয়া। 'কাল আপনাদের সঙ্গে আমাদের দুজনকেও ফেরত পাঠাচ্ছে ডাইনীটা। জিয়ো-রিসার্চ ছাড়া আর কোনও লোক থাকবে না এখানে।'

'মানে?' রানা অবাক হলো। 'তোমরা জিয়ো-রিসার্চের কর্মচারী নও?'

'জী না, শুধু হেড শেফ ওদের লোক,' বলল হেইডি। 'আমরা মিউনিখের একটা কমার্শিয়াল ক্যাটারিং কোম্পানিতে কাজ করি, এখানে কন্ট্র্যাক্টে এসেছি।'

কী ঘটছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। 'তারমানে আগামীকালের পর এখানে রেগুলার জিয়ো-রিসার্চ স্টাফ ছাড়া আর কেউ থাকছে না?'

'ঠিক ধরেছেন।'

ড্যানিশ সরকার এটাই হতে দিতে চায়নি—একা একটা টিম, সেজন্য সার্ভেয়ার্স সোসাইটি আর মিটিয়োরোলজিস্টদের ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল এদের সাথে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিয়ো-রিসার্চ

একাই থাকছে, আর কেউ নয়। কেন, কী এদের উদ্দেশ্য, যেটা অন্যদের সামনে ফাঁস হতে দিতে চায় না?

'তোমাদের ধন্যবাদ, ভাবনার একটা খোরাক দিয়েছ,' দুই শেফকে বলল রানা, তারপর কফি নিয়ে ফিরে এল টেবিলে।

'কী হয়েছে, রানা?' ওকে চিন্তিত দেখে প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড।

'এখানে বড় ধরনের একটা গোলমাল আছে, ববি,' বলল রানা। 'আমরা থেকে যেতে পারলে খুব ভাল হতো।'

ক্যাম্প ডিকেডে কী কী ঘটেছে, তা মুরল্যান্ডকে বলেছে ও, তবে স্যাম জানে না কিছু, সে এখনও অন্ধকারে। বোকা বোকা কণ্ঠে জানতে চাইল, 'কীসের গোলমাল?'

'আগুনটা দুর্ঘটনা ছিল না,' বলল রানা।

'আপনি ওটা ইচ্ছে করে লাগিয়েছেন?' স্যামের গলায় অবিশ্বাস।

'আমি লাগাইনি।'

'আপনি নন... ডা. নোভাক?'

'লিয়া সারাক্ষণ আমার সঙ্গে ছিল, সে-ও লাগায়নি।'

'তা হলে কে লাগিয়েছে?'

'যে ম্যাক্সিম বোরোশিনকে খুন করেছে। আমাকে আর লিয়াকেও মেরে ফেলতে চাইছিল।'

স্যামের চোয়াল ঝুলে পড়েছে। 'মি. বোরোশিন খুন হয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। লাশের শরীর আর ক্যাম্প ডিকেডের ভিতর কী কী আলামত পাওয়া গেছে, সব খুলে বলল ও। সবশেষে নিজের ধারণার কথা জানাল, 'খুনী সম্ভবত আমাকে আর লিয়াকে লাশ পরীক্ষা করতে দেখেছে, আড়ি পেতে কথাও শুনে থাকতে পারে। তারপর যখন ক্যাম্প ডিকেডে গিয়ে ঢুকলাম, তার সন্দেহ হলো—খুনটা প্রমাণের জন্য গেছি আমরা। সেজন্যই আগুন লাগিয়ে আমাদের মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে।'

'আপনি এসব প্রমাণ করতে পারবেন?'

'কঠিন,' বলল রানা। 'ক্যাম্প ডিকেড ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় মার্ডার সিনটা হারিয়েছি আমরা। লাশটা যদিও আছে, খুনের হাতিয়ার না পাওয়া পর্যন্ত ওটা দিয়ে কিছু প্রমাণ করা যাবে না।'

'তারমানে কাউকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না অভিযোগটা।'

'আরেকটা পথ অবশ্য আছে...' চিন্তিত গলায় বলল রানা, ফিরল মুরল্যান্ডের দিকে। 'ববি, আগুন নেভানোর সময় বেসের মেইন এন্ট্র্যান্সে কোনও তালা বা শিকল দেখেছ? আমি শিয়োর, খুনী দরজাটা আটকে দিয়েছিল, যাতে আমরা বেরুতে না পারি।'

মাথা নাড়ল মুরল্যান্ড। 'ধোঁয়া এত বেশি ছিল যে অ্যাকসেস শাফট ধরে নামতে পারিনি। তোমরা যদি গ্যারাজে না যেতে, তা হলে উদ্ধার করে আনার কোনও উপায়ই ছিল না।'

'শিট!' টেবিলে সখেদে কিল বসালো রানা। 'আগেই মাথায় আসা উচিত ছিল ব্যাপারটা। এতক্ষণে শিকল-তালা সরিয়ে ফেলেছে খুনী, আগুন নেভার সঙ্গে সঙ্গে গেলে পাওয়া যেত ওগুলো। তখন অন্তত সবাইকে বোঝাতে পারতাম, আমাদের খুন করতে চেয়েছে কেউ।'

'যা হবার হয়ে গেছে,' সান্ত্বনা দিল মুরল্যান্ড। 'এখন কী করা যায়, তা-ই বলো। জোর করে থাকার চেষ্টা করব এখানে?'

'তাতে খামোকা একটা বিরাট ঝামেলা দেখা দেবে, ড্যানিশ সরকারেরও সমর্থন হারাব। তারচে' চলে যাই, এখান থেকে তো সোলার ম্যাক্সের কারণে কারও সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না, আইসল্যান্ডে গিয়ে কথা বলব সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে, বিসিআই বা নুমা-র সাহায্যও নেয়া যাবে প্রয়োজন হলে। ড্যানিশ সরকারকে কনভিন্স করে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে পারব বলে বিশ্বাস আছে আমার।'

'কেন ফিরে আসতে চাচ্ছেন, জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল স্যাম।

'জিয়ো-রিসার্চ তলে তলে কিছু একটা করতে যাচ্ছে; স্যাম। অবৈধ কিছু... যেটা অন্যদের জানতে দিতে চায় না। সেজন্যই সবাইকে তাড়াচ্ছে এখান থেকে। খুন করতেও দ্বিধা করছে না। এইমাত্র শুনে এলাম, জিয়ো-রিসার্চের পার্মানেন্ট স্টাফ নয় বলে সিলভিয়া আর হেইডিকেও নাকি চলে যেতে হবে কাল। ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমি দেখতে চাই, এরা আসলে কী করছে।'

'যা খুশি করুক, তাতে আমাদের কী?'

'অন্যায় স্বেচ্ছাচারিতা পছন্দ নয় আমার,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'বোরোশিন আমার ঘনিষ্ঠ কেউ না হতে পারে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, ওর খুনীকে এমনি এমনি ছেড়ে দেব। তা ছাড়া কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করে পার পেয়ে যাবে, সেটাও হতে দেয়া যায় না।'

'ঠিক বলেছ,' মুরল্যান্ড একমত হলো।

'আপনারা তো দেখি রীতিমত গোঁ ধরে বসে আছেন!' বিস্মিত গলায় বলল স্যাম। 'খুন-স্যাবোটাজ... এগুলো পুলিশি ব্যাপার। আমরা সরাসরি কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট দিলেই তো পারি। সেধে নিজেদের ঘাড়ে ঝামেলা নেয়া কেন?'

'এরা ব্যক্তিগতভাবে আমাদের টার্গেট করেছে, স্যাম,' বলল রানা। 'চ্যালেঞ্জ দেখে পিছু হটি না আমরা, দাঁত ভাঙা জবাব দিই। আপনার যদি আপত্তি থাকে তো দেশে ফিরে যেতে পারেন।'

রানা আর মুরল্যান্ডের দৃঢ়তা স্যামের উপরেও প্রভাব ফেলল। হাসিমুখে সে বলল, 'তা হলে এটাই মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যান্ডের সত্যিকার চেহারা? মি. ডেমেস্কো আমাকে আগেই আপনাদের ব্যাপারে জানিয়েছেন। কিচ্ছু ভাববেন না, আর যা-ই করি, লেজ গুটিয়ে পালাব না। আমি আপনাদের সঙ্গে আছি।'

'হুট করে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবেন না,' সতর্ক করে দিল রানা।

'আরও অনেক কিছু ঘটেছে এর মধ্যে, সেগুলো আগে শুনে নিন, তারপর আস্তে-ধীরে ঠিক করুন কী করবেন।'

একে একে এলমার গুডজনসেনের মৃত্যু, রোজালিন গুডজনসেনের সতর্কবাণী, মেজর রস কনওয়েের শরীরে পাওয়া তেজস্ক্রিয়তা... সব খুলে বলল রানা। শুনে চিন্তায় ডুবে গেল স্যাম।

মেস হলের দরজা খুলে গেল এই সময়, তুষার মোড়া অবস্থায় ভিতরে ঢুকল লিয়া, গায়ের পারকা থেকে বরফ ঝাড়ল, খুলে ফেলল মুন বুট। এক কাপ কফি নিয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিল সে। চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'চেহারা এত মলিন কেন আপনাদের?'

'ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া হচ্ছে আমাদের,' বলল স্যাম।

চকিতে রানার দিকে তাকাল লিয়া। 'আগুনের জন্য?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তুমিও যাচ্ছ। যাচ্ছে দেজান সহ পুরো টিমটাই।'

'কী! কেন?' চোখে রাগ ফুটল লিয়ার। 'অগ্নিকাণ্ডে আমাদের তো কোনও ক্ষতি হয়নি। মগের মুলুক নাকি... চাইলেই বের করে দেবে? আমি কোত্থাও যাচ্ছি না। এসব কার আইডিয়া?'

'থেলমা বলে গেল, অর্ডারটা নাকি ড্যানিশ সরকার দিয়েছে।'

'আপনারা নিজ কানে শুনেছেন এই অর্ডার?'

'না, তখন ওরা ছাড়া কেউ ছিল না।'

'তা হলে কনফার্ম হচ্ছি না কেন?'

'বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, কমিউনিকেশন ওই অল্প সময়ের জন্য চালু হয়েছিল,' তিক্ত গলায় বলল মুরল্যান্ড। 'এখন আবার বন্ধ।'

'ব্যাপারটা ওদের জন্য বড্ড কনভিনিয়েন্ট হয়ে গেল না?' ভুরু কোঁচকাল লিয়া।

ঘাড় ফিরিয়ে মেস হলের কোনায় বসানো রেডিও সেটটার

দিকে তাকাল রানা। অপারেটর সরিয়ে নিয়েছে থেলমা, যেন আর কোনও মেসেজ রিসিভ করার প্রয়োজন নেই। প্লেক্সিগ্লাসের বাক্সটাও তালা মেরে রেখে গেছে, যাতে অন্য কেউ জিনিসটা ব্যবহার করতে না পারে। লিয়ার কথাটা খুব মনে ধরেছে ওর—ঠিকই তো, এখন পর্যন্ত ওদের সামনে কখনও চালু হয়নি সেটটা। ঘটনাটা কী? ইচ্ছে করে ওদেরকে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রাখছে না তো এরা? চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ওর।

'ববি, ক্যাম্পে এখন কোনও স্নো-ক্যাট আছে?'

'মেইন ল্যাবের পাশে আছে একটা,' জানাল মুরল্যান্ড। 'বাকিগুলো ওভারনাইট সার্ভের জন্য গেছে। কেন?'

'ওটার টুলবক্স থেকে একটা বোল্ট-কাটার নিয়ে আসো তো, একটা জিনিস পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

'এখুনি আনছি,' বলে বেরিয়ে গেল মুরল্যান্ড।

খানিক পরেই ফিরে এল সে, ভারি বোল্ট-কাটারটা নিয়ে রেডিও কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল রানা, এক মোচড়ে ভেঙে ফেলল তালাটা। ব্যাপারটা লক্ষ করে দূরের টেবিলে বসা এক টেকনিশিয়ান ছুটে এল।

'কী করছেন আপনি?' বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

শীতল চোখে তার দিকে তাকাল রানা। 'তোমাদের এই রেডিও কখনও আমাদের সামনে কাজ করে না। ব্যাপারটা সত্যিই তা-ই, নাকি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত—সেটাই জানতে চাই আমি।'

'আপনি এটা করতে পারেন না!'

'কেন, রেডিও অপারেট করার অধিকার নেই আমাদের?'

'এ...এটা নিয়মবিরুদ্ধ!' টেকনিশিয়ানের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। 'মিস শোয়ার্জ জানতে পারলে খুব খারাপ হবে।'

ধাক্কা দিয়ে লোকটাকে সরিয়ে দিল মুরল্যান্ড। 'যাও হে, নিজের চরকায় তেল দাও! চম্বলের রাণীর সঙ্গে যা বোঝাপড়া করার আমরা করব।'

তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করল টেকনিশিয়ান, ঝগড়া জুড়ে দিল, মুরল্যান্ডকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল লিয়া আর স্যাম। এই ফাঁকে রেডিও সেটের পাওয়ার অন করল রানা, জ্যান্ত হয়ে উঠল অত্যাধুনিক যন্ত্রটা। নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার পর একটা ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যান করতে থাকল ও, প্রতিবারই খস খস শব্দ শুনে হতাশ হতে হচ্ছে, কোনও রকম ট্রান্সমিশন পাওয়া যাচ্ছে না। দ্রুত হাত চালাচ্ছে, বেশিক্ষণ সময় পাওয়া যাবে না, থেলমা এসে পড়লে সর্বনাশ।

ধাক্কা দিয়ে জটলা ভেঙে সেটের দিকে ঝুঁকল টেকনিশিয়ান, পাওয়ার অফ করে দিতে চাচ্ছে, কিন্তু কলার ধরে হিড় হিড় করে টেনে তাকে সরিয়ে দিল মুরল্যান্ড। ব্যর্থতার ক্ষোভে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, সঙ্গীদের ডাকছে। মুহূর্তের মধ্যে মেঝেতে চেয়ারের পায়া ঘষা খাওয়ার শব্দ হলো, মেস হলে উপস্থিত জিয়ো-রিসার্চের সব সদস্য উঠে দাঁড়িয়েছে। গণ্ডগোলের উৎস লক্ষ্য করে এগিয়ে এল তারা।

'কাজ শেষ আমার,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা, উল্টো ঘুরেই থমকে গেল, ওদের চারজনকে ঘিরে ধরেছে জিয়ো-রিসার্চের বাহিনী।

লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে গেল রানার, এরা নিজোর্ড থেকে আসা মূল দলের কেউ নয়, রি-সাপ্লাইয়ের ফ্লাইটে এসেছে। কঠিন চেহারা প্রত্যেকের, দেখে গবেষণা-সংশ্লিষ্ট কেউ বলে মনে হয় না, দাঁড়ানোর ভঙ্গি প্রশিক্ষিত সৈনিকের মত। কারা এরা?

দু'পা সামনে এগোল প্রথম টেকনিশিয়ান, যেন মল্লযুদ্ধের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। বেশ লম্বা-চওড়া সে, চোখে নিষ্ঠুরতা। রানার অভিজ্ঞ চোখ একজন খুনীকে চিনতে পারছে। আপাতত কোনও রকম লড়াইয়ে নামার ইচ্ছে নেই ওর, তাই বাঁকা একটা হাসি দিয়ে লোকটাকে প্রত্যাখ্যান করল। এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে

রইল প্রতিপক্ষ, তারপর জার্মান ভাষায় খিস্তি করে চলে গেল সঙ্গীদের নিয়ে।

'জার্মান ভাষায় গালাগালে তেমন দখল নেই আমার,' হালকা গলায় বলল রানা। 'তারপরও মনে হলো লোকটা আমার পুরুষত্ব নিয়ে কটু কথা বলেছে।'

'তুমি একা নও, কয়েক প্রজন্ম ধরে টান দিয়েছে,' হাসল লিয়া।

'হুঁ, আগে জানলে আমিও নিজের মাতৃভাষায় কিছু শুনিয়ে দিতাম ওকে।'

'সুযোগ আছে এখনও,' মুরল্যান্ড বলল। 'ঘসেটি বেগম যে-কোনও মুহূর্তে হাজির হবে এখানে। মিষ্টি কথা শোনাতে আসবে না সে, এটা বাজি ধরে বলতে পারি। পাল্টা যা খুশি বলতে পারো, কেউ মানা করবে না।'

'না রে ভাই, এক রাতের মত যথেষ্ট গালি শুনে ফেলেছি, আর হজম হবে না। তারচেয়ে গিয়ে শুয়ে পড়ি।'

'চলো, আমিও যাব।'

স্যাম আর লিয়াও বিদায় নিল। শেষ এক কাপ কফি খেয়ে অ্যাকোমোডেশনের দিকে রওনা হলো রানা আর মুরল্যান্ড।

দুই

'কী বুঝলে রেডিও দেখে?' হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'টোট্যালি ডেড,' বলল রানা। 'একটা ফ্রিকোয়েন্সিও কাজ

করছে না। আমার তো সন্দেহ হচ্ছে, আদৌ ড্যানিশ সরকারের সঙ্গে এদের যোগাযোগ হয়েছে কি না। আফটার অল, সোলার ম্যাক্স এখন হায়েস্ট পিকে রয়েছে।'

'তারমানে ইভ্যাকুয়েশনের অর্ডারটা ভুয়া?'

'আমার সেরকমই সন্দেহ।'

'তা হলে চ্যালেঞ্জ করছি না কেন? কাল আমরা না যাই যদি, কী করতে পারবে ওরা?'

'এত সহজ নয় ব্যাপারটা, ববি। ওই টেকনিশিয়ান আর ওর দোস্তোদের দেখোনি? ওরা যদি বিজ্ঞানী বা ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট হয়ে থাকে, নিজের নাম পাল্টে ফেলব আমি।'

'খটকা অবশ্য আমারও লেগেছে। তোমার কী ধারণা... ওরা ভাড়াটে সৈনিক?'

'হুঁ। সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও নিশ্চয়ই আছে। আমরা যেতে না চাইলে ওদের কাজে লাগাবে জিয়ো-রিসার্চ। মাত্র দুজনে পেরে উঠব না কিছুতেই।'

'তা হলে কী করতে চাইছ? বদমাশগুলোকে তো এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যায় না। কী করতে যাচ্ছে ওরা, জানা দরকার।'

'জানব তো অবশ্যই। আগে আইসল্যান্ডে গিয়ে নিই। ওখান থেকে জিয়ো-রিসার্চের ব্যাপারে খোঁজখবর নেব। ঢাকায়ও যোগাযোগ করা দরকার, এদের বিরুদ্ধে নামার আগে বিসিআইয়ের অনুমতি লাগবে। তারপর পুরো রি-এনফোর্সমেন্ট নিয়ে ফিরে আসব। যুদ্ধ যদি করতে চায় ওরা, সেই সাধ জন্মের মত মিটিয়ে দেব।'

'সময়মত ফিরতে পারব তো? আমরা আসার আগেই যদি এরা ওদের কাজ সেরে ফেলে?'

'মনে হয় না কাজটা অল্প সময়ে করা সম্ভব। হলে গত ক'দিনে সবার চোখ এড়িয়ে সেরে ফেলতে পারত, আমাদের তাড়ানোর প্রয়োজন হতো না। চিন্তা কোরো না, ওদের বাড়া

ভাতে ছাই দিতে পারব আমরা!' হাসল রানা।

'সেটাই তো চাই,' মুরল্যান্ডের মুখে হাসি। 'যাই, জুরকিচকে খুঁজে নিয়ে আসি। গোছগাছ সেরে রাখতে বলব, কাল সকালেই রওনা হতে হবে কি না।'

'যাও, পরে দেখা হবে।'

মুরল্যান্ডের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অ্যাকোমোডেশন বিল্ডিঙে ঢুকল রানা, করিডর ধরে এগিয়ে নিজের রুমের দরজা খুলল। ভিতরে পা দিয়েই থমকে গেল ও—এ কী অবস্থা কামরাটার! পুরো লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে সারা ঘর, হঠাৎ দেখায় তছনছ করা হয়েছে মনে হলেও অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই ধরতে পারবে পার্থক্যটা। এমনি এমনি এলোমেলো করা হয়নি, নিপুণ হাতে তল্লাশি চালানো হয়েছে রুমটায়। খাটের ম্যাট্রেস উল্টে ফেলা হয়েছে, ব্যাগ খালি করে সমস্ত কাপড়-চোপড় ছড়িয়ে রাখা হয়েছে চারপাশে, গাইগার কাউন্টারটা চেয়ারের উপর—দেখে বোঝা যাচ্ছে, হাত দেয়া হয়েছে ওটাতেও।

দাঁতে দাঁত পিষল রানা—নিছক শত্রুতাবশত করা হয়নি কাজটা, নির্দিষ্ট কিছু খুঁজছিল অচেনা দুষ্কৃতকারী, তবে পেয়েছে বলে মনে হয় না। কীসের খোঁজে এসেছিল? প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল ও, ভিতর থেকে দু'আঙুলে তুলে আনল মেজর রস কনওয়েরের লাশ থেকে উদ্ধার করা কাগজের টুকরোটা।

নিখুঁতভাবে ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড মার্কিং করা একটা ম্যাপ ওটা—কেন্দ্রে রয়েছে পেন্সিলে আঁকা সি-নাইন্টি সেভেন কার্গো বিমানটার ক্র্যাশের ছবি, বাঁয়ে একটু নীচে দেখানো হয়েছে ক্যাম্প ডিকেড। ঠিক ডানদিকটায় বাঁকানো একটা নাকের আকৃতি... তাতে ক্রস মার্ক দেয়া হয়েছে, কী ওটা কে জানে। সরলরেখা এঁকে হিসাব দেয়া হয়েছে—ক্র্যাশ সাইট থেকে ক্রসের দূরত্ব আটাশ কিলোমিটার, ম্যাগনেটিক নর্থকে হেডিং ধরে ওটা ঠিক একশো সাতাশি ডিগ্রী পূর্বে। ম্যাপের হিসাব যদি ঠিক থাকে,

তা হলে ধরে নিতে হয়, ক্র্যাশ করা বিমান থেকে তিনশো কিলোমিটার হেঁটে ক্যাম্প ডিকেডে পৌঁছেছিল রস কনওয়ে, এই গ্রিনল্যান্ডে সেটা অবিশ্বাস্য এক দূরত্ব। বৈরী আবহাওয়ায় পদব্রজে এত দূর আসা যা-তা কথা নয়।

অচেনা দুষ্কৃতকারী কি ম্যাপটার জন্যই এসেছিল? না-ও হতে পারে, ওর কাছে মানুষের কৌতূহল জাগানোর মত আরও একটা জিনিস আছে—জার্মানি থেকে পাঠানো সেই কাগজপত্রগুলো। সময়ের অভাবে সেগুলো স্টাডি করার সুযোগ পায়নি ও, তা ছাড়া জার্মান ভাষায় নিজের দখলও খুব পোক্ত বলা যাবে না। নেড়ে-চেড়ে শুধু এটুকু জানতে পেরেছে, ডকুমেন্টগুলো সেবাস্টিয়ান গ্রাব নামে এক ভদ্রলোক পাঠিয়েছেন। প্যাকেটটা ওর পারকার পকেটে আছে, রুমে রেখে যায়নি।

কে এসেছিল কামরায়? জিয়ো-রিসার্চের কেউ কি? অবশ্য লিয়াকেও সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারছে না। সকালে মেইলের প্যাকেটটার দিকে আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছিল মেয়েটা, এমনকী চিরকুটটার কথাও জানে। রানা এখনও ওকে জানায়নি কাগজটাতে কী আছে, সময় পায়নি।

দরজায় শব্দ হলো, মুরল্যান্ড ফিরে এসেছে, দেজান জুরকিচেরও গলা শোনা গেল।

'ববি?' ডাকল রানা।

'হ্যাঁ।'

'এদিকে আসবে একটু? দেজানকেও নিয়ে এসো।'

দুজনেই এসে ঢুকল ওর রুমে।

'ওয়াও!' শিস দিয়ে উঠল মুরল্যান্ড ভিতরের অবস্থা দেখে। 'দারুণ সাজিয়েছ দেখি!' গলায় ঠাট্টার সুর।

'দুঃখিত, ডেকোরেশনটা অন্য কেউ করেছে। এবং সেটা আমার বিনা অনুমতিতে।'

'হুঁ!'

জুরকিচের দিকে ফিরল রানা, ছোটখাট মানুষটা গত একটা দিনে আরও কুঁকড়ে গেছে, চোখের নীচে কালি, বন্ধু হারানোর শোকে চেহারা মলিন। 'কেমন আছেন আপনি, দেজান?'

'জী, ভাল,' প্রাণহীন গলায় বলল জুরকিচ। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি উঠেছে তার, চশমার কাঁচ ঘোলা হয়ে আছে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে ভক ভক করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখ ছোট করে চারপাশে তাকাল সে, জানতে চাইল, 'এখানে ঘটেছেটা কী?'

'সেটা আপনাকেই জিজ্ঞেস করতে চাইছি। সন্ধ্যা থেকে তো রুমেই ছিলেন। আমার কামরায় ঢুকতে দেখেছেন কাউকে?'

মাথা নাড়ল জুরকিচ। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেখা তো দূরের কথা, কিচ্ছু শুনতেও পাইনি।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লোকটাকে দেখল রানা, সন্দেহ হলো—ঘুম-টুম কিচ্ছু না, মদের নেশায় টাল হয়ে পড়ে রয়েছিল সে। জিজ্ঞেস করল, 'বেরিয়েছেন কখন? গিয়েছিলেন কোথায়?'

'গিয়েছিলাম আমার টিমের লোকদের সঙ্গে কথা বলতে, কাজকর্ম এগোচ্ছে কেমন—জানতে হবে না? এই ধরুন, বিশ মিনিট আগে গেছি।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'যান, গিয়ে গোছগাছ করুন। কাল সকালে ফিরে যেতে হবে আমাদের, জানেন তো?'

'হ্যাঁ, শুনলাম। ভালই হয়েছে, এখানে একদম ভাল্লাগছিল না।' টলমল পায়ে রুম থেকে বেরিয়ে গেল জুরকিচ।

মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'সত্যি বলছে ও? আসলেই গিয়েছিল ওর দলের লোকদের কাছে?'

'দু-নম্বর অ্যাকোমোডশন বিল্ডিঙে পেয়েছি ওকে,' জানাল মুরল্যান্ড। 'তবে ওখানে ওদের কেউ ছিল না। দেজানের চারপাশে যে ক'টা খালি বোতল দেখেছি, তাতে মনে হয় না ওই বেচারাদের কালেকশন আর অবশিষ্ট আছে। কথা বলা-টলা না, আসলে গিয়েছিল ওদের মদ সাবাড় করতে।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'লোকটার আচরণ ঠিক স্বাভাবিক ঠেকছে না। বউ মরলেও এভাবে ভেঙে পড়ে না ওর বয়সী পুরুষ।'

'শোকের প্রকাশ তো সবার একরকম হয় না,' যুক্তি দেখাল মুরল্যান্ড। 'তা ছাড়া বোরোশিন সম্ভবত ওর খুব কাছের মানুষ ছিল।'

'কী জানি!' বলল রানা। 'তবে এটুকু বুঝতে পারছি, আমার কামরা ও তছনছ করেনি। যে রকম মাতাল, হাঁটাচলাই তো করতে পারছে না ঠিকমত।'

'কাকে সন্দেহ করছ? জিয়ো-রিসার্চের কেউ?'

'হতে পারে,' রানা স্বীকার করল। 'তবে আমার কেন যেন লিয়াকে সন্দেহ হচ্ছে।'

'কেন?' মুরল্যান্ড একটু অবাক হলো।

'ওর আচার-আচরণ খুবই সন্দেহজনক। কিছু একটা লুকোচ্ছে সে, আমি শিয়োর।'

'আমারও সেরকমই ধারণা,' মুরল্যান্ড বলল। 'কীভাবে ওর পেট থেকে কথা বের করা যায়, বলো তো?'

'দেখি, প্লেনে উঠে চেপে ধরব। ওখানে পাশ কাটিয়ে কোথাও যেতে পারবে না।'

'হাহ্! ডিসি-থ্রী'তে কখনও চড়োনি বোধহয়। কী পরিমাণ শব্দ করে ওটা, কল্পনাও করতে পারবে না। কান ঝালাপালা হয়ে যায়। কথা বলবে কীভাবে?'

'যেভাবেই হোক, বলতে হবে। যাও এখন, জুরকিচকে গোছগাছে সাহায্য করো।'

দরজায় গিয়ে উল্টো ঘুরে দাঁড়াল মুরল্যান্ড। 'রানা?'

'কী?'

'আসলে কী ঘটছে এখানে, কিছু ধারণা করতে পারছ?'

'না, ববি,' সত্যি কথাটাই বলল রানা। 'খারাপ কিছু, তাতে সন্দেহ নেই; তবে আমি একদমই অন্ধকারে।'

*

সকালের শান্তিময় পরিবেশকে বিদীর্ণ করে পূর্ব দিক থেকে উড়ে এল ডিসি-থ্রী বিমানটা। গত ক'দিনে এই প্রথম শান্ত হয়েছে আবহাওয়া, আকাশে মেঘ নেই বললেই চলে, সূর্যের দেখা মিলেছে, বাতাসও মৃদুমন্দভাবে বইছে। আবহাওয়াবিদদের মতে ঘণ্টা খানেকের মত থাকবে এই চমৎকার আবহাওয়া, তারপর আবার শুরু হবে গজব। আটটা বাজেনি এখনও, তারমানে পাইলটকে আঁধার থাকতেই রওনা দিতে হয়েছে রেইক্‌ইয়াভিক থেকে।

ফিরতি গ্রুপটা মেস হলে সমবেত হয়েছে, জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে অস্থায়ী এয়ারস্ট্রিপটা। ভোরের আলো ফুটতেই নিজের লোকজনকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল মুয়েলার, স্নো-ক্যাটের প্লাউ দিয়ে বরফ সরিয়ে প্লেন নামার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মুহূর্তে মেস হলের ভিতর জিয়ো-রিসার্চের কেউ নেই, আশপাশেও দেখা যাচ্ছে না তাদের, যেন গায়েব হয়ে গেছে। আসলে উধাও হয়নি, ভাল আবহাওয়া পেয়ে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী আর টেকনিশিয়ানকে সাত সকালে গবেষণার কাজে দূরে পাঠিয়ে দিয়েছে মুয়েলার।

'সবার টিকেট-পাসপোর্ট ঠিক আছে তো? আমাদের ফ্লাইট এসে গেছে,' সকৌতুকে বলল মুরল্যান্ড।

'এতসব গিয়ার ফেলে যেতে মোটেই ভাল্লাগছে না আমার,' বিড় বিড় করল স্যাম, এই নিয়ে দশবার বলল সে কথাটা।

সকালেই তার সঙ্গে কথা বলেছে মুয়েলার, প্লেনটা নাকি বেশিক্ষণ মাটিতে থাকতে পারবে না, আবহাওয়া খারাপ হয়ে যেতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। তাই শুধুমাত্র ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছাড়া আরোহীরা অন্যান্য ইকুইপমেন্ট লোড করার সুযোগ পাবে না। অবশ্য দু-একদিনের মধ্যে যার যার জিনিসপত্র ফেরত পাঠাবে জিয়ো-রিসার্চ, দেরি হলে ক্ষতিপূরণও দেবে। তারপরও

ব্যবস্থাটা পছন্দ হয়নি স্যামের, খানিক পরই পরই আপন মনে বলে বেড়াচ্ছে সেটা।

'কাল দুপুরের মধ্যেই ফিরে আসব আমরা,' আশ্বস্ত করার সুরে সবাইকে বলল রানা।

'না পারলে জিয়ো-রিসার্চের নামে মামলা ঠুকব আমি,' জানিয়ে দিল লিয়া।

'আমরাও,' বলল স্যাম, এক্সপিডিশনের জন্য এখানকার আর যে-কারও চাইতে কয়েকগুণ বেশি টাকা ইনভেস্ট করেছে তার বাবা।

বিমানের শব্দ পেয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এসেছে হেইডি আর সিলভিয়া। মোটা শরীরের অ্যাসিসটেন্ট কুক সবাইকে সম্ভাষণ জানাল, 'গুটেন মর্গেন, এভরিওয়ান।'

'গুড মর্নিং, সিলভিয়া,' প্রত্যুত্তর দিল রানা। 'তোমরা রেডি তো?'

'ইয়েস, হের রানা। তবে ব্যাপারটা আমরা কেউ মানতে পারছি না।'

হাসল রানা। 'আমাদেরও একই অবস্থা। এইমাত্র আলাপ হচ্ছিল মামলা-মোকদ্দমা করার বিষয়ে।'

'জিয়ো রিসার্চকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। ড্যানিশরাই আমাদের বের করে দিচ্ছে। সকালে রেডিওতে রেইক্‌ইয়াভিকের সঙ্গে কথা বলছিল থেলমা, হেইডি শুনতে পেয়েছে।'

অল্পবয়েসী রাঁধুনির দিকে তাকাল রানা। 'কী শুনতে পেয়েছ?'

'ওখানকার ড্যানিশ দূতাবাসে কথা বলছিল ফ্রাউলাইন শোয়ার্জ,' জানাল হেইডি। 'এক অফিসার ছিলেন অন্যপ্রান্তে। ড্যানিশরা গোটা অভিযানই বন্ধ করে দিতে চাইছে... জিয়ো-রিসার্চ, সার্ভেয়ার্স সোসাইটি... সব। ফ্রাউলাইন শোয়ার্জ দেখলাম নিজেদের ব্যাপারে খুব যুদ্ধ করছে।'

'হুঁ,' বলল রানা। 'অর্ডারটা সত্যি হলেও পরোয়া করি না।

আমি এখানে ফিরবই।'

জানালার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল লিয়া, এবার সোজা হয়ে বলল, 'প্লেন ল্যান্ড করেছে। মুয়েলারকে দেখছি এদিকে আসছে।'

'সময় হয়ে গেছে,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলুন সবাই।'

সমস্ত লাগেজ ইতোমধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ল্যান্ডিং স্ট্রিপের পাশে, খালি হাতে মেস হল থেকে বেরিয়ে এল ছোট্ট দলটা, তুষার মাড়িয়ে এগোতে থাকল বিমানের দিকে। ইঞ্জিন আইড্ল্ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে আকাশযানটা, প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম, ঘূর্ণায়মান প্রপেলারের পিছনে বাতাসের ধাক্কায় তুষার পাক খাচ্ছে।

এয়ারক্র্যাফটের কাছাকাছি আসতেই ক্লাউস জিগলারকে দেখতে পেল রানা, ওদের সঙ্গে ক্যাম্প ডিকেডের এন্ট্র্যান্স খোঁড়ায় সাহায্য করেছিল ছেলেটা। ডরমিটরি থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসছে সে, কাঁধে ব্যাগ—তাকেও ফেরত পাঠানো হচ্ছে নিঃসন্দেহে। বিশেষ অবাক হলো না রানা, এ-ও সম্ভবত সিলভিয়া আর হেইডির মত কন্ট্র্যাক্ট এমপ্লয়ি, সেজন্যই ফিরতে হচ্ছে বেচারাকে।

ব্যাগ কাঁধে জিগলার বিমানের কাছে পৌঁছুতেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এক প্যাসেঞ্জার। আপাদমস্তক কালো স্নো-সুটে ঢাকা তার, চোখে গগলস্, হুড শক্ত করে বাঁধা মুখের চারপাশে। চেহারাটা বোঝা যাচ্ছে না ঠিকমত, তবে ভাঙা নাকটা বুঝিয়ে দিচ্ছে—এককালে মারামারি করতে গিয়ে এ অবস্থা হয়েছে অঙ্গটার। লম্বায় ছ'ফুট লোকটা, ভারি বুট পরেও দৃঢ় পায়ে হাঁটছে তুষারের উপর দিয়ে, যেন বরফেই জন্ম হয়েছে তার। সামনে পড়া জিগলারকে কোনরকম ভ্রূক্ষেপ ছাড়াই পাশ কাটাল সে, মাথা উঁচু করে গর্বিত ভঙ্গিতে এগোচ্ছে, হাবভাবে কর্তৃত্বের ছাপ স্পষ্ট।

থেলমা শোয়ার্জের আনন্দিত চিৎকার শোনা গেল, যেন

ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছে না। সবাইকে পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল সে, ঝাঁপিয়ে পড়ে আগন্তুককে জড়িয়ে ধরল। এই প্রথম তার এই রূপ দেখছে সবাই, ব্যাপারটা কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকছে।

হুঁ, ভাবল রানা, এ-ই তা হলে পেত্নীটার সত্যিকার বয়ফ্রেন্ড—জিয়ো-রিসার্চের নতুন মালিক। মুয়েলার এর কথাই বলেছিল। লোকটা সত্যি থেলমাকে প্রেমিকা মানে তো? মেয়েটার উচ্ছ্বাসের ছিটেফোঁটাও দেখা যাচ্ছে না তার মধ্যে, পাল্টা আলিঙ্গন করেছে বটে, সেটা দায়সারা ভঙ্গিতে।

প্যাসেঞ্জাররা প্লেনে উঠতে শুরু করেছে, সবার পিছনে রইল রানা, নবাগতকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে জরিপ করছে। ওর দিকে এগিয়ে এল জেন্স মুয়েলার, বিদায় জানাতে এসেছে।

'গুড বাই, মি. রানা,' বলল সে। 'দুঃখিত, আপনাদের জন্য কিছু করতে পারলাম না। ড্যানিশ সরকার আমাদেরও ফেরত পাঠাতে চাইছে, অনেক কষ্টে সেটা ঠেকিয়ে রেখেছি। আপনারা তো যাচ্ছেন, তারপরও শেষ হচ্ছে না, ওরা একজন ইন্সপেক্টর পাঠাবে আমাদের এই ফ্যাসিলিটি কতটা নিরাপদ সেটা দেখার জন্য। তার রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে আমাদের থাকা-না থাকা।' হেইডি যা শুনেছে, সেটাই বলছে লোকটা।

ভুরু কুঁচকে মুয়েলারের অভিব্যক্তি যাচাই করল রানা, তাতে কোনও খুঁত দেখতে পেল না। যদি অভিনয় করে থাকে, তা হলে অস্কার পাবার মত পারফর্মেন্স দেখাচ্ছে লোকটা।

'হুঁ, তারমানে ড্যানিশ বুরোক্রেসির সামনে আমাদের কোরবানির ছাগল বানাচ্ছেন আপনারা, নিজেরা বাঁচার জন্য,' বিদ্রূপ করল রানা।

মুয়েলার কাঁধ ঝাঁকাল। 'দুঃখিত, সিদ্ধান্তটা আমার নয়। আমার হাত-পা বাঁধা।'

'তা হলে আর আপনাকে কথা শুনিয়ে লাভ কী? যান, আরামসে নিজেদের এক্সপিডিশন চালান।'

বিদায় নিয়ে চলে গেল মুয়েলার। বিমানের দিকে ফিরল রানা, ওর ঠিক সামনেই বোর্ডিং ল্যাডার ধরে উঠছে লিয়া, তার কাঁধে টোকা দিয়ে ও বলল, 'পাশে একটা সিট রেখো, তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।'

এক মুহূর্তের জন্য লিয়ার চেহারায় মেঘ জমল, তারপরই নিজেকে সামলে নিল সে, মুখে হাসি ফুটিয়ে উঠে গেল বিমানে।

শেষবারের মত জিয়ো-রিসার্চ স্টেশনের দিকে তাকাল রানা, কেমন যেন খালি খালি দেখাচ্ছে জায়গাটা। বিজ্ঞানী আর ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট কেউ নেই, দু'চারটে মুখ যা চোখে পড়ছে, তারা সব সেই কঠোর সৈনিক টাইপের লোকগুলো। থেলমার দিকে নজর পড়ল ওর, সঙ্গীর কানে কী যেন বলছে, বোধহয় ওদের ব্যাপারেই, কারণ কথা শেষ হতেই আগন্তুক উল্টো ঘুরে বিমানের দিকে আসতে শুরু করল।

ইচ্ছে করেই ল্যাডার ধরে উঠে পড়ল রানা, শখ থাকলে লোকটা নিজেই আসুক, ও অপেক্ষা করবে না।

'এক্সকিউজ মি, আপনি কি মাসুদ রানা?' সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে জার্মান উচ্চারণে প্রশ্ন ছুঁড়ল আগন্তুক, গলার স্বর দারুণ ফ্যাঁসফেঁসে, যেন তাতে অশুভ কিছু লুকিয়ে আছে।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল রানা। আগ বাড়িয়ে হাত মেলাতে গেল না, লোকটাও হাত বাড়াচ্ছে না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কেন যেন সতর্ক করছে ওকে, লোকটা থেকে দূরে সরে থাকতে বলছে।

হুড আর গগলস খুলে ফেলেছে আগন্তুক। 'আমি ফ্রেডারিখ কার্ন। বলতে এসেছি যে, মিসেস রোজালিন গুডজনসেনের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। আপনার জন্য একটা জিনিস দিয়েছেন তিনি, ককপিটের বাল্কহেডে টেপ দিয়ে সেঁটে রেখেছি সেটা।' মুখে কুৎসিত একটা হাসি ফুটল তার, নিজেই বিমানের দরজা টেনে বন্ধ করে দিল। শেষ মুহূর্তে বলল, 'যাত্রা শুভ হোক।'

বিস্মিত বোধ করল রানা—কী বলল লোকটা? মানে কী এর?

হতবাক অবস্থায় ঘুরতে গিয়েই লিয়ার সঙ্গে ধাক্কা খেলো, সে এখনও সিটে বসেনি, দরজা বরাবর দাঁড়িয়ে আছে। কী কারণে যেন তার দৃষ্টি বিস্ফারিত, চেহারায় ভর করেছে আতঙ্ক।

'কী হয়েছে, লিয়া...' বলতে গিয়েই ঝাঁকি খেলো রানা, লিয়া সহ মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বিনা নোটিশে হঠাৎ চলতে শুরু করেছে ওদের বিমান, তাল সামলাতে পারেনি ওরা।

'পাইলটের কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?' রাগে গজ গজ করে উঠল মুরল্যান্ড। 'যাত্রী বসার আগেই এভাবে বিমান ছেড়ে দিল কেন?'

ওর কথার জবাবেই যেন মাথার উপরে খড় খড় করে উঠল স্পিকার। ককপিট থেকে ক্যাপ্টেন জানাল, 'দুঃখিত, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন। একটা ঝড় আসছে বলে তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে, আনলোডিংও ক্যানসেল করতে হয়েছে। আপনারা তাড়াতাড়ি সিটবেল্ট বাঁধুন, আমরা টেক-অফ করতে যাচ্ছি।'

অসমান বরফের উপর দিয়ে ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে প্রাচীন ডিসি-থ্রী। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, লিয়াকে সাহায্য করল উঠতে, দুজনেই কাছের একজোড়া সিটে বসে বেল্ট বাঁধল।

লিয়ার মুখ আতঙ্কে সাদা হয়ে গেছে, কারণটা ধরতে পারছে না রানা। হাতে হাত রেখে নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে, লিয়া? কেন ভয় পাচ্ছ?'

যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছে মেয়েটা। ফিসফিস করে বলল, 'আমি ওই গলার স্বর চিনি, চেহারাটাও ভুলিনি। কখনও ভোলা সম্ভব নয়। তবে লোকটা বোধহয় আমাকে চিনতে পারেনি।'

'কার কথা বলছ? ওই কী যেন... ফ্রেডারিখ কার্ন?'

মাথা ঝাঁকাল লিয়া, তার এখনকার চেহারার সঙ্গে দুঃসাহসী ডাক্তারকে কেউ মেলাতেই পারবে না। রানার হাত চেপে ধরল সে. 'তুমি সেবাস্টিয়ান গ্রাবের পাঠানো প্যাকেটটা পেয়েছ?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আচ্ছা! তা হলে তুমিই আমার রুমে ঢুকেছিলে?'

'হ্যাঁ। ওটাতে কী আছে, জানা দরকার ছিল আমার।'

রানা ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। 'কেন? সেবাস্টিয়ান গ্রাব আমার কাছে যা-ই পাঠাক, তাতে কী এসে যায় তোমার? তাকে তুমি চেনো?'

বিমানের স্কি বরফ ছেড়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করল লিয়া, তারপর বলল, 'শুধু চিনি বললে ভুল হবে, তাকে আমি মরতে দেখেছি। ওই ফ্রেডারিখ কার্ন আমার চোখের সামনে লোকটাকে খুন করেছে।'

তিন

ডিসি-থ্রী টেক-অফ করা পর্যন্ত চুপচাপ রইল থেলমা, তারপরই ফ্রেডারিখ কার্নকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল তার কোয়ার্টারের দিকে। কী চাচ্ছে সেটা তার আগ্রাসী দৃষ্টিতে পরিষ্কার ধরা পড়ছে, কার্ন নিজেও একই তাড়নায় ভুগছে। কিন্তু এখন উপযুক্ত সময় নয়।

'পরে, থেলমা,' কর্কশ গলায় বলে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল কার্ন। 'হাতে সময় নেই।'

'কে বলেছে নেই?' উদ্ধত গলায় বলল থেলমা, হাত বাড়িয়ে দিয়েছে প্রেমিকের উরুসন্ধির দিকে, লোকে দেখলে দেখুক—তাতে পরোয়া নেই। 'আমি কতদিন থেকে অপেক্ষা করে আছি, জানো?'

'আমার কিছু যায় আসে না,' কড়া গলায় বলল কার্ন। 'সরো বলছি!'

'সরবো না,' সমান তেজে বলল থেলমা। 'গত একটা সপ্তাহ ধরে মুয়েলারকে সহ্য করছি, শুধু তোমার কথা ভেবে। আজ যখন হাতের কাছে পেয়েছি, কিছুতেই ছাড়ব না। এক্ষুনি রুমে গিয়ে তুমি আমার সঙ্গে প্রেম করবে, আমি যতক্ষণ চাই ততক্ষণ!'

'বেশি বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু রুমে নিয়ে গিয়ে চাবকাবো!' হুমকি দিল কার্ন।

'আমি তাতেও রাজি,' হাসল থেলমা। এটা ওদের পুরনো খেলা, যাতে তার জয় সুনিশ্চিত। কার্নের দৈহিক চাহিদা তার চেয়ে অনেক বেশি, শুধুমাত্র শুরুটা প্রলম্বিত করে ওরা, যাতে সেক্সটা আরও উপভোগ্য হয়। হাতের তালুতে প্রেমিকের উত্তেজিত হয়ে ওঠার প্রমাণ পাচ্ছে সে।

আর নিজেকে সামলাতে পারল না কার্ন। 'কোথায় তোমার রুম? চলো!'

আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল থেলমা।

বলা কঠিন কে কার প্রেমে মজেছিল গত বছর, যখন ফ্রেডারিখ কার্ন জিয়ো-রিসার্চকে কিনতে আসে। এর আগে জেন্স মুয়েলারের সঙ্গে দু'বছরের সম্পর্ক ছিল থেলমার, সময়টাও সুখেই কাটছিল। তারপরও কেন যেন তার মনে একটা শূন্যতা ছিল—কীসের যেন অভাব। মুয়েলার ভাবত সেটা সংসার-সন্তানের জন্য, কিন্তু থেলমার তা মনে হয়নি কখনও। ভবঘুরের জীবন কাটাচ্ছিল তারা, দুনিয়ার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত গবেষণার জন্য ছুটে বেড়াত, স্থিরতা ছিল না। মুয়েলার বেশ কয়েকবার বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সংসারী হতে চেয়েছে, কিন্তু থেলমা প্রতিবারই প্রত্যাখ্যান করেছে, বাঁধনে জড়াতে চায়নি।

এই সময় এল ফ্রেডারিখ কার্ন, পকেট ভর্তি টাকা আর জিয়ো-রিসার্চ কিনে নেয়ার প্রস্তাব নিয়ে। স্যাকলিচ কর্পোরেশনের

ট্যাক্স কমানোর কৌশল হিসেবে গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠানটা কিনতে চেয়েছে সে, কথা দিয়েছিল—ওদের কাজে কখনও নাক গলাবে না। লোকটাকে দেখেই থেলমা বুঝতে পারে—কীসের শূন্যতা অনুভব করছিল সে। তা হলো টাকা আর বিপজ্জনক চরিত্রের পুরুষ... এই দুই চাহিদার কোনওটাই পূরণ করার ক্ষমতা ছিল না মুয়েলারের। কার্নকে দেখে কিশোরী মেয়ের মত লোভী হয়ে ওঠে সে, ঠিক যেভাবে স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা টাকা ছড়ানো, বাপের দামি গাড়ি হাঁকানো বখাটে ছেলেদের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

পর পর কয়েকটা অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় টাকা-পয়সার টানাটানিতে ছিল মুয়েলার, প্রতিষ্ঠানটা বিক্রি করতে রাজি হয়ে যায়। চুক্তি সই আর অন্যান্য ফর্মালিটিজের জন্য সে সময় কয়েকবার কার্নের সঙ্গে দেখা হয় থেলমার, প্রতিবারই হাসি-ঠাট্টা আর গোপন ইশারা দিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতে থাকে, মুয়েলার অসহায়ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে শুধু। শুরুতে খুব একটা আগ্রহী মনে হয়নি কার্নকে, শেষে থেলমা যখন লোকলজ্জা ভুলে নিজেকে ওর পায়ে সমর্পণ করার মত অবস্থায় পৌঁছে গেল, তখন ওকে কাছে টেনে নিল সে। আসলে পুরোটাই ছিল কৌশল, প্রথম দেখায় মেয়েটাকে কার্নেরও ভাল লেগেছে, কিন্তু তাকে নিজের দখলে আনতে ইচ্ছে করে দূরত্ব বজায় রেখেছে। আজ সম্পর্কের এক বছর পার হয়ে যাবার পর থেলমা বুঝতে পারছে, কার্নকে সে জালে ফাঁসায়নি, বরং নিজে ফেঁসেছে লোকটার জালে। এখন তাদের সম্পর্ক প্রেমিক-প্রেমিকার নয়, ক্রীতদাসী আর প্রভুর—তাকে নিজের ইচ্ছেমত ব্যবহার করে মর্ষকামী কার্ন। এতে অবশ্য মনে কোনও দুঃখ নেই থেলমার, এমনভাবেই বাঁচতে চায়, চেয়েছে সবসময়... এই বিকৃত রুচিটার জন্যই ফ্রেডারিখ কার্নের আদর্শ সঙ্গিনী সে।

বরাবর যা হয়, আজও তা-ই ঘটল। রুমে পৌঁছে থেলমার উপর ধর্ষকের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল কার্ন, জামা-কাপড় ছিঁড়ে উদোম

করে ফেলল, তারপর শুরু হলো নির্যাতন! শরীরের বিভিন্ন অংশ টকটকে লাল হয়ে গেল থেলমার, একেকবার ব্যথায় গলা ফাটিয়ে চেঁচাল সে, আর তারই ফাঁকে চলল নির্দয় দৈহিক মিলন। পুরো ক্যাম্পের সবাই টের পেয়ে গেল, কী ঘটছে তাদের সেকেন্ড ইন কমান্ডের কেবিনে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বিছানায় কাতরাতে থাকা প্রেমিকাকে রেখে বেরিয়ে এল কার্ন, মেস হলে গিয়ে মুয়েলারকে খুঁজে বের করল। ল্যান্ড ক্রুজারের ড্রাইভার নুয়েনডর্ফকে নিয়ে জিয়ো-রিসার্চ টিমের নামমাত্র অধিনায়ক তখন মদ গিলছে।

'তল্লাশি কেমন চলছে?' মুখোমুখি বসতে বসতে প্রশ্ন করল কার্ন।

টকটকে লাল চোখে তার দিকে তাকাল মুয়েলার, এখনও মাতাল হয়নি সে, তবে হতে দেরি নেই। কার্নকে দেখে তার চেহারায় বিতৃষ্ণা ফুটল, লোকটা এইমাত্র পুরো বেসকে জানান দিয়ে ওর প্রাক্তন প্রেমিকাকে সম্ভোগ করে এসেছে। এরচেয়ে বড় অপমান আর কিছু হতে পারে না। গত একটা বছর ধরে সে আশায় আশায় বসে ছিল, থেলমার হয়তো ঘোর কাটবে, ফিরে আসবে ওর কাছে। কিন্তু আজ পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, তার আর কোনও সম্ভাবনা নেই। মুয়েলারের ভালবাসার মানুষটা আর অবশিষ্ট নেই মেয়েটার ভিতর, কার্নের মত নরপিশাচের কবলে পড়ে সে স্রেফ একটা বেশ্যায় পরিণত হয়েছে। জিয়ো-রিসার্চ গঠন করে কত বড় ভুল করেছে, তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মুয়েলার। প্রেমিকাকে তো হারিয়েছেই, প্রতিষ্ঠানটাও খুইয়েছে। এতদিন থেলমা বাড়াবাড়ি করলেও দলের উপর সামান্য নিয়ন্ত্রণ ছিল মুয়েলারের, কিন্তু কার্ন আসায় বোঝা যাচ্ছে, এবার সোজা নাকরে পরিণত হবে সে।

'কী হলো, কথা বলছ না কেন?' ধমকের সুরে বলল কার্ন।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুয়েলার। 'তিনটা টিম গত কয়েকদিন থেকে

বরফে খোঁজাখুঁজি করছে। তবে জানেনই তো, আমরা নির্দিষ্ট লোকেশনের অনেক দক্ষিণে আছি। এখানে কিছু পাওয়া না যাওয়ারই কথা।'

কার্ন মাথা দোলাল। 'হুঁ! অন্য টিমগুলো যখন চলে গেছে, এখানে আমাদের আর নাটক করার দরকার নেই। বেসের একটা অংশ উত্তরে আমাদের অরিজিন্যাল লোকেশনে শিফট করো।'

'রোটরস্ট্যাটটা লাগবে তা হলে।'

'জানি। ওটাকে অলরেডি এখানে আসতে বলে দিয়েছি আমি, যে-কোনও মুহূর্তে এসে পড়বে। রেডি হতে থাকো।'

'এত তাড়াতাড়ি!' বিস্মিত কণ্ঠে বলল নুয়েনডর্ফ। 'কিছু মনে করবেন না, হের কার্ন। কিন্তু ডিসি-থ্রী'র ওরা এয়ারশিপটাকে দেখতে পেয়ে সন্দেহ করে বসবে তো!'

'ওসব আমার মাথায় নেই ভেবেছ?' মুচকি হাসল কার্ন। 'বিমানের পাইলটকে একটা ভুয়া ওয়েদার রিপোর্ট দিয়েছি। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘুরপথে উত্তরদিকের একটা কোর্স ধরে আইসল্যান্ডে ফিরবে ওরা, রোটরস্ট্যাটের সঙ্গে দেখা হবে না।'

'এই অবৈধ শিফটিঙের জন্য এয়ারশিপটা ম্যানেজ করলেন কীভাবে, জানতে পারি?' প্রশ্ন করল মুয়েলার।

'ম্যানেজ করার কিছু নেই,' বলল কার্ন। 'ওটা আমাদেরই। যে কোম্পানি বানিয়েছে, সেটা স্যাকলিচেরই একটা সাবসিডিয়ারি। আমরা যেভাবে চাই, সেভাবেই চালাতে পারি। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও, অন্তত একটা বিল্ডিং আর স্নো-ক্যাটগুলো শিফট করতে হবে আমাদের। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে হবে, কুয়াশার একটা পূর্বাভাস পেয়েছি আমি। চারদিক ঢাকা পড়ে গেলে কিন্তু কাজে খুব অসুবিধে হবে।'

'প্রভিশনও তো নিতে হবে,' বলল মুয়েলার। 'উত্তরে ক'দিন থাকব আমরা?'

'সার্ভেয়ার্স সোসাইটির রিপ্লেসমেন্ট আসবার কথা আরও সতেরো দিন পর, ওটুকুই সময় আমাদের হাতে। এর পরে সমস্ত ইকুইপমেন্ট আর বিল্ডিং আবার এখানে ফিরিয়ে আনতে হবে, যাতে কেউ টের না পায়, আমরা ওদিকটায় গিয়েছিলাম।'

'শালার ড্যানিশ বানচোতেরা!' গাল দিয়ে উঠল নুয়েনডর্ফ। 'ওদের জন্যই যত ঝামেলা। ক্যাম্প ডিকেডের লোকেশনে জোর করে আমাদের পাঠিয়েছে! নইলে এত ছোটাছুটি, লুকোছাপা... কিচ্ছু করতে হতো না। হের কার্ন, আমাদের আসলে কিছুতেই রাজি হওয়া উচিত হয়নি প্রস্তাবটাতে।'

'ওটা প্রস্তাব নয়, সরাসরি অর্ডার ছিল। অন্য টিমদের সঙ্গে নিতে না চাইলে আমাদেরও এখানে আসতে দেয়া হতো না, বুঝেছ?' কথাগুলো কার্ন এমন স্বরে বলল, তাতে বোঝা গেল—এই পুরনো বিষয়টা নিয়ে আর কখনও উচ্চবাচ্য শুনতে চায় না সে। 'আর ব্যাপারটার গুরুত্ব কতখানি, তা তোমরা কেউ জানো না। স্যাকলিচের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে গুহাটা খুঁজে বের করার উপর।'

জার্মানির কর্পোরেট জগতের দুই প্রতিনিধির কথাবার্তায় মন নেই মুয়েলারের, এরা তার সাধের প্রতিষ্ঠানটাকে নিজেদের স্বার্থে কীভাবে ব্যবহার করছে—তা জেনে কষ্ট বাড়াতে চায় না। যদিও অবিশ্বাস্য অঙ্কের একটা অর্থ দেয়া হয়েছে বিনিময়ে, তারপরও টাকার অভাবে জিয়ো-রিসার্চকে বিক্রির কোনও ইচ্ছে ছিল না তার। শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিল শুধু একটা কারণে—স্যাকলিচের তরফ থেকে বলা হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানটার স্লিপিং ওউনার হবে তারা, জিয়ো-রিসার্চকে চলতে দেয়া হবে নিজের মত, মুয়েলারের তত্ত্বাবধানে, সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে, ইন্সটিটিউটের কষ্টার্জিত সুনাম ধ্বংসের মত কোনও কাজ করতে বলা হবে না কখনও।

প্রতিশ্রুতিটা তারা রক্ষা করেছে মাত্র এক বছর, তারপরই স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে ফ্রেডারিখ কার্ন আর তার বস—ইয়োহান

শ্নাইডার। মুহূর্তের দুর্বলতায় বিক্রি করে দেয়া প্রতিষ্ঠানটাকে এখন তার চোখের সামনে ব্যবহার করা হচ্ছে হীন স্বার্থে, এমন একটা কাজের জন্য ওটাকে আড়াল হিসেবে দাঁড় করানো হয়েছে, যেটার মূল উদ্দেশ্য মুয়েলারের অজানা। কেনই বা এরা বিশেষ একটা গুহা খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর সেখানে আছেই বা কী—এ নিয়ে তার ভিতর খুব একটা কৌতূহলও নেই। অপারেশনটা শুধু তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেলেই সে স্বস্তি পায়। মনে ক্ষীণ আশা—এ কাজটা সম্পন্ন হয়ে গেলে হয়তো তার সাধের প্রতিষ্ঠানটাকে আবার তার জিম্মায় ছেড়ে দেবে লোকগুলো।

মুয়েলারকে আনমনা দেখে কার্ন বলল, 'কী হে, তুমি চুপ করে আছ কেন?'

'এমনিতেই। আপনাদের এই অপারেশন শেষ হতে কদ্দিন লাগবে?'

'অস্থির হয়ে উঠেছ বুঝি?' হাসল কার্ন। 'চিন্তা কোরো না, খুব তাড়াতাড়িই সব শেষ হয়ে যাবে, তারপর আবার কোম্পানিটাকে তুমি নিজের মত চালাতে পারবে।'

'জাপানি টিমটা আসার আগে যদি গুহাটা খুঁজে না পান, তা হলে কী হবে?'

'প্রার্থনা করো যাতে তেমন কিছু না ঘটে,' গম্ভীর দেখাল কার্নকে। 'যাও, একটা ডর্ম বিল্ডিং আর স্নো-ক্যাটগুলো শিফটিঙের আয়োজন করো।'

মাথা ঝাঁকিয়ে মেস হল থেকে বেরিয়ে গেল মুয়েলার। কার্ন এগিয়ে গেল রেডিও সেটের দিকে, অপারেটর সেটা নিয়ে কাজ করছে। লোকটার কাঁধে টোকা দিয়ে জানতে চাইল, 'কদ্দূর এগোলে, গডফ্রিড?'

'এই তো, হয়ে গেছে প্রায়।'

'সোলার ম্যাক্সের ইন্টারফেয়ারেন্স কাটানো যাবে তো?'

'সমস্যা তো কিছুটা থাকবেই,' জানাল গডফ্রিড। 'তবে

এতদিন সবাইকে যেভাবে শোনানো হয়েছে, তেমন গুরুতর কিছু নয়। লং রেঞ্জ কমিউনিকেশনে অসুবিধা হতে পারে, তবে নিজোর্ডের সঙ্গে আমরা স্বাভাবিক যোগাযোগ রাখতে পারব।'

'আর বিমানের রেডিও... ওটা সম্পূর্ণ অচল হয়েছে তো?'

'জী স্যর,' হাসল তরুণ অপারেটর, পাইলটরা ডিসি-থ্রী থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ককপিটে গিয়ে ঢুকে স্যাবোটাজ করে এসেছে সে। 'আইসল্যান্ডের পথে অর্ধেক যাবার আগে ওরা বুঝতেই পারবে না যে কত বড় সর্বনাশ ঘটেছে।'

'হুঁ,' কার্নের মুখেও নিষ্ঠুর হাসি ফুটল। 'ওই অর্ধেক রাস্তাই ওদের দৌড় হতে যাচ্ছে।'

লিয়ার সরল স্বীকারোক্তি শুনে কোনও রাগ অনুভব করল না রানা, বরং কে ওর রুমে তল্লাশি চালিয়েছিল, এ বিষয়ক সন্দেহটা সঠিক প্রমাণিত হওয়ায় এক ধরনের স্বস্তি অনুভব করল। ঠিক পথেই তা হলে চিন্তাভাবনা করছে ও—এই মহিলা ডাক্তার স্রেফ একজন অভিযাত্রী নয়, গত ক'দিনে ঘটতে থাকা রহস্যময় ঘটনাগুলোর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। সেই সঙ্গে এটাও বোঝা যাচ্ছে, পুরো ব্যাপারটার জড় লুকিয়ে আছে আরও গভীরে, যার শুরুটা গ্রিনল্যান্ডে নয়, অন্য কোথাও... আরও আগেই হয়েছে। অন্তত ফ্রেডারিখ কার্নকে লিয়ার চিনতে পারা এবং সেবাস্টিয়ান গ্রাবের মৃত্যু সংক্রান্ত নতুন তথ্যটা তেমনই আভাস দিচ্ছে।

লিয়ার আচরণটা রানার ভিতর বিস্ময়ের জন্ম দিচ্ছে। শক্ত ধাতের মেয়ে মনে হয়েছিল তাকে; হেলিকপ্টার ক্র্যাশে ভেঙে পড়েনি, ক্যাম্প ডিকেঁডে আগুনের মাঝখানে আটকা পড়েও মোটামুটি অবিচলই ছিল, কিন্তু ফ্রেডারিখ কার্নকে দেখতে পেয়ে তার যেন ভিত নড়ে গেছে। শক্ত, সমর্থ, আত্মবিশ্বাসী লিয়ার সঙ্গে এই লিয়ার কোনও মিল নেই: মুখের রক্ত সরে গেছে, বিহ্বলতা গ্রাস করেছে তাকে, কেঁপে উঠছে সন্ত্রস্ত হরিণীর মত। কারণটা

কিছুটা আঁচ করতে পারছে রানা—নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়াটা মানুষের জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর স্মৃতি হয়ে থাকে, অবচেতন মন চেষ্টা করে সেটাকে চেপে রাখতে, কিন্তু কোনও কারণে সেই স্মৃতি আবারও মাথাচাড়া দিলে মানুষ সেটা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। মেয়েটাকে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছে হলো ওর, কিন্তু কী বলবে ভেবে পেল না। এখনও লিয়া বা সেবাস্টিয়ান গ্রাব সংশ্লিষ্ট সবকিছুই ঘোলাটে, না জেনে কিছু বলতে যাওয়া ঠিক হবে না।

ডিসি-থ্রী'র ভিতরকার প্রথম অর্ধেক হচ্ছে প্যাসেঞ্জার এরিয়া, পিছনেরটুকু কাপড়ের মোটা নেট লাগিয়ে আলাদা করা হয়েছে মালামাল রাখার জন্য। এই মুহূর্তে দুটো অংশই ভর্তি বলা চলে। কার্গো সেকশন ভরে আছে আনলোড না হওয়া নানা রকম জিনিসপত্রে; বিমানটার যা আকার, তাতে এই মুহূর্তে ভিতরে বসা দশজন যাত্রীর সংখ্যাটাও একেবারে কম বলা যায় না। নেটের ঠিক উল্টোপাশে সবচেয়ে পিছনের দুটো সিটে পাশাপাশি বসে আছে রানা আর লিয়া। একদম সামনের সারিতে রয়েছে সিলভিয়া আর হেইডি, জুরকিচ আর মুরল্যান্ড বসেছে মাঝামাঝি জায়গায়। অন্যান্য যাত্রীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

সবাইকে কিছুক্ষণ চুপচাপ দেখল রানা, তারপর লিয়ার দিকে ফিরল, মেয়েটা এখনও স্বাভাবিক হতে পারেনি। 'লিয়া, তুমি ঠিক আছ?'

কোনওমতে মাথা ঝাঁকাল লিয়া। 'ঠিক হয়ে যাব। সরি, লোকটাকে হঠাৎ আবার দেখতে পাবো, এটা আশা করিনি।'

'আমাদের মধ্যে সব পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, এখানে বড় ধরনের কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে, আর সেটার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে।'

'আমি কিছুই জানি না,' লিয়া বলল। 'আমার কাছেও সব

ঘোলাটে। কী ঘটছে, তা আমিও জানতে চাই।'

'তা হলে এসো, যে যা জানি খুলে বলি। হয়তো বুঝতে পারব, সেবাস্টিয়ান গ্রাব আর ম্যাক্সিম বোরোশিনকে কে বা কেন খুন করেছে।'

কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকিয়ে রইল লিয়া, যেন বোঝার চেষ্টা করছে, এই কোমল-কঠোর স্বভাবের মানুষটাকে বিশ্বাস করা যায় কি না। শেষে আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি আসলে কে বলো তো? মি. গ্রাবের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা কী?'

'কোনও সম্পর্কই নেই। আমি একটা প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন ফার্ম চালাই। গ্রিনল্যান্ডে আসার আগে প্রস্তুতির জন্য ক্যাম্প ডিকেড আর প্রজেক্ট আইসওয়ার্ম সংক্রান্ত রেফারেন্স চেয়েছিলাম কয়েক জায়গায়, সেটার সূত্র ধরেই একটা জার্নাল পাঠিয়েছেন মি. গ্রাব। তার সঙ্গে আমার কোনও পূর্ব-পরিচয় নেই, নামও শুনিনি কখনও।'

'কী আছে জার্নালটাতে?'

'জানি না, পড়ার সময় পাইনি,' রানা বলল । 'তা ছাড়া ওটা জার্মানে লেখা, ভাষাটা আমার জানা থাকলেও হাতে লেখা গোটা একটা জার্নাল গড় গড় করে পড়ে ফেলার মত পোক্ত নয়।'

'ওটার মধ্যে নিশ্চয়ই গোটা রহস্যটার ব্যাখ্যা আছে,' উত্তেজিত গলায় বলল লিয়া। 'আমাদের এখুনি ওটা পড়ে দেখতে হবে!'

'রাখো, রাখো! এত অস্থির হবার কিছু নেই, জার্নালটা পালিয়ে যাচ্ছে না। আগে বলো, জার্মানির সেবাস্টিয়ান গ্রাব এই গ্রিনল্যান্ডে ঘটতে থাকা ঘটনাগুলোর সঙ্গে কীভাবে জড়িত হলো? তুমিই বা তাকে চেনো কীভাবে?'

'বিস্তারিত বলতে সময় লাগবে, তাই সংক্ষেপে জানাচ্ছি। আমার দাদু একজন নাৎসি হান্টার, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় [illegible]

হওয়া আটাশ টন সোনার খোঁজ করছেন তিনি। মি. গ্রাব সেই আমলে আর্মি ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, সোনাগুলো সরানোর সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার প্রমাণ পেয়েছি আমরা। তাই লোকটাকে ইন্টারভিউ করতে গিয়েছিলাম আমি, সেখানেই ভদ্রলোককে টরচার করছিল ফ্রেডারিখ কার্ন। আমাকে গুলি করে লোকটা, গ্রাবকে খুন করে। মরার আগে বৃদ্ধ ভদ্রলোক শুধু এটুকু বলে গেছেন—সোনাটাই সব নয়, আরও বড় কিছু একটা লুকিয়ে আছে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে, আর মাসুদ রানা পারবে এই রহস্যটা সমাধান করতে... আমাকে সাহায্য করতে।'

'আজব ব্যাপার তো!' ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আমি তো এ ধরনের কোনও কিছুর বিন্দুবিসর্গও জানি না। কীভাবে সাহায্য করব?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন। জার্নালটা পড়লে হয়তো কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।'

'হুঁ,' রানা চিন্তিত হলো। 'মরার সময় গ্রাব যে এসব বলে গেছেন, তা কি ফ্রেডারিখ কার্ন জানে?'

'না, রহস্যময় এক স্নাইপারের হামলায় তার দুই সঙ্গী মারা পড়ে, তাকেও পালিয়ে যেতে হয়। সেজন্যই প্রাণে বেঁচে গেছি আমি।'

রানার চোখে বিস্ময় ফুটল। 'কে এই স্নাইপার?'

'জানি না। পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে আমরা দুজন আর কার্ন ছাড়াও আরও কেউ জড়িত, তারাই মি. গ্রাবকে তোমার সাহায্য নিতে পরামর্শ দিয়েছিল। এই যে... একই সময়ে তুমি, আমি আর ফ্রেডারিখ কার্ন গ্রিনল্যান্ডে হাজির হয়েছি—এটা কাকতালীয় কিছু হতে পারে না। কেউ একজন আড়াল থেকে কলকাঠি নাড়ছে।'

'এ তো দেখছি একের পর এক প্যাঁচ খাচ্ছে পুরো ঘটনাটা,' রানার গলায় দুশ্চিন্তা। 'আমরা দুজন নাহয় বৈজ্ঞানিক অভিযানে অংশ নিতে এখানে এসেছি, কিন্তু কার্ন লোকটা এখানে কী করতে

এসেছে?'

'ঈশ্বর জানেন। তবে ওর উদ্দেশ্য আর যা-ই হোক, ভাল কিছু হতে পারে না। লোকটা তোমাকে প্লেনে ওঠার সময় কী বলল?'

'শুভ কামনা জানাল,' তিক্ত গলায় বলল রানা। 'আর বলল এক ভদ্রমহিলার কথা...' বাক্যটা শেষ না করেই থমকে গেল ও। তাই তো! লোকটা হঠাৎ মিসেস গুডজনসেনের কথা বলতে গেল কেন?

'বসো একটু,' লিয়াকে অপেক্ষা করতে বলে সিটবেল্ট খুলে ফেলল রানা, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ককপিটের দিকে। ওকে দরজা খুলতে দেখে বিরক্ত চোখে তাকাল দুই পাইলট।

'কী ব্যাপার!'

'জাস্ট আ মিনিট, আমি বেশি সময় নেব না।' বলে দরজার পাশের বাল্কহেডের উপর নজর দিল রানা।

টেপ দিয়ে সাঁটা একটা ম্যানিলা এনভেলাপ দেখতে পেল ও, ওটা হাতে নিয়ে মুখটা খুলে ফেলল। বিমানের কাঁপুনির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে ভিতরের জিনিসগুলো বের করল—ফটোগ্রাফ ওগুলো। প্রথম দুটো এলমার গুডজনসেনের, যেগুলো রানাকে দেখিয়েছিলেন বৃদ্ধা—একটা হাসিখুশি উচ্ছল অবস্থার, অন্যটা মারা যাবার ক'দিন আগের। তৃতীয় ছবিটা দেখে বজ্রাহতের মত স্থির হয়ে গেল ও।

রোজালিন গুডজনসেনের লাশের ছবি ওটা—অসহায়ভাবে হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন বৃদ্ধা, দৃষ্টিতে কোনও প্রাণ নেই, কপালে তৃতীয় নয়নের মত ফুটে আছে একটা রক্তাক্ত গর্ত, গুলির আঘাতে সৃষ্টি হয়েছে।

মনের ভিতর হিংস্র একটা বাঘের মত লাফিয়ে উঠল ক্রোধ, দাঁতে দাঁত পিষল রানা—নিরীহ একজন বৃদ্ধাকে অকারণে খুন করা হয়েছে, ওর সঙ্গে কথা বলাটাই যেন অপরাধ ছিল বেচারির... এটা তারই মেসেজ। ইচ্ছে হলো এখুনি ফ্রেডারিখ

কার্নের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে, যদিও সেটা সম্ভব নয়—ছবিটা হাতে ধরে স্থবির হয়ে রইল ও। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে খানিক সময় নিল রানা, এই মুহূর্তে করার কিছু নেই ওর, তারমানে এই নয় যে বদমাশটাকে শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবে ও... অপেক্ষা শুধু সঠিক সময়ের।

আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছে রানা—লোকটা মানুষ, না পিশাচ? অসহায় একজন বৃদ্ধাকে বিনা কারণে মেরে ফেলতে পারল? ভদ্রমহিলা তো কিছুই জানতেন না! আর এই ছবিটা এখানে রেখে যাবার মত ঔদ্ধত্য দেখানোর মানেটা কী? সে কি বোকা, না উন্মাদ? খুনের প্রমাণ এভাবে প্রতিপক্ষের হাতে তুলে দেয় কেউ?

ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা ভাবল রানা। না, ফ্রেডারিখ কার্ন আর যা-ই হোক বোকা নয়। ছবিটা রেখে যাবার কারণ একটাই, তা হলো—রানা এটা কাউকে দেখাতে পারবে না, সুযোগই পাবে না। ক্যাম্প ডিকেডের আগুনটার কথা মনে পড়ল ওর—ওকে আর লিয়াকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল এরা। বোরোশিনকে যে খুন করা হয়েছে, তা শুধু ও আর লিয়াই জানে। এখন যদি ওদেরকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয়া যায়, সব ধামাচাপা পড়ে যাবে। লাশটা রয়ে গেছে ক্যাম্পে, সেটাকেও লুকিয়ে ফেলা কোনও কঠিন কাজ নয়। তার মানে ওদের মৃত্যুদণ্ড ঠিক করে ফেলা হয়েছে, আইসল্যান্ডে পৌঁছুতেই দেয়া হবে না। পরিস্থিতি যখন এমন, রোজালিন গুডজনসেনের খুনের প্রমাণ থাকা না থাকায় কিছু যায় আসে না, সেজন্যই ছবিটা রেখে গেছে কার্ন।

কিন্তু কীভাবে ওদের মারতে চাইছে শত্রুপক্ষ? কী করলে ওরা আইসল্যান্ডে পৌঁছুতে পারবে না? জবাব একটাই—প্লেন ক্র্যাশ। আগুনে পোড়ানোর চেয়ে অনেক সহজ কাজটা। ককপিটের উইন্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, নিঃসীম সুনীল সমুদ্র ছাড়া কোনও কিছু দেখতে পেল না। এখানে বিমানটা ক্র্যাশ করলে বাঁচা তো দূরের কথা, ওদের কারও লাশও আর খুঁজে পাওয়া

যাবে না। সত্যিই কি তা-ই করার মতলব এঁটেছে কার্ন? প্যাসেঞ্জার কেবিনের দিকে তাকাল ও, ওদের দুজনের মুখ বন্ধ রাখার জন্য এতগুলো নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলতে পারে কেউ? নিশ্চিত হবার উপায় একটাই। ওরা কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে কি না, সেটা দেখতে হবে। যদি ওদের মেরে ফেলারই আয়োজন করা হয়ে থাকে, তা হলে সবার আগে কমিউনিকেশন নষ্ট করে দেয়া হবে, যাতে কেউ বাইরের সাহায্য চাইতে না পারে।

ক্যাপ্টেনের দিকে ফিরল রানা। জানতে চাইল, 'আপনাদের রেডিও ঠিক আছে?'

পাইলটকে বেজায় বিরক্ত মনে হলো। 'সার, আপনার সিটে থাকা উচিত। এটা কোনও প্যাসেঞ্জার এয়ারলাইনার নয় যে টেকঅফের পর হাঁটাচলা করে বেড়াবেন। আমাদের স্ট্যাবিলিটিতে সমস্যা হচ্ছে।'

'ব্যাপারটা খুব জরুরি। রেডিওতে মেসেজ পাঠানো যাবে কি না তা-ই বলুন।'

রানার কণ্ঠে সম্ভবত কিছু একটা ছিল, ফলে ক্যাপ্টেনের কুঞ্চিত ভুরু সোজা হয়ে উঠল। বলল, 'দাঁড়ান দেখছি।' হেডসেট অ্যাডজাস্ট করে কনসোলের নব ঘোরাল সে। 'পাপা সিয়েরা ইলেভেন টু রেইকইয়াভিক। কাম ইন, প্লিজ।' কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে আবার ডাকল পাইলট। 'দিস ইজ পাপা সিয়েরা ইলেভেন কলিং রেইকইয়াভিক। রিপ্লাই, প্লিজ।' তবু নিরুত্তর অপরপক্ষ।

'রেডিও কাজ করছে না, তাই না?' রানার চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠেছে, ওর সন্দেহই তা হলে ঠিক।

'সোলার ম্যাক্সের প্রভাব হতে পারে,' খসখসে গলায় আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করল ক্যাপ্টেন। 'মাঝে মাঝে হয় এরকম।' কথাটা মনে হলো সে নিজেই বিশ্বাস করছে না।

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রানা। 'গ্রিনল্যান্ডের সীমানা পেরিয়ে এসেছি আমরা, এত দূরে সোলার ম্যাক্সের এফেক্ট প্রবল হবার কথা না। আইসল্যান্ড আর কতদূর?'

'যে রকম হেড উইন্ড পাচ্ছি, তাতে দু'ঘণ্টার বেশি লাগার কথা না।'

রানা নিশ্চিত, এতটা সময় পাবে না ওরা। 'ও পর্যন্ত যাওয়া যাবে না,' বলল ও। 'সবচেয়ে কাছের এয়ারপোর্ট কোন্‌টা?'

'কুলুসুক সামান্য কাছে হতে পারে, তবে ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না। ঝড় এড়ানোর জন্য আমরা একটা উত্তর-পূর্বমুখী কোর্স ফলো করছি।'

'কীসের ঝড়?'

'আপনাদের রিসার্চ বেস থেকেই তো বলা হলো ওটার কথা।'

আরেকটা মিথ্যে, বুঝতে পারল রানা। নরমাল ফ্লাইং রুট থেকে ওদের সরানোর জন্যই কথাটা বলা হয়েছে, যাতে ক্র্যাশ করার পর বিমানটা আর খুঁজে পাওয়া না যায়। জিয়ো-রিসার্চের কেউ রেসকিউ টিমকে জানাবে না যে ওরা বিকল্প একটা রুটে আইসল্যান্ডে যাচ্ছিল। দাঁতে দাঁত পিষল ও, ফাঁদটা ওরা বেশ ভালমতই পেতেছে।

'ঝড়-টড় কিচ্ছু নেই,' পাইলটদের বলল রানা। 'ভুয়া খবর দেয়া হয়েছে আপনাদের। তৈরি থাকুন, আমাদের সম্ভবত কোর্স পাল্টাতে হবে।'

'মানে! কেন ভুয়া খবর দেয়া হবে? কেনই বা কোর্স পাল্টাতে হবে?'

'ব্যাখ্যা করার সময় নেই। আমাদের সামনে বিরাট বিপদ। রেডি থাকুন, আমি জানাব কী করতে হবে।'

ককপিট থেকে বেরিয়ে এল রানা, মাথায় চিন্তার ঝড়। সন্দেহ নেই, মস্ত বিপদে পড়তে যাচ্ছে ওরা। বাঁচতে হলে জানতে হবে, কীভাবে প্লেনটাকে ক্র্যাশ করাতে যাচ্ছে শত্রুরা। কীভাবে?

ভালমত ভাবল রানা। ইঞ্জিনে স্যাবোটাজ করা হয়েছে? মনে হয় না, ল্যান্ড করার পর এতটা সময় পায়নি জিয়ো-রিসার্চের লোকজন। রিফুয়েলিংও করা হয়নি যে তেলের মধ্যে কিছু মিশিয়ে দেবে। তা হলে? ডিসি-থ্রী'র মত একটা নির্ভরযোগ্য কার্গো বিমানকে কীভাবে ক্র্যাশ করানো যেতে পারে? একটু ভাবতেই জবাবটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে।

বোমা! বোমা পাতা হয়েছে বিমানটাতে।

চার

বিপদটা কী, বুঝতে পেরে শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, কতক্ষণ সময় আছে কে জানে। দ্রুত বোমাটা খুঁজে বের করে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। সিটে বসা মুরল্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেল ও, স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে টেকঅফের পরপরই ঘুমিয়ে পড়েছে সে। আজব এক মানুষ, ডিসি-থ্রী'র ইঞ্জিনের গগনবিদারী আওয়াজেও তার কোনও সমস্যা হচ্ছে না, রীতিমত নাক ডাকাচ্ছে। কাছে গিয়ে ধাক্কা দিল রানা।

'ওঠো, ববি! বিরাট সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

হাই তুলে চোখ মেলল মুরল্যান্ড, আড়মোড়া ভাঙল আয়েশ করে। ঘুম জড়িত গলায় বলল, 'কী সমস্যা... স্টুয়ার্ডেস তোমার ড্রিঙ্ক দিতে ভুলে গেছে?'

'না, ভুল করে বিমানে একটা বোমা তুলে দিয়েছে কেউ। এয়ারপোর্টে গিয়ে নালিশ জানাতে হবে।' রানার গলায় পাল্টা রসিকতা।

ধড়মড় করে সোজা হলো মুরল্যান্ড। 'বলো কী! তুমি সিরিয়াস?'

'হ্যাঁ। আমাদের ডেস্টিনেশন পাল্টাতে চাইছে ওরা। আইসল্যান্ড নয়, পরপারে চলেছে বিমানটা।'

কথাটা বাকি সবার কানে গেছে, উত্তেজিত চেঁচামেচি শুরু হলো। গলা উঁচিয়ে রানা বলল, 'চুপ করুন সবাই! এখনই অস্থির হলে চলবে না। বোমাটা খুঁজে বের করতে হবে, সবাই হাত লাগান।'

দ্রুত এবং সুশৃঙ্খলভাবে চালানো হলো তল্লাশিটা। প্রথমে সমস্ত সিটের তলা পরীক্ষা করা হলো, এরপর খোঁজা হলো ককপিটে। যত ধরনের প্যানেল আছে, সব খুলে ফেলল ওরা, তারপর হাত দিল কার্গো সেকশনে।

নেটের তৈরি প্রোটেকটিভ দেয়ালটা খুলে ফেলল রানা, তারপর লিয়া, মুরল্যান্ড আর স্যামকে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। সাবধানে একটা একটা বাক্স খুলে দেখছে ওরা, নিশ্চিত হয়ে সরিয়ে ফেলছে সেগুলো। বোমাটা মোশন অ্যাক্টিভেটেড হবার সম্ভাবনা কম, সেক্ষেত্রে টেকঅফের সময়ই বিস্ফোরণ ঘটত। তারপরও সতর্কভাবে কাজ করছে ওরা, কী কেরামতি করা হয়েছে কে জানে, বোমাটায় কোনও ধরনের বুবি-ট্র্যাপ থাকতে পারে, খোঁজাখুঁজির সময় ফেটে যাক—এটা কাম্য নয় কারও।

একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা, বিমানের একদম পিছনে চলে এসেছে। এয়ার-কন্ডিশনিঙের উত্তাপ তেমন পৌঁছুচ্ছে না এখানটায়, ভীষণ ঠাণ্ডা; তবুও রীতিমত ঘেমে গেছে চারজনেই—উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায়। বুক ঢিপ ঢিপ করছে, হাতের ফাঁক গলে পেরিয়ে যাচ্ছে সময়, যে-কোনও মুহূর্তে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

এক এক করে সব বাক্সই দেখে ফেলল ওরা, বাকি রয়েছে মাত্র একটা। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতেই ওটার পিছন দিয়ে বেরিয়ে

আসা একটা চিকন তার দেখতে পেল রানা, অন্যপ্রান্তটা বিমানের গায়ে আঠা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে; বাক্সটা নাড়তে গেলেই টান খাবে তারে, ফাটবে বোমাটা। তারটা আসলে ট্রিপ-ওয়্যার।

'পেয়েছি!' বলল ও, একই সঙ্গে স্বস্তি আর উৎকণ্ঠা বোধ করছে। বোমা-টোমা পাতা হয়নি এমন একটা ক্ষীণ আশা যা-ও এতক্ষণ ছিল, তা এটা পেয়ে উবে গেছে।

বাকিরা ঘিরে দাঁড়াল রানাকে, সাবধানে কার্টনটার ঢাকনা খুলল ও, সিলের টেপটা কাটা ওটার। ভিতরটা পেপার টাওয়েলে ভর্তি, তবে একটা পাশ খালি করে সযত্নে রাখা হয়েছে বোমাটা—ছ'টা ডিনামাইটের স্টিক, টেপ জড়ানো। উপর দিয়ে একগাদা তার বেরিয়ে যুক্ত হয়েছে ডগায় বসানো একটা হাই-টেক ডিটোনেটরের সঙ্গে, ট্রিপ-ওয়্যারটা সংযুক্ত করা হয়েছে অ্যাক্টিভেটরের সাথে। ডিটোনেটরের সঙ্গে একটা এল.ই.ডি ডিসপ্লে রয়েছে, সেটার ডিজিটাল ঘড়িতে কাউন্টডাউন দেখাচ্ছে: আটষট্টি মিনিট বারো সেকেন্ড... এগারো সেকেন্ড... দশ সেকেন্ড। প্রতি মুহূর্তে কমছে সময়টা।

'মাই গড!' বিস্ফারিত কণ্ঠে বলল স্যাম। 'এটা কতটা শক্তিশালী? পুরো বিমান ধ্বংস করতে পারবে?'

'বিমান?' তিক্ত হাসি রানার ঠোঁটে। 'ছোটখাট একটা পাহাড় ধসিয়ে দেয়া যাবে এটা দিয়ে।'

'তুমি তো মনে হচ্ছে বোমা সম্পর্কে অনেক কিছু জানো,' বলল লিয়া। 'এটা ডি-অ্যাক্টিভেট করতে পারবে?'

'মনে হয় না,' রানা মাথা নাড়ল। 'খাঁটি প্রফেশনালের কাজ মনে হচ্ছে এটা, ডি-অ্যাক্টিভেশন ঠেকানোর জন্য ভিতরে কী ধরনের ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে, কে জানে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছাড়া চেষ্টা করতে গিয়ে অহেতুক ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না।'

'তা হলে?'

'বাব?' পরামর্শের আশায় বন্ধুর দিকে তাকাল রানা।

'ল্যান্ড করো,' দ্বিধা না করে মতামত দিল মুরল্যান্ড। 'এক ঘণ্টার কিছু বেশি সময় আছে আমাদের হাতে, চেষ্টা করলে ওটা ফাটার আগেই নেমে যেতে পারব। শুধু শুধু জিনিসটা ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক হবে না।'

'আমিও তা-ই ভাবছিলাম,' বলল রানা। 'স্যাম, পাইলটদের গিয়ে বলুন প্লেন ঘোরাতে। গ্রিনল্যান্ডে ফিরতে হবে আমাদের।'

'জিয়ো-রিসার্চ ক্যাম্পে?' লিয়ার গলায় ভয়। 'কার্ন যখন দেখবে, বোমায় আমাদের কিচ্ছু হয়নি, তখন সোজা গুলি চালাবে।'

'ক্যাম্পে যাব না আমরা,' শান্ত গলায় জানাল রানা। 'অন্য কোথাও নামব।' পরিকল্পনাটা খুলে বলল ও। 'স্যাম, যান আপনি... প্লেন ঘোরাতে বলুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল স্যাম।

'তোমরা দুজন বোমাটার চারপাশে যত পারো বাক্স জড়ো করো, যাতে ঝাঁকি-টাঁকিতে ওই বাক্সটা নড়ে গিয়ে ট্রিপ-ওয়্যারটা টান না খায়,' লিয়া আর মুরল্যান্ডকে কাজ ধরিয়ে দিয়ে কার্গো সেকশন থেকে বেরিয়ে এল রানা। মাথায় একরাশ চিন্তা।

কী করবে তা ইতোমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে ও, কিন্তু পরিকল্পনাটার মধ্যে ঝুঁকি রয়েছে প্রচুর। যে একটা ঘণ্টা সময় আছে, তাতে জিয়ো-রিসার্চ ক্যাম্প ছাড়া আর কোনও মনুষ্যবসতিতে পৌঁছানো সম্ভব নয়; এ-কারণে ওরা যেখানেই নামুক, আশপাশে সভ্যজগৎ পাওয়া যাবে না। এয়ারস্ট্রিপ নিয়ে ভাবছে না ও, ডিসি-থ্রী'র তলায় স্কি লাগানো আছে, মোটামুটি সমতল একখণ্ড জমি পেলেই বিমানটা ল্যান্ড করতে পারবে। সমস্যাটা দেখা দেবে নামার পরে। বিস্ফোরণশেষে বিমানটার যতটুকু অবশিষ্ট থাকবে, সেটা পাইলট আর যাত্রীসহ মোট বারোজন মানুষকে আশ্রয় দিতে পারবে বলে মনে হয় না। আর গ্রিনল্যান্ডের এই ঠাণ্ডায় খোলা জায়গায় পড়ে থাকতে হলে ওদের

একজনও বাঁচবে না। সমস্যাটার একটা সমাধান অবশ্য আছে ওর কাছে, কিন্তু সেটার উৎস এমন একজন মানুষ, যে কি না পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় আগে মারা গেছে।

পকেট থেকে মেজর কনওয়ের লাশের শরীরে পাওয়া ম্যাপটা বের করল রানা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। ল্যাটিচিউড-লঙ্গিচিউডসহ বেশ যত্নের সঙ্গে মানচিত্রটা এঁকেছে মৃত পাইলট, ক্র্যাশ করা সি-নাইন্টি সেভেনটা মার্কিং করা হয়েছে নিখুঁতভাবে। ওটা খুঁজে পাওয়া গেলে ধ্বংসাবশেষে আশ্রয় নিতে পারবে ওরা। বিমানটায় থিউলি বেসের জন্য সাপ্লাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সেগুলো দিয়ে হয়তো জীবনও বাঁচানো যাবে।

কিন্তু যতটা সহজ মনে হচ্ছে, ক্র্যাশ সাইটটা পাওয়া তত সহজ নয়। পঞ্চাশ বছরেরও বেশি পুরনো ম্যাপ এটা, রীডিংগুলো আজও অপরিবর্তিত রয়েছে—এমনটা আশা করা বোকামি হবে। কম্পাসের ম্যাগনেটিক নর্থ কোনও স্থির বিন্দু নয়। পৃথিবীর ঘূর্ণায়মান অভ্যন্তরের চৌম্বকত্বের প্রভাবে ওটা একদিনেই পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত এদিক-সেদিক হতে পারে, তা ছাড়া প্রতি বছর ম্যাগনেটিক নর্থ গড়ে নয় মাইল সরে যাচ্ছে। ক্র্যাশ করা বিমানটা খুঁজে পেতে হলে গত অর্ধশতাব্দীর এই ড্রিফট হিসেব করে বের করতে হবে। হিসেবটাই কঠিন, তবে আশার বাণী এটাই—যে এলাকায় সি-নাইন্টি সেভেন ক্র্যাশ করেছে, সেটা সম্পর্কে ধারণা আছে ওর। পুরো গ্রিনল্যান্ডে সবচেয়ে কম তুষারপাত হয় ওই অঞ্চলে, বিমানটা বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে, এমন ভয় কম।

কাত হয়ে ঘুরতে শুরু করেছে ডিসি-থ্রী, নিজের সিটে এসে বসল রানা, হ্যান্ডব্যাগ থেকে কাগজ-কলম আর ক্যালকুলেটর বের করে হিসেব-নিকেশ করতে শুরু করল। ক্যাম্প ডিকেড থেকে ক্র্যাশসাইট পর্যন্ত মেজর কনওয়ের যাত্রাপথটা ব্যাকট্র্যাক করে সি-নাইন্টি সেভেনের সঠিক লোকেশন বের করতে হবে ওকে,

ম্যাগনেটিক নর্থের ড্রিফটের কারণে ওর সার্চ এরিয়া প্রায় সাড়ে চারশো মাইলের মত হতে যাচ্ছে। কপালে ঘাম জমল রানার, কোনও রকম ভুল করা চলবে না, সঠিক হিসেবের উপর নির্ভর করছে সবার বাঁচা-মরা। জিয়ো-রিসার্চ, ফ্রেডারিখ কার্ন, সেবাস্টিয়ান গ্রাব, ম্যাক্সিম বোরোশিন, বোমা... সবকিছু মন থেকে ঝেড়ে ফেলল ও, দ্রুত ক্যালকুলেশন করে কাগজে একটার পর একটা ডেটা তুলতে লাগল।

কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় কাঁধে কে যেন হাত রাখল। চোখ তুলে দেজান জুরকিচকে দেখতে পেল রানা।

'কোনও সাহায্য করতে পারি?' জানতে চাইল আবহাওয়াবিদ।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'স্যামের স্যাটেলাইট ফোনটা নিয়ে আসুন, কোথায় ল্যান্ড করতে যাচ্ছি সেটা মে-ডে'র মাধ্যমে জানাতে হবে।'

'দুঃখিত,' জুরকিচের গলায় হতাশা। 'আমরা ইতোমধ্যে চেষ্টা করে দেখেছি, কাজ করছে না ফোনটা। সোলার ম্যাক্স আমাদের ডুবিয়েছে।'

'সেক্ষেত্রে সিটে বসে প্রার্থনা করুন। আল্লাহ-খোদায় বিশ্বাস করেন?'

'এখন করছি।'

'গুড। তা হলে যান সিটে, আমি হিসেবটা শেষ করে আপনাকে দেব। কোনও ভুল আছে কি না বলবেন।'

আরও পাঁচ মিনিট লাগল ক্যালকুলেশন শেষ হতে, তারপর জুরকিচের হাতে কাগজটা গছিয়ে কার্গো সেকশনের পিছনে চলে গেল রানা। মুরল্যান্ড, লিয়া আর স্যাম মিলে বোমাটার চারপাশে মোটামুটি বড়সড় একটা স্তূপ করে ফেলেছে কার্টন আর বাক্সের। দেখে সন্তুষ্ট বোধ করল ও, আপাতত কাজ চলবে, ঝাঁকি খাবে না বোমাটা।

'আর কতক্ষণ?' জানতে চাইল রানা।

ঘড়ির দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'পঁয়তাল্লিশ মিনিট ত্রিশ সেকেন্ড।'

'পাইলটের সঙ্গে একটু আগে কথা বলে এসেছি আমি,' জানাল স্যাম। 'গ্রিনল্যান্ডের কোস্টলাইন পেরুতে আরও পনেরো মিনিট লাগবে।'

'টার্গেট এরিয়ায় পৌছুতে আরও তিন থেকে পাঁচ মিনিট,' যোগ করল রানা। 'হিসেব করে ফেলেছি আমি। তবে ক্র্যাশসাইটটা খুঁজে পেতে সময় লাগবে।'

'ল্যান্ড করার পর সরে যাবার জন্য খুব একটা সময় পাচ্ছি না আমরা,' নালিশের ভঙ্গিতে বলল মুরল্যান্ড।

'জানি,' রানা বলল। 'কিন্তু কিছুই করার নেই।'

'ওই ভাঙা প্লেনটা যদি না পাওয়া যায় তা হলে কী হবে?' জিজ্ঞেস করল স্যাম।

'সেক্ষেত্রে প্রার্থনা করুন, যাতে এটার ছাল-চামড়া কিছুটা বাঁচে। নইলে মাথা গোঁজার কোনও ঠাঁই থাকবে না আমাদের।'

'আমরা রি-সাপ্লাইয়ের মালামাল থেকে কিছু জিনিসপত্র আলাদা করে রেখেছি—শুকনো খাবার, ক্যাম্পিং সাপ্লাই, কুকিং ফুয়েল... এসব,' জানাল মুরল্যান্ড। 'ল্যান্ড করার পর সবার হাতে তুলে দেব নিয়ে যাওয়ার জন্য। শুধু মাথা গুঁজতে পারলে হয়, ক্র্যাশ করা বিমানটা না পেলেও কয়েকদিন কাটিয়ে দেয়া যাবে।'

'ভাল বুদ্ধি করেছ,' মন্তব্য করল রানা। 'খুব ভাল!'

'আইডিয়াটা ডা. নোভাকের।'

লিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। 'বাহ্! রূপ, সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধি... তোমার দেখি গুণের অভাব নেই। দোষত্রুটি আছে কোনও?'

'এক গ্লাস মদ খেলেই আমি মাতাল হয়ে যাই,' লিয়াও হাসল।

'এটাকে দোষ বলছ? আমি তো বলব ওটা সফল একটা ডেটিঙের অব্যর্থ অস্ত্র।'

লিয়ার চেহারায় কপট রাগ ফুটল। 'তোমরা পুরুষরা সব এক রকম। খালি মেয়েদের এসব দুর্বলতাই খোঁজো, তাই না?'

হালকা পরিবেশটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না, আসন্ন বিপদটার চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছে না কেউ। কিছুক্ষণ পর বিমানটা যখন তটরেখা অতিক্রম করল, সবাইকে দুপাশের জানালায় দাঁড় করিয়ে দিল রানা। টার্গেট এরিয়ায় পৌঁছুতে যদিও এখনও কয়েক মিনিট বাকি আছে, তারপরও সবার দৃষ্টি নীচের টপোগ্রাফির সঙ্গে মানিয়ে নেয়া প্রয়োজন, যাতে সি-নাইন্টি সেভেনটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে স্পট করতে পারে। ইতোমধ্যে পাইলটদের ল্যাটিচিউড আর লঙ্গিচিউড জানিয়ে দেয়া হয়েছে, কোস্টলাইন পেরিয়েই কোর্স অ্যাডজাস্ট করে নিল তারা, মুখ ঘুরিয়ে উত্তর-উত্তরপূর্বমুখী হয়ে ছুটতে থাকল ডিসি-থ্রী, ধীরে ধীরে উচ্চতা কমাচ্ছে।

বিমানের নীচে গ্রিনল্যান্ডের অবিশ্বাস্য বরফ দেখতে পাচ্ছে সবাই, একটানা অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে চায়। উঁচু-নিচু পর্বতমালা পেরিয়ে নির্দিষ্ট এলাকার কাছে চলে এল আকাশযানটা, এতক্ষণে রানার ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো। এই অঞ্চলে আসলেই তুষারপাত কম হয়, হিমপ্রবাহও নেই তেমন একটা। জিয়ো-রিসার্চ ক্যাম্পের চারপাশে বরফের কারণে সাদা ছাড়া অন্য কোনও রং দেখা যেত না, অথচ এখানে শুভ্রতার রাজত্ব তুলনামূলকভাবে অনেক কম। বরফ আছে যদিও, সেগুলোর বুক চিরে বেরিয়ে এসেছে নগ্ন পাথর—তুষারের আবরণবিহীন পাহাড় আর টিলার চূড়া ওগুলো। ক্র্যাশ করা স্ট্র্যাটোফ্রেইটারটাকে পাবার সম্ভাবনা ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। যে রকম পরিবেশ দেখা যাচ্ছে, বিমানটা পুরোপুরি না হলেও অনেকটাই অনাচ্ছাদিত থাকার কথা।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল কোনও রকম ফলাফল ছাড়া, মাটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ ব্যথা করে ফেলল সবাই, কিন্তু সি-নাইন্টি সেভেনের কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। ককপিটে রয়েছে রানা, হাতে রেখেছে গাইগার কাউন্টারটা, কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না। উইন্ডশীল্ড দিয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে ও, ঘড়ি দেখে অস্থির হয়ে উঠল। আর মাত্র দশ মিনিট চালানো যাবে তল্লাশি, তারপর বিমানটা পাওয়া যাক বা না যাক, ল্যান্ড করতেই হবে ওদের, বিস্ফোরণের আগে নিরাপদ দূরত্বে সরতে হলে বাকি সময়টুকু লাগবে।

'মি. রানা!' খোলা দরজা দিয়ে প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে জুরকিচের দলের এক সদস্যের ডাক শোনা গেল, ভদ্রলোকের নাম উইলহেলম্ ক্রাস। 'পেয়েছি!'

'কোথায়?' সাগ্রহে জানতে চাইল রানা।

'ডানদিকে... চার কিলোমিটার সামনে। ওই যে, হাঙরের ডানার মত একটা তেকোনা জিনিস বেরিয়ে আছে... দেখতে পাচ্ছেন না?'

পাইলটের বিনকিউলারটা তুলে চোখে ঠেকাল রানা—হ্যাঁ, তা-ই তো! উঁচু হয়ে আছে জিনিসটা, টেইল ফিনের মত। সঙ্গে ফিউজলাজের আকৃতির মত বরফ ঢাকা টিউবও আছে মনে হচ্ছে। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে ভালমত তাকাল ও, পরমুহূর্তে দমে গেল। টিউবটা অসম্ভব রুক্ষ... বিমান নয় ওটা, টিউব আকৃতির একটা রক ফর্মেশন।

'সরি, মি. ক্রাল। ওটা পাথর... বিমান না।'

'ধেত্তেরি!' সখেদে বলল মুরল্যান্ড। 'প্রকৃতিও দেখছি আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে।'

'মাথা ঠাণ্ডা রাখো,' বলল রানা। 'আছে ওটা নীচে কোথাও. মিস যেন না হয়।'

মিনিট খানেক পরেই উত্তেজিত হয়ে উঠল কো-পাইলট, ওকে

টোকা দিয়ে আঙুল তুলে দেখাল, 'ওই যে... ওই-ই-ই!'

দেখল রানা। সামনেই কয়েক মাইল দূরে একটা খাঁড়ি আছে, সেটা কিনারা ধরে বেড়ে ওঠা এক সারি পাহাড়ের সামনে কবরফলকের মত উঁচু হয়ে আছে ইস্পাতের একটা বিশাল টুকরো; অর্ধশতকের গ্লেশিয়াল মুভমেন্টে সেটার শরীর দুমড়ে-মুচড়ে গেলেও বিমানের ডানার অংশ হিসেবে চিনতে অসুবিধে হচ্ছে না। বিনকিউলার দিয়ে ভাল করে দেখল রানা, একশো গজ দূরে নিচু একটা রিজের উপর আরও একটা টুকরো সনাক্ত করতে পারল।

পাহাড়শ্রেণীর ফর্মেশন দেখে দুর্ভাগা স্ট্র্যাটোফ্রেইটারটার কপালে কী ঘটেছিল, তা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। একটা অ্যাভালাঞ্চ চ্যানেলে ক্র্যাশ করেছিল বিমানটা, ওটার ধাক্কায় বরফধস নামে পাহাড়ের গা থেকে, সি-নাইন্টি সেভেনকে কবর দিয়ে ফেলে। এ কারণেই ওটাকে আর খুঁজে পায়নি অ্যামেরিকানরা। তবে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়ায় গলে গেছে বরফ, নতুন করে ভারি তুষারপাত না হওয়ায় ওটা আর ঢেকেও যায়নি। গ্রিনল্যান্ডের এ এলাকাটা জনবিবর্জিত, অভিযাত্রীরাও আসে না কখনও, তাই কবর থেকে বেরিয়ে আসার পরও ওটার সন্ধান পায়নি কেউ।

গাইগার কাউন্টারের দিকে তাকাল রানা। ওটার কাঁটা এখনও অনড়, তারপরও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ও, মেজর কনওয়ের লাশে পাওয়া তেজস্ক্রিয়তার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে বার বার। পাইলটদের আগেই বলে রেখেছে, স্ট্র্যাটোফ্রেইটারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেলে যেন ওটার অন্তত তিন মাইল দূরে ল্যান্ড করে। বোমার হাত থেকে বেঁচে আবার রেডিয়েশনে মরার কোনও মানে হয় না। ঘড়ি দেখল ও, টাইমটেবল অনুসারে আর মাত্র দু'মিনিট বাকি আছে। তার মানে আগামী বারো মিনিটের ভিতর ল্যান্ড করে ডিসি-থ্রী থেকে সরে যেতে হবে ওদের।

ক্যাপ্টেনের কাঁধে টোকা দিয়ে ল্যান্ড করতে ইশারা করল রানা, তারপর প্যাসেঞ্জার কেবিনে ফিরে এল সিটে বসার জন্য। গলা উঁচু করে বলল, 'ধ্বংসাবশেষটা পাওয়া গেছে, সবাই সিটে বসে সিটবেল্ট বাঁধুন। প্লেনটা এখুনি ল্যান্ড করবে।'

নিজের সিটে ফিরে লিয়ার পাশে বসল ও। ডাক্তারের মুখ ছাই বর্ণ হয়ে আছে, ফিসফিস করে বলল, 'আমার ভয় করছে।'

'শুধু শুধু ভয় পেয়ো না তো!' রানা হাসিমুখে অভয় দিল। 'হেলিকপ্টার ক্র্যাশ থেকে বেঁচেছ কি প্লেন ক্র্যাশে মরার জন্য? উঁহুঁ, ওপরঅলা এত নিষ্ঠুর না।'

'তুমি এত শান্ত আছ কী করে?' লিয়ার গলায় বিস্ময়।

রানা নিজেও অবশ্য নার্ভাস, তবে সেটা প্রকাশ করে বাকিদের আতঙ্কিত করার মানে হয় না। সহজ গলায় ও বলল, 'অস্থির হবার তো কিছু নেই। ভুলে যেয়ো না, এই বিমানটা বরফের উপর ল্যান্ড করার উপযোগী করে বানানো হয়েছে। পাইলটরাও অভিজ্ঞ, আমাদের কোনও ভয় নেই।'

স্পিকার জ্যান্ত হয়ে উঠল, কো-পাইলট সবাইকে ক্র্যাশ ল্যান্ডিঙের জন্য তৈরি থাকতে বলছে। আকাশভ্রমণে ওদের কেউই নতুন নয়, কী করতে হবে জানা আছে। সামনে ঝুঁকে মাথা গুঁজে দুহাতে হাঁটু আঁকড়ে ধরল দশ জন যাত্রী, ঝাঁকি সামলানোর জন্য তৈরি হয়ে আছে।

কিন্তু খানিক পরেই প্রমাণ হয়ে গেল, ভয়াবহ পরিস্থিতিটার জন্য এই পজিশনটা যথেষ্ট নয়।

নাক উঁচু করে পিছনের দুই স্কি'র উপর ভর দিয়ে নামল বিমানটা, প্রথম ধাক্কাতেই হাত ছুটে গেল প্রায় সবার, সামনের স্কি-টা যখন মাটিতে বাড়ি খেল, বুক থেকে শ্বাস বেরিয়ে গেল যাত্রীদের। রুক্ষ-বন্ধুর বরফের উপর দিয়ে প্রবল ঝাঁকি খেতে খেতে ছুটছে ডিসি-থ্রী, সিট থেকে ছিটকে পড়ে যাবার মত অবস্থা হলো আরোহীদের, সিটবেল্ট বাঁধা থাকায় পড়ল না বটে, তবে

সেগুলো ভারি কাপড় ভেদ করে কোমরের মাংস কেটে বসে যেতে চাইল। আতঙ্কে কান্না জুড়ে দিল সিলভিয়া আর হেইডি, অন্যেরাও চেঁচাচ্ছে।

বিপদ আরও বাড়ল সামনের স্কি-টা হঠাৎ শক্ত এক খণ্ড বরফে আটকে যাওয়ায়। গোটা বিমানটা প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি খেল, যাত্রীদের নাক-মুখ বাড়ি খেল যার যার সামনের সিটের পিছনে, ফিউজলাজটা এমনভাবে আর্তনাদ করে উঠল যেন দুমড়ে-মুচড়ে যাবে। ব্যালান্স সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল ডিসি-থ্রী'র, নাকটা গিয়ে বাড়ি খেল বরফে, পিছনটা উঠে গেছে আকাশে। প্রচণ্ড গতির কারণে থামল না যান্ত্রিক পাখিটা, নাকখত দিতে দিতে ছুটতেই থাকল। সবচেয়ে পিছনের সিট থেকেও উইণ্ডশীল্ড ভেঙে যাওয়ার কর্কশ আওয়াজ পেল রানা, পাইলটদের চিৎকারও শুনল—ককপিটটা বরফে ভরে যাচ্ছে! একটু পরেই দরজা ভেঙে বেরিয়ে এল রাশ রাশ তুষার, তার ধাক্কায় সামনের একটা সিট ভেঙে উড়ে যেতে দেখল ও, সোজা গিয়ে বাল্কহেডে নির্মমভাবে বাড়ি খেল সেটা। তাণ্ডবের ভিতরও সিটটার চারপাশ দিয়ে রক্ত ছিটকাতে দেখা গেল—ওটায় বসা ছিল উইলহেলম্ ক্রাস আর তার এক সঙ্গী, দুজনেই থেঁতলে গেছে।

নাক গুঁজে এগোতে এগোতে এবার এক পাশে কাত হতে শুরু করল ডিসি-থ্রী, ডানা ভাঙার গগনবিদারী শব্দ হলো, একই সঙ্গে খসে পড়ল লেজের একটা অংশ। জানালার কাঁচ ভাঙতে শুরু করল এবার, তীক্ষ্ণ বর্শার মত ছুটে আসছে ধারালো একেকটা টুকরো।

'মাথা নামান!' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'মাথা নামান সবাই!'

অন্যদের সতর্ক করতে গিয়ে নিজে দেরি করে ফেলেছে, একটা কাঁচ রানার গালে আঁচড় কেটে বেরিয়ে গেল। মুহূর্তেই জ্বালা অনুভব করল ও, কাটা থেকে গড়াতে শুরু করেছে উষ্ণ রক্ত, গালে উত্তাপটা অনুভব করল। পরমুহূর্তেই ভারি কিছু একটা

আঘাত করল মাথায়, চোখের সামনে জ্বলে উঠল লাল-নীল-হলুদ হাজারটা ফুল।

জ্ঞান হারাল ও।

পাঁচ

সংজ্ঞা ফেরার পর কয়েক মুহূর্ত নিস্তেজভাবে পড়ে রইল রানা. কেমন যেন আচ্ছন্নের মত লাগছে, পারিপার্শ্বিকতার কথা মনে করতে পারছে না। সিটের পাশে একটা সুটকেস পড়ে থাকতে দেখল—কারও লাগেজ ওটা, ঝাঁকুনিতে উড়ে এসে মাথায় পড়েছিল। মাথা নেড়ে আচ্ছন্নতা কাটাবার চেষ্টা করল ও, সংবিৎ ফিরতেই সচকিত হলো, সব মনে পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি তাকাল বিমানের পিছন দিকে, স্বস্তি পেল। মুরল্যান্ডকে সোনার মেডেল দিতে ইচ্ছে করছে—কীভাবে যেন নেট পেঁচিয়ে বোমা আর সেটার আশপাশের বাক্সগুলো বেঁধেছে সে, এতকিছুর পরও সেগুলো ছিটকে যায়নি। ট্রিপওয়্যারটা টান খেলে এতক্ষণে চলে যেত পরপারে।

এবার চারপাশে নজর বোলানোর ফুরসত মিলল। ঘষা খেতে খেতে গতি কমে থেমে গেছে বিমানটা, বরফে শরীর গুঁজে একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। আরোহীদের অনেকেই জ্ঞান হারিয়েছে, যারা হারায়নি তারা ব্যথায় গোঙাচ্ছে। সামনের দিকটা একদম নীরব, ককপিটের দরজার জায়গায় এখন তুষারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর, ভিতরে পাইলটরা চাপা পড়ে গেছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল রানা. টাইমটেবলে চার

মিনিট পিছিয়ে গেছে ওরা। তাড়াতাড়ি সিটবেল্ট খুলে মেঝেতে পা রাখল ও, এগিয়ে গিয়ে মুরল্যান্ডকে ধাক্কা দিল।

'ববি, কুইক! এখুনি বেরোতে হবে আমাদের। সবাইকে ওঠাও! হাতে যতটুকু পারে সাপ্লাই নিয়ে বেরিয়ে যেতে বলো!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুরল্যান্ড, জুরকিচের বাঁধন খুলে তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল। দুজনেই চলে গেল কার্গো সেকশন থেকে সাপ্লাই আনতে। লিয়ার দিকে এগোল রানা।

'ব্যথা পেয়েছ?'

লিয়ার কপাল কেটে রক্ত ঝরছে, তারপরও ইতিবাচক জবাব দিল। 'না না, কিচ্ছু হয়নি।'

'তা হলে ওঠো, সময় নেই আমাদের হাতে।'

হারনেস খুলে উঠে দাঁড়াল লিয়া। 'কোনওদিন ভাবিনি এরকম পর পর দুটো ক্র্যাশের কবলে পড়ব। মরিনি, সেটাকে সৌভাগ্য না দুর্ভাগ্য বলব, বুঝতে পারছি না। তবে জীবনে আর কখনও আকাশে ওড়ার ইচ্ছে নেই আমার।'

'নিজে নিজে বেরুতে পারবে?'

মাথা ঝাঁকাল লিয়া, তবে সঙ্গে সঙ্গে টলে উঠল। বোঝা যাচ্ছে, মুখে যেভাবে বলছে, ততটা সুস্থ নয় সে। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল রানা, চেঁচিয়ে মুরল্যান্ডকে ডেকে বলল, 'ববি! এখানে সাহায্য দরকার!'

জুরকিচকে পাঠিয়ে দিয়েছে মুরল্যান্ড, নিজেও এক দফা সাপ্লাই রেখে এসেছে, রানার ডাকে প্লেনের ভিতরে ফিরে এল। লিয়াকে বন্ধুর বাহুতে এলানো অবস্থায় দেখে যা বোঝার বুঝে নিল সে, বলল, 'আমি দেখছি ওকে। তুমি অন্যদের সাহায্য করো।'

মেয়েটার হালকা শরীর তুলাভর্তি বালিশের মত অনায়াসে কাঁধে তুলে নিল মুরল্যান্ড, বেরিয়ে গেল বিমান থেকে। রানা সামনের দিকে এগোল, স্যাম র‍্যামসে এখনও বসে আছে সিটে,

কেমন যেন ঘোলাটে তার দৃষ্টি।

'স্যাম, এখনও বসে কেন?' ধমক দিল রানা। 'উঠুন জলদি!'

হাত তুলে পাশে বসা জিগলারকে দেখাল স্যাম, সিটে অসহায়ভাবে এলিয়ে আছে সে, গলার একটা পাশ ভিজে আছে রক্তে। 'ওকে... ওকে দেখুন।'

দেখার কিছু নেই, এক দৃষ্টিতেই বুঝে নিল রানা। জানালার ভাঙা কাঁচ গলার ডান পাশ দিয়ে ঢুকেছে তরুণ জার্মানের, রক্তবাহী ধমনী কেটে ফেলেছে, আর বেঁচে নেই বেচারা।

'সরি, ও নেই,' শান্ত গলায় জানাল ও। 'আপনি উঠুন। দেরি করা ঠিক হবে না। পিছনে সাপ্লাই আছে, যতটুকু পারেন নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।'

স্যামকে কাজে নামিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল রানা, দুই কুকের অবস্থা দেখতে। সামনে গিয়ে থমকে গেল ও, দুটো দেহই নিথর হয়ে আছে। হেইডিকে পরীক্ষা করার প্রয়োজন নেই, মাথাটা বিশ্রীভাবে একদিকে পড়ে থাকা দেখেই বোঝা যাচ্ছে—ঘাড় মটকে গেছে নিরীহ মেয়েটার। প্রচণ্ড ঝাঁকি সহ্য করতে পারেনি তার শিরদাঁড়া, ঘাড়ের কাছে দু'টুকরো হয়ে গেছে। রাগে শরীর জ্বলছে রানার; এই নিয়ে ছ'জন মরল... দুই পাইলট, জুরকিচের টিমের দুই আবহাওয়াবিদ, জিগলার আর হেইডি। ফ্রেডারিখ কার্ন দায়ী এদের মৃত্যুর জন্য, লোকটাকে নিজের হাতে শায়েস্তা করতে না পারলে ও শান্তি পাবে না। সিলভিয়ার আশাও ছেড়ে দিচ্ছিল, হঠাৎ দেহটা নড়ে ওঠায় ভুল ভাঙল। তাড়াতাড়ি বিশালদেহী কুককে সোজা করল ও, বেচারি এখনও অজ্ঞান, গালে চাপড় দিয়ে কাজ হলো না। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত, মুরল্যান্ডকে ডাকার সুযোগ নেই, সিটবেল্ট খুলে ভারি দেহটা কাঁধে তুলে নিল রানা।

অসম্ভব ওজন সিলভিয়ার, দুই শ' পাউন্ডের কম হবে না, কয়েক পা এগিয়ে হাঁপিয়ে গেল রানা। বিড়বিড় করে অজ্ঞান

রাঁধুনিকে শাপ-শাপান্ত করল, 'যা রান্না করো, তার সবটাই না চাখলে কি চলে না তোমার?' অবশ্য মুখে যা-ই বলুক, হাল ছাড়ল না ও, পায়ে পায়ে এগোতে থাকল একজিটের দিকে, পরিশ্রমে ঘাম ঝরতে থাকল ওর, গালের কাটা জায়গাটায় লেগে জ্বালাপোড়া শুরু হলো।

মুরল্যান্ডকে দেখা গেল দরজায়। 'আমার হ্যাভারস্যাকটা নাও,' বলল রানা।

'সর্বনাশ! ভারোত্তলন করছ নাকি?'

'ফাজলামি করার সময় নেই। জলদি ব্যাগটা এনে হাত লাগাও আমার সঙ্গে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত পা চালাল মুরল্যান্ড, কয়েক সেকেন্ড পরই ফিরে এসে বন্ধুকে সাহায্য করল। দুজনে মিলে ধরাধরি করে সিলভিয়াকে নিয়ে এল বিমানের বাইরে। মাত্র ত্রিশ গজ পেরিয়েছে ওরা, এমন সময় মুরল্যান্ডের রিস্টওয়াচ বিপ বিপ করে উঠল: বোমার টাইমারের সঙ্গে মিলিয়ে অ্যালার্ম সেট করে রেখেছিল সে।

পরস্পর অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই বন্ধু, তারপর সিলভিয়াকে নিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল বরফে।

পিছনে গুমগুম শব্দ হলো, পরমুহূর্তেই ঘটল বিস্ফোরণ। পায়ের তলার মাটি ভয়ানকভাবে কেঁপে উঠল, একইসঙ্গে অদৃশ্য হলো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বিমানটার পশ্চাদভাগ। কার্গো সেকশনে ফেলে আসা মালামালগুলোর ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অংশ, ইস্পাত আর লাশের খণ্ড, এবং ফুলঝুরির মত ছিটকে ওঠা তুষারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চারদিক। কানে তালা লেগে গেল রানা আর মুরল্যান্ডের, আতঙ্কিত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকল পিঠের উপর ভাঙাচোরা লোহার টুকরোর আঘাত পেয়ে ধরাধাম ত্যাগ করার জন্য। তবে কপাল ভাল ওদের, তেমন কিছু ঘটল না। ছড়িয়ে পড়া তুষার আর আবর্জনায় শরীর ঢেকে গেল, ছোটখাট টুকরোর আঘাতে শরীর সামান্য কেটে-ছড়েও গেল, তবে প্রাণ হারানোর

মত কিছু ঘটল না।

আওয়াজ থামলেও নড়ল না ওরা, ফুয়েল ট্যাঙ্কে আগুন পৌঁছুলে দ্বিতীয় আরেকটা বিস্ফোরণ ঘটার কথা, সেটার জন্য চুপচাপ রইল। অনেকক্ষণ কেটে যাবার পরও কিছু ঘটছে না দেখে মাথা তুলল ওরা, পিছনে তাকাল, ততক্ষণে ধাতস্থ হয়ে গেছে দুজনেই।

ভাগ্যই বলতে হবে, ক্র্যাশটা কিছুটা হলেও উপকার করেছে ওদের। টেইল সেকশনের ভাঙা জায়গাটা দিয়ে বেরিয়ে গেছে বিস্ফোরণের বেশিরভাগ অংশ, সে কারণে ফিউজলাজের সামনের অনেকটাই বেঁচে গেছে, ফুয়েল লাইন পর্যন্তও আগুন পৌঁছেনি। বিমানের যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা ওদের আশ্রয় দিতে পারবে।

গালে ভেজা স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল রানা। চোখ ফেরাতেই দেখল, সিলভিয়ার জ্ঞান ফিরেছে। এতক্ষণ বিশালদেহী কুকের উপর শুয়ে ছিল ও, নিজের শরীর দিয়ে সংজ্ঞাহীন মানুষটাকে বিস্ফোরণ থেকে ঢাল দিচ্ছিল। চোখ মেলেই রানাকে সুবিধাজনক অবস্থায় পেয়ে গেছে সিলভিয়া, চুমু দিয়ে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। মাতৃভাষায় অনবরত ধন্যবাদ জানাচ্ছে, '*ড্যানকে, ড্যানকে!*'

তাড়াতাড়ি নিজেকে ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। পাশে তাকিয়ে মুরল্যান্ডের চোখে কপট ভর্ৎসনা দেখতে পেল। ঠাট্টা করে সে বলল, 'এই পরিস্থিতিতে মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নেয়াটা একদম ঠিক না। তোমার পছন্দেরও দেখি অনেক অবনতি হয়েছে! চুমুই যদি খাবে তো আর একটু ভাল চেহারার একজন আছে আমাদের সঙ্গে!'

হেসে উঠল রানা। পরিবেশটা সহজ হয়ে এল হঠাৎ করে। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো?'

'থাকব, যতক্ষণ না তুমি ওই ভদ্রমহিলাকে বলছ যে, ওঁর প্রাণ বাঁচানোতে আমারও অবদান আছে।' সিলভিয়াকে ইঙ্গিত করল মুরল্যান্ড।

'হুঁ, তবে সবাইকে বাঁচানো গেল না, ববি। ছ'জনকে হারিয়েছি আমরা।'

'ছ'জনকে বাঁচিয়েছিও। মন খারাপ না করে পজিটিভ দিকটা ভাবো। যারা গেছে, তাদের জন্য আমাদের কিছু করার ছিল না।'

লিয়াকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, সামান্য খোঁড়াচ্ছে সে, কপালের ক্ষতটা থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি পুরোপুরি। কাছে এসে বলল, 'আমাদের মধ্যে কেউ একজন অপয়া। কেন জানি মনে হচ্ছে, মানুষটা আমিই।'

'এত নিশ্চিত হয়ো না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'সারাজীবনে ববি আর আমি যে পরিমাণ বিপদে পড়েছি, তাতে অপয়াদের প্রতিযোগিতায় আমাদেরকে হারানো খুব কঠিন।' স্যাম আর জুরকিচও এগিয়ে আসছে দেখে মুরল্যান্ডের দিকে ফিরল ও। 'স্যামকে নিয়ে বিমানটা চেক করো, আগুন-টাগুন লেগে থাকলে নেভাতে হবে, আপাতত ওটাতেই আশ্রয় নেব আমরা। দেজান, কী কী সাপ্লাই নামাতে পেরেছি, তার একটা লিস্ট করে ফেলুন দেখি!'

'ঠিক আছে,' সায় দিল জুরকিচ।

'আমি কী করব?' জানতে চাইল লিয়া।

'তুমি আমাদের ডাক্তার,' বলল রানা। 'সবার চিকিৎসা করবে। শুরুটা নিজেকে দিয়ে করো, কপালের কাটাটা বিশেষ ভাল দেখাচ্ছে না।'

'তোমারও তো গাল কেটে গেছে।'

'সিরিয়াস কিছু নয়। ফার্স্ট এইড কিট নামানো হয়েছে বোধহয়, ওখান থেকে গোটা দুই ব্যান্ড-এইড এনে দাও, আপাতত তাতেই কাজ চলবে।'

মুরল্যান্ড চলে গেছে বিমানের দিকে, উইন্ডশিল্ডের সামনে গিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, 'রানা! পাইলটদের একজন বেঁচে আছে!'

কথাটা শুনেই ছুটে গেল রানা, কাছাকাছি যেতেই আহত

কো-পাইলটের গোঙানি শুনতে পেল। স্যাম আর মুরল্যান্ড ইতোমধ্যে দু'হাতে উইন্ডশিল্ডের সামনে থেকে বরফ সরাতে শুরু করেছে, ও-ও যোগ দিল। খানিক পরেই হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢোকার মত একটু জায়গা পরিষ্কার হয়ে গেল, ফ্রেমে লেগে থাকা ভাঙাচোরা কাঁচগুলোও সরিয়ে নিল ওরা।

নিজের জ্যাকেট খুলে ফেলল রানা, সঙ্গীদের বলল, 'আমি যাচ্ছি ভিতরে। এখান দিয়ে বেরোতে পারব না বোধহয়, তোমরা কেবিনের ওপাশ দিয়ে দরজার বরফ সরাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল মুরল্যান্ড আর স্যাম। ফোকর দিয়ে শরীর গলিয়ে শুয়ে পড়ল রানা, বুকে ভর দিয়ে ক্রল করে এগোল সামনে। ককপিটের ভিতরটা তুষারে ভরে গেছে, ক্যাপ্টেনকে দেখা গেল না, তার পাশটা সম্পূর্ণ কবর হয়ে গেছে। কো-পাইলট এখনও তার সিটে বসা, বুকের নীচ থেকে পুরোটাই বরফে চাপা পড়ে গেছে, শরীরের অনাবৃত অংশগুলো কেটে গেছে বিশ্রীভাবে, রক্ত ঝরছে অবিরাম; একটা হাত দেখা গেল বেকায়দা রকম বেঁকে আছে, ওটা সম্ভবত ভেঙেই গেছে। বরফের নীচে আরও কত রকম আঘাত আছে কে জানে।

কাতরাতে থাকা অল্পবয়সী কো-পাইলটকে সান্ত্বনা দিল রানা। 'চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা এসে গেছি।' দু'হাতে লোকটার শরীর থেকে বরফ সরাতে শুরু করল ও—দেহটাকে মুক্ত করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, এভাবে বেশিক্ষণ থাকলে হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হবে সে।

ককপিটের দরজার বরফ প্রাচীরের ওপাশ থেকে ধুপধাপ আওয়াজ পাওয়া গেল, মুরল্যান্ড আর স্যাম প্রবল শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওটার উপর, জুরকিচও যোগ দিয়েছে। বিমানের শরীর থেকে খসে পড়া ভাঙা ইস্পাতের টুকরোকে কোদাল হিসেবে ব্যবহার করছে ওরা। বিশ মিনিটের মধ্যেই মানুষ আসা-যাওয়ার মত একটা গর্ত করে ফেলল তিনজনে, সেটা দিয়ে

লিয়া এসে ঢুকল ভিতরে। দক্ষ ডাক্তারের মত কো-পাইলটকে পরীক্ষা করল সে, ইতোমধ্যে রানা লোকটার দেহ পুরোপুরিই বরফ থেকে মুক্ত করে ফেলেছে।

'কী বুঝছ?' জানতে চাইল রানা।

'কপাল ভাল এর,' বলল লিয়া। 'শুধু হাতটাই ভেঙেছে, পাঁজর-টাঁজর না। তবে কাটাগুলোর অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়, ইন্টারনাল ব্লিডিঙের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিতে পারছি না।'

'বাঁচবে তো?'

'এখনই হতাশ হবার মত কিছু দেখছি না। তবে ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট দরকার। আমার ব্যাগটা আনাও, ওটাতে ওষুধপত্র, ব্যান্ডেজ আর সেলাইয়ের সরঞ্জাম আছে। আর দেখো, দু'টুকরো কাঠ বা লোহা পাওয়া যায় কি না, ভাঙা হাতটায় স্প্লিন্টার বাঁধতে হবে।'

'নিয়ে আসছি এখুনি,' বলে বেরিয়ে গেল রানা।

পাঁচ মিনিটের ভিতরই সবকিছু নিয়ে ফিরে এল ও। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেয়ে ব্যস্ত হয়ে গেল লিয়া। ভাঙা হাতটা স্প্লিন্টার দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিল গলার সঙ্গে, তারপর ক্ষতগুলো ডিজইনফেকট্যান্ট দিয়ে পরিষ্কার করে নিপুণ হাতে সেলাই করল। সবশেষে কো-পাইলটকে দুটো ইনজেকশন দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'আমার কাজ শেষ,' জানাল ডাক্তার।

'নড়ছে না কেন?' জানতে চাইল রানা।

'কড়া পেইনকিলার আর ঘুমের ওষুধ দিয়েছি, সহজে জাগবে না। শকে যেন চলে না যায়, তাই এই ব্যবস্থা।'

'আচ্ছা!'

'ওকে এখানে ফেলে রাখা ঠিক হবে না, কেবিনে নিয়ে যাওয়া দরকার। কম্বলমুড়ি দিয়ে শুইয়ে রাখতে হবে।'

গলা উঁচিয়ে স্যামকে ডাকল রানা। দুজনে মিলে আলগোছে তুলে নিল সংজ্ঞাহীন কো-পাইলটকে, নিয়ে এল ভাঙাচোরা

প্যাসেঞ্জার সেকশনে। সিলভিয়া ইতোমধ্যে কম্বল বিছিয়ে ফ্লোরে একটা বিছানা করে ফেলেছে, সেটাতে লোকটাকে শুইয়ে ফেলল ওরা, আরও কয়েক প্রস্থ কম্বল এনে ঢেকে দিল শরীরটা।

'ওর সঙ্গে একজনের থাকা দরকার,' বলল লিয়া। 'অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায় কি না লক্ষ রাখতে হবে।'

'আমি থাকছি,' বলল সিলভিয়া। 'আপনারা যার যার কাজে যেতে পারেন।'

ভাঙা ফিউজলাজ থেকে বেরিয়ে এল সবাই। লিয়ার দিকে তাকিয়ে রানা বলল, 'দারুণ কাজ দেখিয়েছ।'

'আমার ফিল্ডের এক্সপার্টিজই ওটা, প্রশংসা করার দরকার নেই,' লিয়া হাসল। 'এবার তুমি তোমার এক্সপার্টিজ দেখাও। আমাদের উদ্ধার করো এই নরক থেকে।'

'চেষ্টার ত্রুটি করব না,' কথা দিল রানা।

'কী করতে চাও?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'সি-নাইন্টি সেভেনটা দেখে আসি,' বলল রানা। 'তুমি এখানেই থাকো, ডিসি-থ্রী'র ফিউজলাজটা ঠিকঠাক করো, আপাতত এটাতেই আশ্রয় নিতে হবে আমাদের। স্যামের স্যাটেলাইট ফোনটার দিকে লক্ষ রেখো, সোলার ম্যাক্স কেটে গেলে ওটার সাহায্যেই রেসকিউর ব্যবস্থা করতে হবে।'

সবাইকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় ক্র্যাশসাইটটায় যাবার জন্য প্রস্তুতি নিল ও। হ্যাভারস্যাকে গাইগার কাউন্টারটা ঢোকাল সবার আগে, খাওয়ার জন্য কয়েকটা প্রোটিন বার রাখল। যন্ত্রপাতি বলতে আছে শুধু একটা আইস-অ্যাক্স, ওটাই কোমরে ঝোলাল। রাতের আগে ফেরা সম্ভব না-ও হতে পারে, এই ভেবে একটা রূপালি রঙের স্পেস ব্ল্যাঙ্কেট আর ছোট একটা ক্যানে কিছুটা জ্বালানি তেলও নিল।

মুরল্যান্ড আর লিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রওনা দিল রানা। পথটা মোটেই কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা

দিতে লাগল একটার পর একটা সমস্যা। প্রথমেই পায়ের তলার বরফের ঘনত্ব কমতে থাকল, মিনিট পনেরোর মধ্যেই এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, পা ফেললেই হাঁটু পর্যন্ত দেবে যাচ্ছে। স্বাভাবিক পদক্ষেপে হাঁটা যাচ্ছে না, পুরো পা হাঁটু পর্যন্ত উচ্চতায় তুলে আবার ফেলতে হচ্ছে। ভারি আর্কটিক গিয়ার আর পিঠের বোঝা নিয়ে এই কাজটা কেমন কঠিন, তা বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে বুঝতে পারবে না কেউ। এগোনোর গতি এতই কমে গেল, এখন চেষ্টা করলে যে কেউ শক্ত জমিনে এমনকী হামাগুড়ি দিয়েও ওকে পিছনে ফেলে দিতে পারবে।

একটু পর অত্যাচার শুরু করল বাতাস। পর্বতমালার গায়ে বাড়ি খেয়ে নীচের দিকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে ঠাণ্ডা হাওয়া, হিমাঙ্কের নীচে নেমে যাওয়া তাপমাত্রা নিয়ে নির্মম কামড় বসাচ্ছে মুখের খোলা চামড়ায়, জমিয়ে দিচ্ছে একেবারে। মাঝে মাঝে বাতাসের গতিবেগ এতই বেড়ে যাচ্ছে যে, বিপরীতমুখী বায়ু ঠেলে এগোতেই পারল না ও। পরিশ্রমে দরদর করে ঘামতে শুরু করল রানা, ব্যাপারটা আরও অস্বস্তিকর—ঘেমে গিয়ে গরম হচ্ছে না শরীর, বরং বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে জমে যাচ্ছে, কাপড়ের তলায় চামড়ার উপর আস্তর ফেলে দিচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে বার বার থামতে হলো ওকে, পথ যেন ফুরোচ্ছেই না। তবে সবকিছুর পরও কিছুক্ষণ পর পর গাইগার কাউন্টারে চোখ বোলাতে ভুলছে না ও, কিন্তু এখনও বরাবরের মতই প্রতিক্রিয়াহীন ওটা। ব্যাপার কী... এখানে কি রেডিয়েশন নেই? মেজর কনওয়ে কি অন্য কোনও উৎস থেকে তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয়েছিল?

ক্র্যাশসাইটটার দূরত্ব মাত্র তিন মাইল, তারপরও পৌঁছুতে দু'ঘণ্টার বেশি লেগে গেল রানার। কষ্টকর যাত্রাটা শেষ হওয়ায় স্বস্তি বোধ করলেও, ভুলতে পারছে না—ফেরার পথে ওই একই ধকল দ্বিতীয়বার সইতে হবে।

আকাশ থেকে স্ট্র্যাটোফ্রেইটারের শুধুমাত্র একটা ডানা আর

ফিউজলাজের একটা খণ্ড দেখা গিয়েছিল, কিন্তু সাইটে পৌঁছে ক্র্যাশটার আরও নির্দশন দেখতে পেল ও। চোখে ধরা পড়ল একটা ল্যান্ডিং গিয়ার অ্যাসেম্বলি, রেট্র্যাক্টেবল ফ্ল্যাপের একটা খণ্ডিত অংশ আর প্রপেলার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া একটা ব্লেড—আকারে ছোট বলে এগুলো উপর থেকে দেখা যায়নি। আরও হয়তো ছিল, কিন্তু অর্ধশতকের আইস মুভমেন্ট ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আর তলিয়ে নিয়েছে সব। যতটুকু আছে তা-ই ঢের।

ভাঙা ডানাটা পেরিয়ে দুশো গজ পেরুতে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠল গাইগার কাউন্টারটা, সঙ্গে সঙ্গে রানার হৃৎপিণ্ড যেন লাফ দিয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি একহাতে ইয়ারফোনটা কানে চেপে ধরল ও, অন্যহাতে ধরা হ্যান্ডহেল্ড ইউনিটটার ডিসপ্লেতে চোখ রাখল। হ্যাঁ, ধরা পড়েছে রেডিয়েশন, তবে মাত্রাটা খুবই সামান্য—মানবদেহের জন্য ক্ষতিকারক নয়। স্বস্তি ফিরে পেল ও।

তবে রেডিয়েশন রেডিয়েশনই। পরিমাণে কম হোক, ওটা এল কোত্থেকে? গাইগার কাউন্টারটাকে পরিমাপক যন্ত্র ধরে ছোটখাট একটা সমীক্ষা চালাল রানা, রেডিয়েশনটা কোথায় বেশি—তা বোঝার চেষ্টা করছে, তা হলে হয়তো উৎসটা খুঁজে পাওয়া যাবে।

সার্চ গ্রিড ধরে এগোতে এগোতে সি-নাইন্টি সেভেনের মূল ধ্বংসাবশেষটা পেয়ে গেল ও। বেশ কয়েকটা বড় বড় বোল্ডারের মাঝখানে সৃষ্টি হওয়া একটা খাঁজে ছিপির মত আটকে আছে ভাঙা ফিউজলাজটা। বরফে ঢাকা পড়ে আছে প্রায় পুরোটাই, শুধু খাড়া হয়ে থাকা ভার্টিক্যাল স্ট্যাবিলাইযারটা মাথা উঁচিয়ে আছে। গাইগার কাউন্টারটা নিয়ে ধ্বংসাবশেষটার গোটা দৈর্ঘ্য ধরে মাপামাপি করল রানা, দেখা গেল—যেখানে ককপিট থাকার কথা, রেডিয়েশনটা সেখানেই বেশি। ব্যাপারটা বিসদৃশ ঠেকল ওর কাছে, কোনও রকম রেডিয়েশন লিক ঘটলে তো সেটা কার্গো সেকশনে ঘটবে!

বিমানের শরীরের উপর বিছিয়ে থাকা বরফের চাদরের এখানে-সেখানে কালো কালো কিছু ছায়া... দেখে বুঝতে অসুবিধে

হয় না, ফিউজলাজটার কোথায় কোথায় ফাটল আছে। দেখেশুনে ককপিটের কাছাকাছি একটা ফাটল বের করল রানা, আইস অ্যাক্স নিয়ে আক্রমণ চালাল সেটার উপরে—বরফ সরিয়ে ভিতরে ঢোকার একটা পথ বের করতে চায়। প্রথমদিকে একটু অনভ্যস্ত ভাব কাজ করল ওর ভিতরে, তবে খানিক পরেই ছন্দ এসে গেল কাজে, যন্ত্রের মত বরফের গায়ে গর্ত করে চলল ও। কিছুক্ষণ পর পর বিশ্রাম নিচ্ছে, এই হিম-তাপমাত্রায় শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে গেলে বিপদ আছে, ঠাণ্ডা হবার সময় হাইপোথারমিয়া হামলা করবে। সময় নিয়ে তেমন চিন্তিত হলো না, রাত কাটানোর মত প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে ও। মুরল্যান্ডকেও বলে এসেছে—দেরি হয়ে গেলে অন্ধকারে আর ফিরবে না।

বরফ সরিয়ে কুড়ালটা যখন বিমানের ধাতব শরীরের স্পর্শ পেল, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। ফাটলটা দেখে দমে গেল রানা—মানুষ ঢোকার মত বড় নয় ওটা, পাশ ফিরে বা হামাগুড়ি দিয়েও লাভ হবে না। অবশ্য হাল ছাড়ল না ও, লোহার উপরই অ্যাক্স চালাতে শুরু করল। কপাল ভাল, ঠাণ্ডায় জমে পাটকাঠির মত ভঙ্গুর হয়ে গেছে বিমানটার শরীর, সহজেই ঝুর ঝুর করে খসে পড়ছে টুকরোগুলো।

আধঘণ্টার মধ্যেই ফাটলটা প্রয়োজনমাফিক বড় করে নেয়া গেল। ভিতরে ঢোকার আগে গাইগার কাউন্টারটা আরেকবার চেক করল রানা—রেডিয়েশনের পরিমাণ বেড়েছে, তবে এখনও বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছেনি। ফাটলে ঢোকার আগে একটু ইতস্তত করল ও, ভিতরে কী আছে কে জানে। কোনও বিপদ ঘাপটি মেরে নেই তো!

কৌতূহলের কাছে পরাজয় মানল উদ্বেগ, ফাটল গলে সি-নাইন্টি সেভেনের পেটে ঢুকে পড়ল রানা। ভিতরটা অন্ধকার, পকেট থেকে একটা পেনলাইট বের করে জ্বালল ও, ম্লান আলোয় আলোকিত হলো সামনের দিক; অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করে ছোট্ট

পেনলাইটটা পেরে উঠছে না। পাশেই ককপিটে যাবার দরজা, ভিতরে ঢুকে গেল রানা।

প্রথমেই চোখে পড়ল একটা মৃতদেহ... দুই পাইলটের পিছনের সিটে বসে সামনের নেভিগেশন টেবিলের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, সারা দেহের উপর জমে থাকা তুষারকণা পেনলাইটের আলোয় হীরের মত ঝলমল করছে। থমকে গেল রানা—লাশ পাবে জানত, তারপরও এমন একটা বীভৎস দৃশ্যের জন্য কখনও যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি নেয়া থাকে না। কয়েক সেকেন্ড স্থির থেকে আবার নড়ল ও, আলো ফেলে লাশটা ভাল করে দেখল। লোকটা নেভিগেটরের পজিশনে বসে আছে যখন—মনে হচ্ছে নেভিগেটরই... এবং রেডিওম্যান। লাশের সামনে কালচে রঙের বরফ দেখে অবাক হলো ও, পরক্ষণেই বুঝল—ওটা আসলে রক্ত। মরার আগে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হয়েছে লোকটার। কাছে যেতেই অবাক হয়ে গেল, রক্তটা নাক-মুখ-কান... এমনকী চোখ দিয়েও বের হয়েছে! কারণটা কী!

মেঝেতে আলো ফেলল রানা, পায়ের কাছেও হিমায়িত রক্ত দেখতে পেল। সাদা আর কালচে লালে মনে হচ্ছে যেন বিমূর্ত কোনও শিল্পকর্ম করা হয়েছে ওখানটায়। আলো ঘুরিয়ে সামনের দিকে তাকাল ও—ক্র্যাশে সমস্ত উইন্ডশীল্ড ভেঙে গেছে, ভিতরে ঢোকা তুষার স্থির হবার জন্য দীর্ঘ সময় পেয়ে স্রেফ বরফের চাঁইয়ে পরিণত হয়েছে, আর এই চাঁইয়ের মাঝখানেই আটকে আছে হতভাগ্য কো-পাইলট। অন্যদিকে মুখ ফেরানো লাশটার, যেন অনাহূত আগন্তুকের তাক করা আলো থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে। মুখ দেখা না গেলেও বৈমানিকের সামনের বরফে কালচে রং দেখে বোঝা গেল—নেভিগেটরের মত এ-ও রক্তক্ষরণে মরেছে। ঘটেছিলটা কী এখানে? এভাবে নাক-মুখ-কান-চোখ দিয়ে রক্তপাত হয়েছে কেন?

জবাবটা জানা না থাকলেও এটুকু বুঝতে পারছে রানা—ওর

সন্দেহই ঠিক। কো-পাইলট আর নেভিগেটর যার যার সিটে আছে যখন, ক্যাম্প ডিকেডে মূল পাইলট মেজর কনওয়েই গিয়েছিল। তারপরও নিশ্চিত হবার জন্য কয়েক পা এগোল ও, আলোটা ফেরাল পাইলটের সিটের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চমকে গেল, দৃশ্যটার জন্য তৈরি ছিল না একেবারেই।

কন্ট্রোল কলামের সামনে মেজর রস কনওয়ের লাশটা এমনভাবে বসে আছে যেন এখনও বিমান চালাচ্ছে সে! মাথার উপর ক্যাপটাও আছে! বাকিদের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, তার গায়ের জ্যাকেটটা নেই। তীব্র ঠাণ্ডায় শরীরটা না পচলেও মাংস শুকিয়ে গেছে, খুলির উপর টান টান হয়ে আছে বিবর্ণ চামড়া, সামনের বরফে যথারীতি কালচে রক্তের ধারা। কাগজের মত পাতলা ঠোঁট ভেদ করে বেরিয়ে আসা দাঁতগুলো দেখে রানার মনে হলো, হাসছে লোকটা। হাসছে ওর হতভম্ব অবস্থা দেখে!

ছয়

লিয়া জানে না, কতবার ও ঘড়ি দেখেছে আর গ্লাভ খুলে দুহাত ঘষে গরম করার চেষ্টা করেছে। দ্বিতীয় কাজটা শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য, আর প্রথমটা... রানার অপেক্ষায়।

সূর্য ডুবতেই জেঁকে বসেছে ঠাণ্ডা, করাল থাবা বিস্তার করেছে গ্রিনল্যান্ডের ভয়াবহ শীতল তাপমাত্রা। রানার জন্য চিন্তা হচ্ছে ওর, এই অন্ধকারে পথ খুঁজে ডিসি-থ্রী'র ক্র্যাশসাইটে কি ফিরে আসতে পারবে মানুষটা? তেমন কোনও সাপ্লাইও তো নিয়ে যায়নি, রাতে বিপদে পড়বে না তো! দুশ্চিন্তাটা খুবই স্বাভাবিক, রানা এই ছোট্ট

দলটার অবিসংবাদিত নেতা—ওর কারণেই বেঁচে আছে সবাই, এই ভয়ানক পরিস্থিতিতেও আশার আলো দেখছে, ভেঙে পড়েনি... আর ওরই যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে স্রেফ পাগল হয়ে যাবে বাকিরা। মুরল্যান্ড আছে যদিও, তবে সে রানার মত সহজাত নেতা নয়, সারাক্ষণ হাসিঠাট্টা করে, এ কারণে তার আদেশ-নির্দেশ সিরিয়াসলি কেউ মেনে নেবে বলে মনে হয় না। এই তো, অল্প কিছুটা সময়ের জন্য নেই মানুষটা, তাতেই সবাইকে কেমন ছন্নছাড়া মনে হচ্ছে।

অবশ্য রানার জন্য উদ্বেগটার পিছনে ব্যক্তিগত একটা কারণও আছে, এজন্য দুশ্চিন্তাটা প্রকাশ্যে দেখাতে পারছে না লিয়া; বাকিরা যদি বুঝে ফেলে! জানে না কখন দুঃসাহসী বাঙালি যুবকটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে ও, হয়তো এই প্রথম প্রেম আসছে জীবনে। আশ্চর্য লোকটার ব্যক্তিত্ব, কোমলে-কঠোরে মেশানো হৃদয়টা নিষ্ঠুর সুন্দর! আর চোখ দুটো... সেখানে যেন রাজ্যের জাদু আছে। তাকালেই হারিয়ে যায় ও—কী অদ্ভুত মায়া মণিদুটোতে, দেখলেই মনে হয় এই লোককে বিশ্বাস করে কাউকে কখনও ঠকতে হবে না। আবার ভয়ও লাগে, কেমন একটা বেপরোয়া ভাব আছে রানার চেহারায়, যেন প্রয়োজনে মুহূর্তে নির্মম হয়ে উঠতে পারবে।

কে এই মাসুদ রানা? ধূমকেতুর মত কোত্থেকে উদয় হলো ওর জীবনে? এর জন্যই কি তা হলে এতগুলো বছর অপেক্ষা করছিল সে? জানে না লিয়া, নিজেকে জিজ্ঞেস করতেও ভয় হয়। লোকটাকে দেখলেই মনে হয় কোনও বাঁধনে জড়াবার জন্য জন্ম হয়নি ওর, ওকে আটকানোর চেষ্টা করা বৃথা। নারী ও, সব বুঝতে পারে। রানার মত পুরুষকে বাঁধনে জড়ানোর চেষ্টা করাও ঠিক নয়, ওর সান্নিধ্যটুকু শুধু অমূল্য রত্নের মত হৃদয়ের মণিকোঠায় আগলে রাখতে হয়... হোক সেটা এই শীতল নরকে, হোক সেটা ভাঙাচোরা একটা প্লেনের ভিতরে। মানুষটার অভাব তাই পলে পলে কুরে খাচ্ছে ওকে, কখন ফিরবে সেই আশায় জেগে রয়েছে ও

চাতকির মত ।

ডিসি-থ্রীর ভাঙা কেবিনের মেঝেতে কম্বল জড়িয়ে বসে পাহারা দিচ্ছে লিয়া, বাকি সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পাহারা দেয়ার অবশ্য নেই কিছু এখানে, সন্ধ্যা থেকে একজন করে জেগে ছিল শুধু অসুস্থ কো-পাইলটের শারিরীক অবস্থা মনিটর করার জন্য, লোকটার নাম কার্ল আরসেন—ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে ওদের। এখন অবশ্য মনিটর করারও প্রয়োজন হচ্ছে না, উন্নতির দিকে আরসেনের অবস্থা—ব্যথায় কাতরাচ্ছে না, ওষুধ ছাড়া ঘুমোতেও পারছে। তারপরও তাকে চোখে চোখে রাখার অজুহাতে জেগে বসে আছে লিয়া, ঘুম আসছে না আসলে। তা ছাড়া হঠাৎ করে রানা ফিরে এলে ওকে অভ্যর্থনা জানাতে পারবে, এমন একটা গোপন আশাও কাজ করছে ভিতরে। মুরল্যান্ড জেগে ছিল অনেক রাত পর্যন্ত, শেষে ঘণ্টাখানেক আগে শুয়েছে। ঘুমানোর সময় লিয়াকেও শুয়ে পড়তে বলেছিল, রানার জন্য নাকি চিন্তার কিছু নেই, সে সাত ঘাটের পানি খাওয়া বদমাশ, গ্রিনল্যান্ড তাকে হজম করতে পারবে না; ভুল করে যদি গিলেও ফেলে, পরমুহূর্তেই ওয়াক থুঃ করে উগরে দিতে বাধ্য হবে... কথার কী ছিরি!

মুরল্যান্ডের এসব কথায় বিভ্রান্ত হবার কোনও মানে হয় না। জাত-অভিযাত্রী ও, বরফশৃঙ্গে একাধিকবার ওঠার অভিজ্ঞতা আছে। ভাল করেই জানে—এ ধরনের টেম্পারেচার আর পরিবেশে কী কী বিপদ ঘটতে পারে। হাইপোথারমিয়া আর ফ্রস্টবাইটের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন ও, জানে হিমাঙ্কের নীচের তাপমাত্রায় নিঃসঙ্গ একজন মানুষ কতটা অসহায় হতে পারে। উৎকণ্ঠা তাড়াতে পারছে না সেজন্যই।

মেঝেতে জ্বলতে থাকা তেলের বাতিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে চোখদুটো লেগে এসেছে, বলতে পারবে না লিয়া। হঠাৎ করেই কিছু একটার শব্দে জেগে উঠল ও।

ডিসি-থ্রী'র ভাঙা টেইল সেকশনে একটা বরফের দেয়াল

তুলেছে মুরল্যান্ড আর স্যাম—যাতে বাতাস না ঢোকে, কাঁচভাঙা জানালাগুলোও ঢেকে দেয়া হয়েছে ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধার করা যাত্রীদের বিভিন্ন জামাকাপড় দিয়ে, বন্ধ করে রাখা হয়েছে ককপিট আর একজিটের দরজাদুটোও। এসবের কারণে তাপ ধরে রাখছে আবদ্ধ আবাসটুকু, আরামদায়ক না হলেও জীবন বাঁচানোর মত উত্তাপ আছে ভিতরে। হঠাৎই কমে গেছে তাপটা, গা কেঁপে উঠল লিয়ার, একজিটের দরজাটার দিকে তাকাতেই দেখল—খুলে গেছে ওটা, সেই শব্দেই ঘুম ভেঙেছে ওর।

তুষারমানবের মত একটা আকৃতিকে ভিতরে ঢুকতে দেখে নিঃশ্বাস আটকে এল ওর, ভাল করে তাকাতেই স্বস্তি পেল—না, কিংবদন্তীর কোনও প্রাণী নয়, মানুষই ওটা... সারা দেহ তুষারে ছেয়ে গেছে বলে এমন লাগছে। পুরো দেহটা শুভ্র রঙে এমনভাবে মোড়া যে, জামাকাপড়-জুতো... কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই। হুডের কিনারার পশমী অংশটা পুরো জমে গেছে, গলায় জড়ানো স্কার্ফটা থেকেও ঝুলছে স্ফটিকের মত বরফ—এ দুয়ের মাঝখানে গগলস পরা এক চিলতে চেহারাটা অদ্ভুত লাগছে। প্রতি পদক্ষেপে মূর্তিটার শরীর থেকে ঝুর ঝুর করে তুষার ঝরছে, সোজা তেলের বাতিটার দিকে এগিয়ে গেল মানুষটা, নিভিয়ে দিল আলো। মুহূর্তেই নিকষ কালো অন্ধকার গ্রাস করল ফিউজলাজের ভিতরটা।

'রানা... কী হয়েছে?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল লিয়া।

'চুপ!' চাপা গলায় বলল রানা, ক্লান্তিতে বড় বড় শ্বাস ফেলছে ও। 'কিছু শুনতে পাচ্ছ না?'

কান পাতল লিয়া, পরক্ষণেই শুনতে পেল ওটা। কেমন একটা চাপা ধুপ ধুপ আওয়াজ... ছন্দোবদ্ধভাবে হচ্ছে, পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

'ক... কীসের শব্দ?'

অন্যদেরও ঘুম ভেঙে গেছে। অন্ধকারে মুরল্যান্ডের গলা শোনা গেল, 'রোটরস্ট্যাট... রোটরস্ট্যাটের টারবাইনের আওয়াজ ওটা!'

গলা থেকে উলের স্কার্ফটা খুলে ফেলল রানা, মাথা থেকে নামাল হুডটা, বরফ ভাঙার মড় মড় শব্দ হলো। ও বলল, 'আধঘণ্টা থেকেই পাচ্ছি আওয়াজটা। ভয় হচ্ছিল, সাহায্যের আশায় তোমরা সিগনাল ফ্লেয়ার জ্বেলে ওটাকে সঙ্কেত দিয়ে ফেলো কি না। তাই বলতে গেলে দৌড়ে ফিরে এসেছি। তা ছাড়া জানালার ফাঁক দিয়ে এক মাইল দূর থেকেই এখানকার আলোটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমি। কাছাকাছি এসে পড়লে ওদেরও নজরে পড়বে।'

'কী করছে ওটা এখানে?' বলল জুরকিচ, আওয়াজ শুনে বোঝা গেল—চশমার খোঁজে মেঝে হাতড়াচ্ছে সে। 'আমাদের খুঁজছে?'

'মনে হয় না,' জমে যাওয়া পারকাটা খুলতে খুলতে বলল রানা। 'আমরা যে এখানে নেমেছি, তা ওদের জানার কথা না। রোটরস্ট্যাটটাও বেশ দূরে আছে বলে মনে হচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনি না হলে আমরা হয়তো শুনতেই পেতাম না।'

'তা হলে ওটা এদিকে করছেটা কী?' স্যাম ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না।

নিজের ঠাণ্ডা শরীরটা ম্যাসেজ করতে করতে রানা ধারণা করল, 'বোধহয় উত্তরদিকে ওদের অরিজিন্যাল লোকেশনে ক্যাম্পটা সরিয়ে নিচ্ছে। শুরু থেকে তো তা-ই চাইছিল, আমাদের কারণে পারেনি।'

'এতো শিয়োর হচ্ছেন কী করে?'

'রোটরস্ট্যাটটার তো ভারি কার্গো টানা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই, তাই না? যদি অন্য কোনও কারণে ফ্লাই করতে হতো, নিজোর্ড থেকে একটা হেলিকপ্টার এনে ব্যবহার করলেই পারত। কষ্ট করে এয়ারশিপটাকে আনার প্রয়োজন ছিল না।'

ছোট্ট একটা পেনলাইট জ্বেলে রানার দিকে একটা তোয়ালে বাড়িয়ে দিল লিয়া। 'তোমার কী ধারণা... ওরা মেজর কনওয়েের বিমানটা খুঁজছে?'

'উঁহুঁ, অন্য কিছু। স্ট্র্যাটোলাইনারটাতে ওদের আগ্রহের কিছু

দেখছি না, বিশেষ করে যেহেতু মেজর কনওয়ে তার সমস্ত ক্রু'সহ ওটাতে বসে আছে।'

দেয়াল ফেটে একটা পরী বেরিয়ে এলেও বোধহয় এভাবে চমকে উঠত না সবাই। খবরটা এতই অবিশ্বাস্য যে, কয়েক মুহূর্ত কোনও কথা বলতে পারল না কেউ, নীরবতা গ্রাস করল পরিবেশটাকে। তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছতে মুছতে সঙ্গীদের ব্যাপারটা হজম করতে দিল রানা। শেষে একসময় মুরল্যান্ড সবার মনের কথাটা জিজ্ঞেস করল।

'মেজর কনওয়ে যদি বিমানেই থাকে, তা হলে ক্যাম্প ডিকেডে ওটা কার লাশ পেলাম আমরা?'

তোয়ালেটা নামিয়ে পেনলাইটের ম্লান আলোয় লিয়ার দিকে ফিরল রানা, ওর চেহারায় রহস্য। জানতে চাইল, 'জবাবটা তুমি দেবে, না আমি?'

বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকাল লিয়া, কী বলছে রানা! ও কীভাবে জানবে লোকটা কে! রানা এখনও তাকিয়ে আছে, ভুরু নাচাচ্ছে... কিছু কি ইঙ্গিত করতে চাইছে? ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই ধরতে পারল রহস্যটা।

সবকিছুই জড়িয়ে আছে ওর দাদু ড. রাইমুন্ড নোভাকের খুঁজতে থাকা সেই আটাশ টন সোনার সঙ্গে। সেগুলো কোথাও লুকিয়ে ফেলেছিল নাৎসিরা, ইতোপূর্বে উদ্ধার হওয়া অন্যান্য লুটের মত এগুলোও নিশ্চয়ই কোথাও গুহা খুঁড়ে মাটির নীচে রাখা হয়েছে। সেবাস্টিয়ান গ্রাব এভাবেই জড়িত গোটা ব্যাপারটার সঙ্গে—ইঞ্জিনিয়ার ছিল সে, নিশ্চয়ই ট্রেজার চেম্বারের নকশা করা থেকে শুরু করে বানানো পর্যন্ত সবকিছুর ভার ছিল তার উপর। আর চেম্বারটা এখানেই রয়েছে... এই গ্রিনল্যান্ডে! ও, রানা আর ফ্রেডারিখ কার্নের একই জায়গায় উদয় হবার পিছনে অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ক্যাম্পে পাওয়া লাশটা? কার হতে পারে ওটা? একটু ভাবতেই বুঝে গেল ও। গুহা খুঁড়তে শ্রমিক

লাগে, আর নাৎসিরা কাদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করত, তা কারও অজানা নয়। লাশটা পরীক্ষা করার সময় বাঁ হাতের উল্টোপাশে কবজির নীচে পোড়া একটা দাগ দেখেছিল, তখন ব্যাপারটা মাথাতেই আসেনি—একমাত্র জার্মান বন্দিশিবিরে এভাবে মানুষকে ব্র্যান্ডিং করা হতো। মানুষটার পরিচয় নিয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই মনে।

'লোকটা একজন যুদ্ধবন্দি,' ফিসফিস করে বলল লিয়া। 'নাৎসিদের ইহুদি নিধনযজ্ঞের এক হতভাগ্য শিকার!'

ঘণ্টাখানেক পর রোটরস্ট্যাটের শব্দ মিলিয়ে গেলে বাতিটা আবার জ্বেলে দিল রানা, তারপর লিয়ার দিকে মুখ করে কম্বলমুড়ি দিয়ে বসল।

'কী ঘটছে না ঘটছে, তা সবার জানা থাকা দরকার, লিয়া,' বলল রানা। 'এসো, যে যা জানি, খুলে বলি। শুরুটা তুমিই করো।'

কাঁধ ঝাঁকাল লিয়া। তারপর বলতে শুরু করল, 'আমার দাদু... ড. রাইমুন্ড নোভাক নাৎসিদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পফেরত একজন মানুষ, এখন অস্ট্রিয়ায় বাস করছেন। তিনি আর তাঁর বন্ধু প্রফেসর সেমিল ড্রেশেল তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইয়োরোপ অধিগ্রহণের সময় জার্মানদের লুটপাট করা বিভিন্ন সম্পদ পুনরুদ্ধারে। কিছুদিন আগে তাঁরা অচেনা এক রাশিয়ান উৎস থেকে একটা তথ্য পান—স্টালিনগ্রাদ থেকে লুঠ হওয়া বিপুল পরিমাণ সোনার একটা কনসাইনমেন্টের ব্যাপারে, সেগুলো হ্যামবার্গে নিয়ে আসা হয়েছিল। রহস্যময় সেই তথ্যদাতার পাঠানো কাগজপত্রে মেজর সেবাস্টিয়ান গ্রাব নামে এক আর্মি ইঞ্জিনিয়ারের নাম পাওয়া যায়, সোনাগুলো পাচারের সঙ্গে লোকটা জড়িত ছিল—প্রজেক্টটাকে প্যান্ডোরা নাম দেয়া হয়েছিল, পরে জানতে পারি আমি।

'দশদিন আগ পর্যন্ত মিউনিখে বাস করছিল এই মেজর গ্রাব ঠিকানা বের করে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার দায়িত্ব দেয়া হয়

আমাকে, সেখানেই প্রথম দেখি ফ্রেডারিখ কার্ন... মানে যে লোকটা আমাদের বিমানে বোমা পেতে রেখেছিল, তাকে। আমার চোখের সামনে গ্রাবকে টরচার করে সে আর তার গুণ্ডারা, শেষ পর্যন্ত মেরেও ফেলে। আহত হলেও ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই আমি। রহস্যময় এক স্নাইপার কার্নের উপর হামলা চালিয়ে আমার জীবন বাঁচায়, কে সে—জানতে পারিনি। যা হোক, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সময় গ্রাব আমাকে জানায়—প্যাভোরা প্রজেক্ট শুধু সোনা লুকানোর অপারেশন ছিল না, এর সঙ্গে আরও বড় একটা ব্যাপার জড়িত আছে। আরেকটা কথা বলে সে—এই রহস্যটা সমাধান করতে পারবে জনৈক মাসুদ রানা, আমাকে সাহায্য করতে পারবে।'

লিয়া থামতেই রানা শুরু করল, 'মোটামুটি ওই সময়েই আমার কাছে একটা ই-মেইল আসে, তাতে মিউনিখ থেকে এক উকিল জানায়, তার কোনও এক মক্কেল আমার জন্য কিছু কাগজপত্র রেখে গেছে, সেগুলো পাঠাচ্ছে সে। ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামাইনি আমি। গ্রিনল্যান্ডে আসার প্রস্তুতি নিতে বিভিন্ন জায়গায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল চেয়ে পাঠাচ্ছিলাম, ভেবেছিলাম তেমনই কিছু একটা হবে। মেইলটা আমার ফার্মের নিউ ইয়র্ক শাখা হয়ে লিয়ার সঙ্গে হেলিকপ্টারে আসার পর আমি জানতে পারি, ওটা একটা জার্নাল, সেবাস্টিয়ান গ্রাব পাঠিয়েছে।' ব্যাগ থেকে জার্নালটা বের করে সবাইকে দেখতে দিল ও। 'জিনিসটা জার্মানে লেখা, পড়ার সুযোগ পাইনি। ভিতরে কী আছে বলতে পারব না। অবাক ব্যাপার হলো, গ্রাব লোকটাকে আমি চিনি না, নাম শুনিনি কখনও, চোখে দেখা তো অনেক পরের কথা। কী ভেবে সে এই জার্নালটা আমার কাছে পাঠাল, তা আমার মাথাতেই ঢুকছে না।'

'ব্যাপারটা তোমাকে বলা হয়নি,' বলল লিয়া। 'গ্রাব যে তোমাকে চিনে-জেনে জার্নালটা পাঠিয়েছে, বা আমাকেও সাহায্য নিতে বলেছে, তা নয়। তাকে অচেনা কিছু লোক তোমার নামটা

দিয়েছিল, বলেছিল তুমি সাহায্য করতে পারবে। আমার ধারণা, কথাটা বিশ্বাস করেছিল সে, তাই পাঠিয়েছে জিনিসটা।'

'কারা আমার নাম দিয়েছে?' রানা অবাক।

'এই গোটা রহস্যের শেষ পক্ষ... নাটের গুরুও বলতে পারো,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিয়া। তারপর আবার আগের গল্পের খেই ধরল, 'নিজোর্ডে পৌঁছার পর এদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হই আমি। গ্রাবের পাঠানো প্যাকেজটা দেখি মেইল-বাকেটে, শুনি যে তুমি গ্রিনল্যান্ডে আছ। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি, দারুণ কৌশলে আমাদের নিয়ে খেলা করছে কেউ। দুনিয়ার এত জায়গা থাকতে আর্কটিক সার্কেলে এসে মাসুদ রানা আর সেবাস্টিয়ান গ্রাবের পাঠানো প্যাকেজ পাবো—এ কখনও কাকতালীয় হতে পারে না। তার উপর আপনারা সবাই দেখেছেন, ফ্রেডারিখ কার্নও এসে গেছে এখানে... এটা স্রেফ একটা সেটআপ ছাড়া আর কিছু না।'

'কিন্তু কেন?' বিস্মিত গলায় জানতে চাইল স্যাম। 'আছেটা কী এখানে?'

'সোনার সেই কনসাইনমেন্টটা, আমার তা-ই বিশ্বাস,' দৃঢ় গলায় বলল লিয়া। 'সঙ্গে আরও কিছু আছে, যেটা কী—আমরা জানি না।'

'এখানে সোনা থাকবে কী করে?' স্যামকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। 'রাখবেই বা কোথায়?'

'অসম্ভব কিছু নয়,' মুখ খুলল রানা। 'সেবাস্টিয়ান গ্রাব ইঞ্জিনিয়ার ছিল। সে হয়তো সোনাগুলো রাখার জন্য এখানে কোনও গোপন ট্রেজার চেম্বার তৈরি করেছিল, অন্তত অপারেশনটায় তার সম্পৃক্ততা সেই কথাই বলে। এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে জার্মানি, অস্ট্রিয়া আর পোল্যান্ডে এ ধরনের বেশ কিছু চেম্বার পাওয়া গেছে, সেগুলো থেকে উদ্ধার করা হয়েছে অসংখ্য অমূল্য ধনসম্পদ আর শিল্পকর্ম। তবে তারপরও নাৎসিদের

লুট করা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের ট্রেজার আজ পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। লিয়ার সঙ্গে আমি একমত, প্যান্ডোরা প্রজেক্টের লোকেশন এই গ্রিনল্যান্ডেই রয়েছে।'

'আর্কটিকে নাৎসিদের একটা ট্রেজার চেম্বার?' ভুরু কোঁচকাল মুরল্যান্ড। 'ব্যাপারটা কেমন অবিশ্বাস্য হয়ে গেল না? দুনিয়ায় এত জায়গা থাকতে ওরা এই বরফের রাজ্যে কেন সোনাদানা লুকোতে যাবে?'

'মানছি, আইডিয়াটা অদ্ভুতই,' স্বীকার করল লিয়া। 'আমি নিজেও বিশ্বাস করতাম না, যদি না রানা আর কার্নকে এখানে হাজির দেখতাম। তবে পুরো ব্যাপারটার এই একটাই ব্যাখ্যা। এখানে একটা ট্রেজার চেম্বার তৈরি করা হয়েছিল ভাবলেই শুধু মেলানো যায় ক্যাম্প ডিকেডে পাওয়া ওই যুদ্ধবন্দির উপস্থিতিটা। যে কোনও ধরনের কাজে সেই আমলে নাৎসিরা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ইহুদিদের শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করত। ধরে নিতে দোষ নেই, প্যান্ডোরা প্রজেক্টের নির্মাণকাজের জন্য ওই লোকটাকে গ্রিনল্যান্ডে আনা হয়েছিল।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' বলে উঠল স্যাম। 'ব্যাপারটা এত সোজা নয়। তিপান্ন সালে বন্ধ হয়েছিল ক্যাম্প ডিকেড, লোকটা ওখানে গিয়ে ঢুকেছে আরও পরে। যুদ্ধ শেষ হবার আট বছর পার হয়ে যাবার পর এখানে যুদ্ধবন্দি এল কোত্থেকে? আপনারাই তো বলছেন, প্যান্ডোরা ছিল যুদ্ধকালীন সময়ের একটা প্রজেক্ট।'

'হ্যাঁ, তেতাল্লিশ সালের,' বলল লিয়া। 'লোকটা হয়তো পালিয়ে গিয়েছিল প্রজেক্ট থেকে, চেম্বারের কাজ শেষে মরার জন্য ফেলে যাওয়াও হতে পারে। দশটা বছর সে কীভাবে এই বিরূপ পরিবেশে টিকে রইল, তা একটা রহস্য তো বটেই। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, সি-নাইন্টি- সেভেনটা ক্র্যাশ হবার পর লোকটা মেজর কনওয়েরে শরীর থেকে জ্যাকেটটা সংগ্রহ করে, সম্ভবত বিমানের ভিতরই কোনও কাগজপত্র পেয়ে ক্যাম্প ডিকেডের কথা

জানতে পারে। তারপর প্রায় তিনশো কিলোমিটার হেঁটে ওখানে চলে যায় সে—সাহায্যের আশায়।'

'কিন্তু বেসটা ততদিনে পরিত্যক্ত হয়েছে,' যোগ করল রানা। 'পায়ে হেঁটে এতদূর পথ পাড়ি দেয়ার পর কাউকে না পেয়ে না জানি তার কেমন লেগেছিল। পথশ্রমে মৃত্যুর দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল লোকটা... ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।'

'আমরা ওকে যুদ্ধবন্দিই ভাবছি কেন?' বলল স্যাম। 'জার্মান কোনও সৈনিক হতে পারে না? যে ট্রেজার চেম্বারটা পাহারা দিচ্ছিল?'

মাথা নাড়ল লিয়া। 'গুপ্তধনের জন্য পাহারা লাগে না, সৈনিকরা ওই লোকটার মত বেঁটেও হয় না। তা ছাড়া লাশটার হাতে যে ছাপটা দেখেছি, তা শুধু কনসেনট্রেশন ক্যাম্পেই লাগানো হতে পারে।'

'হুঁ, লাশটার ব্যাপারে তা হলে কিছুটা ধারণা পাওয়া গেল,' মাথা ঝাঁকাল স্যাম। 'তারপরও এটা পরিষ্কার হচ্ছে না—আপনি, রানা আর ওই কার্ন লোকটা একই সময়ে কীভাবে গ্রিনল্যান্ডে হাজির হলো।'

'বিষয়টা নিয়ে এতক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করেছি আমি,' বলল রানা। 'সেটআপটা মোটামুটি ধরতেও পারছি। লিয়া যাদেরকে নাটের গুরু বলল, তারা সম্ভবত কার্নের প্রতিপক্ষ; আমাদের ব্যবহার করে জিয়ো-রিসার্চকে বাধা দিতে, কিংবা নিজেরাই প্যান্ডোরা প্রজেক্টের ট্রেজার উদ্ধার করে নিতে চাইছে। লিয়া আবহাওয়াবিদদের দলের অংশ হিসেবে জিয়ো-রিসার্চের সঙ্গেই গ্রিনল্যান্ডে আসছে বলে ওর দাদুর কাছে লুট হওয়া সোনার খবরটা দিয়ে দেয় ওরা, যাতে লিয়া আগেভাগেই জিয়ো-রিসার্চের গোপন উদ্দেশ্যটা জেনে ফেলে, এখানে এসে ওদের বাধা দিতে পারে। কিন্তু একা একটা মেয়ে কার্নের খুনে বাহিনীর বিরুদ্ধে কী-ই বা আর করতে পারবে? সেজন্যই আমাকে আর মুরল্যান্ডকে কৌশলে

আরেকটা এক্সপিডিশনের সঙ্গে এখানে আনা হয়েছে, যাতে বেকায়দায় পড়লে লিয়া আমাদের সাহায্য নিতে পারে। কী চমৎকার বুদ্ধি, দেখেছেন? গ্রাবকে আমার নাম জানিয়ে রাখা হয়েছে, কারণ ওরা জানত– লিয়া তাকে ইন্টারভিউ করতে যাবে; আর ইন্টারভিউতে বের হয়ে আসবে যে, প্যান্ডোরা প্রজেক্ট সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে মাসুদ রানার সাহায্য নিতে হবে।'

'বলতে চাইছ, রাশিয়ার সেই সোর্স তোমাকে-আমাকে গ্রিনল্যান্ডে আনিয়েছে?' মুরল্যান্ডের গলায় অবিশ্বাস। 'তা কী করে হয়? আমাদের তো পাঠিয়েছে সার্ভেয়ার্স সোসাইটি!'

'সোসাইটি, ঠিক।' রানা স্বীকার করল। 'কিন্তু সোসাইটির কোন্ লোকটা? নিকোলাই ডেমেঙ্কো... রাশিয়ান ইমিগ্র্যান্ট। কানেকশনটা ধরতে পারছ?'

'মাই গড!' চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল মুরল্যান্ডের। 'কিন্তু এক্সপিডিশনটা সে আয়োজন করল কী করে? স্যাম, আপনার বাবা এতে জড়িত নন তো?'

'প্রশ্নই ওঠে না,' জোর গলায় বলল স্যাম। 'এই এক্সপিডিশনের পিছনে যদি আলাদা কোনও উদ্দেশ্য থাকত, তা হলে বাবা নিশ্চয়ই আমাকে এই বিপদের মধ্যে পাঠাবার আগে সাবধান করত। না, ববি, বাবা সত্যিই ক্যাম্প ডিকেড রি-ওপেন করতে চেয়েছিল।'

'সেক্ষেত্রে তাঁকেও দাবার গুটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'স্যাম, তিনি হঠাৎ করেই কয়েকদিন আগে বেসটার ব্যাপারে অস্থির হয়ে উঠলেন—বলেছিলেন না? খোঁজ নিয়ে দেখুন, ওই ডেমেঙ্কোই তাঁকে ফুসলে-ফাসলে এখানে একটা টিম পাঠাতে রাজি করিয়েছে।'

'কী আশ্চর্য! আমাদের সবাইকে নিয়েই খেলা হয়েছে দেখছি!'

রানার দিকে তাকাল মুরল্যান্ড। 'গ্রাবের বাড়িতে লিয়ার সঙ্গে যে কার্নের দেখা হলো, সেটাও কি তা হলে পূর্ব-পরিকল্পিত?'

'মনে হয় না,' রানা মাথা নাড়ল। 'এখানেই ওদের দুজনের প্রথম দেখা হবার কথা। ওটা সম্ভবত কো-ইনসিডেন্সই ছিল... একই সময়ে হাজির হয়ে গিয়েছিল দুজন। রহস্যময় সেই স্নাইপার সম্ভবত আমাদের অচেনা প্রতিপক্ষের কেউ, লিয়ার যাতে কোনও বিপদ না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখছিল। ওর কিছু হয়ে গেলে ওদের পুরো প্ল্যানই মাঠে মারা যেত, সেজন্যই কার্নের উপর হামলা করে লিয়ার জীবন বাঁচানো হয়েছে।'

'লিয়া নাহয় ওখানে ইন্টারভিউর জন্য গেছে, কার্ন গিয়েছিল কেন? গ্রাবকে টরচারই বা করছিল কেন?'

'নিশ্চয়ই কোনও তথ্য আদায় করবার জন্য, তবে কী সেটা—বুঝতে পারছি না। জানার উপায় একটাই,' স্যামের হাত থেকে জার্নালটা নিল রানা। 'গ্রাবের এই জার্নালে নিশ্চয়ই গোপন সমস্ত কথা লেখা আছে, নইলে এটা আমার কাছে পাঠানো হতো না।' লিয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরল জিনিসটা। 'লিয়া, জার্মান তোমার মাতৃভাষা; দ্রুত পড়ে ফেলো এটা। আমাদের জানতে হবে ওই ট্রেজার চেম্বারে আছেটা কী।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চামড়ায় মোড়া খাতাটা নিল লিয়া, বাতির কাছে গিয়ে পাতা উল্টাতে শুরু করল।

'আমরা এখন কী করব?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'আমাদের সরে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে,' জানাল রানা। 'এই জায়গাটা নিরাপদ নয়। জিয়ো-রিসার্চ যেভাবে ওদের অপারেশনটা উত্তরদিকে শিফট করে আনছে, তাতে আবহাওয়া একটু পরিষ্কার হলেই ডিসি-থ্রী'টাকে দেখে ফেলবে। ঝুঁকি নেয়া উচিত হবে না আমাদের।'

'চলে যাবার কথা বলছেন?' স্যামের গলায় প্রতিবাদের সুর। 'এ ধরনের পরিস্থিতিতে সার্ভাইভালের প্রথম শর্তই হচ্ছে দুর্ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকা, যাতে রেসকিউ টিম সহজে খুঁজে বের করতে পারে। চলে গেলে হবে কেমন করে?'

'ব্যাপারটা আমার মাথায় নেই ভেবেছেন?' বলল রানা। 'কিন্তু দিকটাও ভাবুন। কার্ন আমাদের দেখে ফেললে আর উদ্ধার পেতে হবে না, সবাইকে নিয়ে সোজা কবরে শুইয়ে দেবে।'

'যাব কোথায়, সি-নাইন্টি সেভেনটাতে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল রানা। 'ওটার অবস্থা ভাল নয়, তা ছাড়া ওটা কার্নেরও কৌতূহল জাগানোর মত একটা জিনিস।'

'তা হলে যাব কোথায় আমরা?' জানতে চাইল স্যাম।

'আপাতত চলার মধ্যে থাকতে হবে। তারপর দেখি, আশ্রয় নেয়ার মত কোনও একটা জায়গা খুঁজে বের করব।'

'আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন?' রাগী গলায় বলল স্যাম। 'আমাদের সঙ্গে দুজন মেয়ে আর একজন আহত মানুষ আছে। শেল্টার ছাড়া কতক্ষণ টিকবে ওরা?'

'আমরা বাকিরা সাহায্য করলে পুরো সময়ই টিকবে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'ভুলে যাচ্ছেন কেন, ওই যুদ্ধবন্দি লোকটা একা একা পুরো দশ বছর বেঁচে ছিল এই এলাকায়। সে পারলে আমরা পারব না কেন? তার আঁকা ম্যাপটা আছে আমাদের কাছে।'

'কী প্ল্যান আঁটছেন, বলুন তো?' স্যাম শান্ত হয়ে এসেছে। 'আমার মনে হচ্ছে না, শুধু হাঁটানোর জন্য আপনি আমাদের বাইরে নিয়ে যাবেন।'

'তেমন কিছু না,' রানা হাসল। 'রওনা হবার আগে গ্রিনল্যান্ড নিয়ে পড়াশোনা করে এসেছি, বললাম না? এই এলাকায় মাটির নীচে নানা রকম প্রাকৃতিক গুহা আর ফাটল থাকার কথা। সেগুলোরই কোনও একটা খুঁজে বের করে লুকিয়ে থাকব—যতক্ষণ না জিয়ো-রিসার্চ চলে যাচ্ছে, অথবা আপনার স্যাট-ফোনটা আবার চালু হচ্ছে।'

'মন্দ নয় প্ল্যানটা,' মন্তব্য করল মুরল্যান্ড, স্যামও সায় দিচ্ছে। 'কিন্তু এই বরফের ভিতর গুহা বা ফাটলের মুখ খুঁজে পাওয়া সহজ

হবে না।'

'ম্যাপটার কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? ওটায় একটা ক্রস চিহ্ন দেয়া আছে, যেখান থেকে যুদ্ধবন্দি লোকটা যাত্রা শুরু করেছিল। ভাবতে দোষ নেই যে ওখানেই সে দশটা বছর ঝড়-ঝাপটা, তুষার আর ঠাণ্ডাকে ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে।'

'আন্ডারগ্রাউন্ড একটা গুহা... হ্যাঁ, শুধু অমন একটা আবাস পেলেই এই পরিবেশে টিকে থাকা সম্ভব!' মুরল্যান্ডের চেহারায় উত্তেজনা।

'কতদূর ওটা এখান থেকে?' স্যামও উৎসাহী হয়ে উঠেছে।

'আটাশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটার,' বলল রানা। 'দূরত্বটা সাধ্যের অতীত কিছু নয়, সবাই মিলে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পৌঁছানো যাবে।'

'দুঃখিত,' বলে উঠল লিয়া। 'তোমাদের পরিকল্পনায় পানি ঢালতে হচ্ছে, আমার কাছে দুঃসংবাদ আছে।'

'বসে বসে দুঃসংবাদ জোগাড় করে ফেললেন কোত্থেকে?' প্রশ্ন করল মুরল্যান্ড।

'ওমা, জার্নালটা পড়ছি না!'

'কতটুকুই বা আর পড়েছেন...'

'এটা অনেকটা ডায়েরির মত লেখা,' বলল লিয়া। 'সাল-তারিখ আছে, তাই সোজা প্যান্ডোরা প্রজেক্ট সংশ্লিষ্ট সময়টায় চলে গেছি। জানতে পারলাম যে সেবাস্টিয়ান গ্রাব ছিল একজন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার, ১৯৪৩ সালে তাকে গ্রিনল্যান্ডে পাঠানো হয় এই এলাকার গ্লেসিয়ারের নীচে যে কোনও একটা গুহা বের করে সেটার আকার বড় করার জন্য—আদেশটা স্বয়ং হিটলারের কাছ থেকে এসেছিল।'

'হুঁ, ওরা তা হলে ট্রেজার রাখার জন্য প্রাকৃতিক একটা গুহাই বেছে নিয়েছিল,' আন্দাজ করল রানা।

'উঁহু, ব্যাপারটা অন্যরকম,' মাথা নেড়ে বলল লিয়া।

'চেম্বার-টেম্বার তৈরির কোনও বর্ণনা দেখছি না এতে; বরং যে ধরনের কাজ হয়েছে, তা একটা মাইনিং অপারেশনের মত লাগছে। গুহা দরকার হয়েছিল আন্ডারগ্রাউন্ডে প্রাথমিক অ্যাকসেস পাবার জন্য, সারফেস থেকে কাজ শুরু করলে সময় অনেক বেশি লাগত।'

'মাইনিং অপারেশন!' রানা অবাক।

'হ্যাঁ। খোঁড়াখুঁড়ির জন্য এক হাজার ইহুদি আর জিপসি বন্দি আনা হয়েছিল ইয়োরোপের বিভিন্ন বন্দিশিবির থেকে। খুব সিরিয়াসলি কিছু খুঁজছিল ওরা, কাজের চাপে প্রতিদিন গড়ে দশজন করে শ্রমিক মারা যাচ্ছিল। তবে কী খোঁজা হচ্ছিল, তা লেখা নেই। কাজ শুরু হবার দু'মাস পরে বরফের চাঁই পড়ে গ্রাবের পা ভেঙে যায়, চিকিৎসার জন্য তাকে জার্মানিতে ফিরে যেতে হয়।'

'হুঁ,' রানাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। 'দুঃসংবাদের কথা বলছিলে... ওটা কী?'

'প্রথম কিছুদিন পাগলের মত খেটেছে গ্রাব আর তার লোকজন, কিন্তু সারফেস থেকে গুহাতে ঢোকার মত কোনও পথ খুঁজে বের করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত যেটাতে মাইনিং শুরু করা হয়—সেটা একটা খাঁড়ির পাশে, পাহাড়ের তলায়। আন্ডারওয়াটার টানেল ধরে সাবমেরিন নিয়ে গিয়েছিল ওরা। সমস্যাটা বুঝতে পারছ? তোমার ওই গুহা-টুহাতে বরফের উপর থেকে ঢোকার কোনও পথ নেই।'

'ব্যাপারটা ঠিক মিলছে না,' মুরল্যান্ড বলল। 'আমাদের লাশ বাবাজি তা হলে থাকত কোথায়?'

'জবাবটা খুব সোজা—প্যান্ডোরা প্রজেক্টের গুহায় থাকত সে... প্যান্ডোরার পরিত্যক্ত গুহায়। আমাদের ধারণাই ঠিক, অপারেশন শেষে তাকে ওখানে ফেলে যাওয়া হয়েছিল তিলে তিলে মরার জন্য।'

'তারপরও মিলছে না সব,' রানা বলল। 'আন্ডারওয়াটার

টানেল ছাড়া যদি ওখানে যাওয়া-আসার কোনও পথ না থাকে, তা হলে তিপান্ন সালে সে সারফেসে উঠে এল কীভাবে? লোকটার কাছে নিশ্চয়ই সাবমেরিন ছিল না? জিয়ো-রিসার্চই বা সারফেসে ওটা খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন? সাবমেরিন নিয়ে আসেনি কেন?'

'এক মিনিট,' বলে জার্নালের কয়েকটা পাতা উল্টে কী কী যেন পড়ল লিয়া। তারপর বলল, 'পেয়েছি। এয়ার শাফট... এক হাজার ফুট বরফ কেটে একটা এয়ার শাফট বানিয়েছিল গ্রাব, ওটা দিয়ে মানুষ ওঠা-নামা করতে পারে।'

'কার্ন তা হলে ওই এয়ার শাফটটাই খুঁজছে!' ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হাসি ফুটল রানার মুখে। 'ওটার লোকেশন জানে না সে, সে-কারণেই গ্রাবকে টরচার করছিল। লিয়া, গ্রাব মরার আগে তাকে কিছু বলে যেতে পেরেছে?'

'না।' মাথা নাড়ল লিয়া।

'গুড।' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'ববি, ওখানে আমাদের যেতে হবে। কী বলো?'

'তা তো বটেই!' মুরল্যান্ডের মুখেও শয়তানি হাসি।

'কী বলছেন আপনারা!' স্যামের কণ্ঠে অবিশ্বাস! 'জেনে-শুনে যেখানে কার্ন যাচ্ছে, সেখানে যাব আমরা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কারণ ওর কাছে ম্যাপ নেই, আমাদের কাছে আছে। আগে পৌঁছুতে পারব, পারব এয়ারশ্যাফটের মুখটা ঢেকে দিতেও—যাতে সে ওটা আর খুঁজে বের করতে না পারে। বেঁচে থাকার জন্য এই মুহূর্তে গুহাটাই আমাদের সবচেয়ে বড় আশা, তা ছাড়া ওখানে লুকিয়ে আছে গোটা রহস্যের সমস্ত চাবিকাঠি। ওখানে আমাদের যেতেই হবে।'

কোনও কথা বলল না কেউ, যুক্তিটা বুঝতে পারছে সবাই। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রানা আবার মুখ খুলল, 'যাবার আগে আরেকটা ব্যাপার সবাইকে জানিয়ে রাখতে চাই আমি। ক্যাম্প ডিকেডে পাওয়া লাশটার গায়ে রেডিয়েশনের চিহ্ন পেয়েছি আমরা,

উৎসটা আর্মি বেস নয়, সি-নাইন্টি সেভেনের ক্র্যাশ সাইটেও রেডিয়েশনের কোনও চিহ্ন দেখিনি। সুতরাং ধরে নিতে হয় যে, প্যান্ডোরা গুহাতেই লুকিয়ে আছে রেডিয়েশনের উৎস। পঞ্চাশ বছরের বেশি সময়ের পরও যেহেতু গাইগার কাউন্টারে লাশটার রেডিয়েশন ধরা পড়ছে, সে-কারণে উৎসটা যে অত্যন্ত শক্তিশালী—তাতে কোনও সন্দেহ নেই। মানেটা হলো, গুহার ভিতরে বা আশপাশে প্রচণ্ড তেজস্ক্রিয়তা আছে।'

'আপনি দেখছি একের পর এক দুঃসংবাদ দিয়ে চলেছেন,' তিক্ত গলায় বলল স্যাম। 'তারপরও ওখানে আবার যেতেও চান?'

'হ্যাঁ। তেজস্ক্রিয়তা নিয়ে ভয় পাচ্ছি না আমি,' বলল রানা। 'গাইগার কাউন্টারটা এখনও অক্ষত আছে, তেমন কোনও বিপদ থাকলে টের পাবো আগেভাগেই। এ ছাড়া ছোটখাট রেডিয়েশন পয়েজনিং কীভাবে মোকাবেলা করা যায়, তা আমি আর ববি জানি; লিয়া তো ডাক্তার, ওরও জানার কথা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লিয়া। বলল, 'কিন্তু একটা মাইনিং অপারেশনে রেডিয়েশন লিক হয় কীভাবে, তা আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'আমার বদ্ধমূল ধারণা, আমাদের মধ্যে উপস্থিত জনৈক আবহাওয়াবিদের কাছে ব্যাপারটার ব্যাখ্যা আছে। শুধু তা-ই নয়, গোটা রহস্যটাই তার জানা।' রানার গলায় হেঁয়ালি, জুরকিচের দিকে ফিরল ও। 'কী দেজান, এখনও চুপ করে থাকবেন? মুখোশ খুলে বেরিয়ে আসার সময় হয়েছে তো, নাকি?'

সাত

চমকে উঠল সবাই।

এতক্ষণের লম্বা আলোচনায় জুরকিচ নিশ্চুপ ছিল, ওরা ভেবেছে সেটা তার স্বল্পভাষী স্বভাবের কারণে। এবার ওরা লক্ষ করল, ব্যাপারটা আসলে ভান। সবই জানে সে, নতুন কিছু জিজ্ঞাস্য নেই, এজন্যই কোনও প্রশ্ন করেনি; পুরো সময়টা বরং আগ্রহ নিয়ে ওদের আলাপচারিতা শুনছে লোকটা, রানারা কদ্দূর কী জেনে ফেলেছে—সেটা বোঝার জন্য।

জার্মান মিটিয়োরোলজিস্ট নিজেও এই আচমকা আক্রমণে হকচকিয়ে গেছে, কোনওমতে বিস্ময়টা লুকিয়ে সে মিনমিন করে বলল, 'কী বলছেন বুঝতে পারছি না, মি. রানা।'

'ভণিতা ছাড়ুন, আমি সব বুঝে গেছি,' কড়া গলায় বলল রানা। 'এতক্ষণ কিছু বলিনি, কারণ ভেবেছিলাম আপনি নিজ থেকেই এগিয়ে আসবেন। আপনার পরিচয় আর গোপন নেই আমার কাছে।'

'কী বুঝে ফেলেছ?' অবাক গলায় প্রশ্ন করল লিয়া। 'কে এই লোক? ও জুরকিচ নয়?'

'নাম ঠিক আছে... পেশাটাও। তবে আরও একটা পরিচয় আছে ওঁর। রাশিয়ান সেই অচেনা পক্ষটা... এই গোটা ব্যাপারটা যারা নিপুণ হাতে সাজিয়েছে, যাদের কারণে আজ আমাদের এই মরণদশা... ও তাদের একজন।'

ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে, হজম করতে কষ্ট হচ্ছে সবার। এই সাদাসিধে, নরম, স্বল্পভাষী বিজ্ঞানী এত বড় কাণ্ড ঘটিয়েছে?

সবাইকে এত বড় বিপদে ফেলেছে? ফ্যাল ফ্যাল করে একবার রানা, আরেকবার জুরকিচের দিকে তাকাচ্ছে দলের প্রতিটা মানুষ।

হঠাৎই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লিয়া, চোখে আগুন জ্বলছে। 'তা হলে তুমিই... তুমিই সবকিছুর মূলে? তুমি আমাদের সবার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছ?' জুরকিচের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ও, আঁচড়ে-কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলছে।

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে টেনে-হিঁচড়ে ওকে সরিয়ে আনল রানা আর মুরল্যান্ড। কিন্তু লিয়া যেন বাঘিনীতে পরিণত হয়েছে, নিজেকে ছাড়ানোর জন্য মোচড়ামুচড়ি শুরু করেছে ও, ধরে রাখাই কঠিন হয়ে উঠল।

'আহ্-হ্!' হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠল মুরল্যান্ড, বন্দিনী ওর হাতে কামড় বসিয়ে দিয়েছে, ব্যথায় লিয়াকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল সে।

রানা থতমত খেয়ে গেছে, এক হাত মুক্ত লিয়ার, এবার ওকেই আক্রমণ করে বসল। এই অবস্থায় এগিয়ে এল সিলভিয়া, প্রচণ্ড এক ঘুসি ঝাড়ল লিয়ার চোয়াল লক্ষ্য করে, টুঁ শব্দ না করে জ্ঞান হারাল তরুণী ডাক্তার।

নেতিয়ে পড়া শরীরটাকে সাবধানে শুইয়ে দিল রানা। সিলভিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'ধন্যবাদ।'

'জানি আপনি মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে পারবেন না,' বিশালদেহী জার্মান শেফও হাসছে। 'কী আর করব, কাজটা আমাকেই করতে হলো। পাগল ঠাণ্ডা করার উপায় ওই একটাই।'

'ববি, তুমি ঠিক আছ?'

'ঠাট্টা করছ?' স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলল মুরল্যান্ড। 'বুনো মেয়েদের খুবই পছন্দ করি আমি, বিছানায় আঁচড়-কামড় খেয়ে অভ্যাস আছে।'

জুরকিচের দিকে তাকাল রানা, সে হাঁপাচ্ছে। কড়া গলায় বলল, 'দেজান, লুকোচুরি করে লাভ নেই আর। নিজ থেকে

বলবেন, নাকি পেঁদিয়ে পেটের কথা বের করতে হবে?'

রানার চোখে চোখ রেখে দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত নিশ্চুপ রইল আবহাওয়াবিদ, তারপর হঠাৎই তার মুখে হাসি ফুটল। বলল, 'নাহ্, মি. রানা, আপনাকে ধোঁকা দেয়া বড্ড কঠিন। বলব, সবই বলব। আগে ডা. নোভাকের জ্ঞান ফেরান, সব ওঁরও শোনা দরকার।'

গালে কয়েকটা চাপড় দিতেই চোখ মেলল লিয়া, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল কয়েকটা মুহূর্ত, তারপর এটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'সরি, কাজটা পাগলামি হয়ে গেছে, তাই না?' অনেকটা শান্ত দেখাচ্ছে ওকে।

'তা তো বটেই,' বলল রানা। 'যে পরিস্থিতিতে পড়েছি, তাতে নিজেরা মারামারি করলে শুধু ঝামেলাই বাড়বে। তুমি নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারবে এখন? দেজানের কী যেন বলার আছে, সেটা আগে শুনে নিই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল লিয়া, উঠে বসল। 'আমাকে কে মেরেছে?'

'আমি না!' সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে বলল মুরল্যান্ড, 'সিলভিয়া বার্ক।' একটা আঙুল তুলল ও সিলভিয়ার দিকে, 'জার্মানির এক এবং অদ্বিতীয় কমব্যাট শেফ! লোকে যদি ওর স্টু খেয়ে কাবু না-ও হয়, আপার-কাটে নির্ঘাত হবে!'

হেসে উঠল সবাই।

'সরি, ববি। আপনাকে কামড়ে দিয়েছি।'

'চিন্তা করবেন না,' হালকা গলায় বলল মুরল্যান্ড। 'সুযোগ পেলে আমিও দেব এক কামড়... শোধ-বোধ হয়ে যাবে।'

এবার জুরকিচের দিকে কটমটে চোখে তাকাল লিয়া। 'আপনাকে গুলি করে মারা উচিত!'

'সব শোনার পর চাইলে মারতে পারেন, আমি বাধা দেব না,' বলল আবহাওয়াবিদ। 'তবে একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছেন

আপনি। আমি কোনও মন্দ লোক নই, কারও ক্ষতিও চাই না। যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের সবাইকে এই গ্রিনল্যান্ডে আনা হয়েছে, তা অত্যন্ত সৎ। আমরা চাই মানবজাতিকে একটা মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে।'

'খুলে বলুন সব।' আদেশের সুরে বলল রানা।

'বলব, বলার সময় হয়েছে। তার আগে, মি. রানা, আপনি বলুন, আমার ব্যাপারটা বুঝলেন কী করে?'

'বোঝা এমন কী কঠিন?' ঠোঁট উল্টাল রানা। 'যে সন্দেহটা শুরুতেই করা উচিত ছিল, সেটা অনেক পরে করায় বুঝতে দেরি হয়েছে। ম্যাক্সিম বোরোশিনের কাভারেই বিরাট খুঁত ছিল। মেরু অঞ্চলে উল্কাপিণ্ড খুঁজে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা দক্ষিণ মেরুতে। ওখানে তুষারপাত অনেক কম হয়, এখানকার মত আইস মুভমেন্টও নেই। বেশ কিছুদিন আগে আমি একটা আর্টিকেলে পড়েছিলাম—১৯৯৮ সালে গ্রিনল্যান্ডের উপকূলে *ক্যাঙ্গিলিয়া* উল্কার একটা অংশ খোঁজার জন্য জিয়োলজিস্টদের একটা টিম চেষ্টা করেছিল। ওদের সঙ্গে স্যাটেলাইট-সুবিধা আর অত্যাধুনিক যন্ত্র থাকার পরও এক আউন্স ছাই পর্যন্ত খুঁজে বের করতে পারেনি। অথচ ম্যাক্সিম দেখলাম প্রায় খালি হাতেই এসেছে। লিয়া আপনাদের দলে কী করছে, এটাও একটা প্রশ্ন হতে পারত—মাত্র চারজনের একটা টিমে ফুলটাইম একজন ডাক্তার প্রয়োজন হয় না। এসবকে শুরুতে আমি খুব একটা গুরুত্ব দিইনি, কারণ ভিতরে ভিতরে কী চলছিল, জানতাম না তখন। কিন্তু ম্যাক্সিম যখন খুন হলো, আর পরে থেলমার কাছে শুনলাম যে লিয়াকে ম্যাক্সিমই চেষ্টাচরিত্র করে এই এক্সপিডিশনে ঢুকিয়েছিল, তখনই ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলাম আমি। কার্ন হাজির এখানে, আমি হাজির, লিয়াও আছে; অথচ চতুর্থ পক্ষের কেউ থাকবে না? কে হতে পারে? জিয়ো-রিসার্চের কেউ নয়, আমার টিমে আছে শুধু স্যাম আর মুরল্যান্ড, বাকি রয়েছে কে? হ্যাঁ, ম্যাক্সিম বোরোশিন

আর তার দল। লিয়াকে যেহেতু সে আনিয়েছে, কাজেই সন্দেহের কোনও অবকাশ রইল না। মিটিয়র-হান্টিং স্রেফ একটা কাভার ছিল, তাই না? সান স্পটের উপর গবেষণা করতেও আসেননি আপনারা। ম্যাক্সিমের সঙ্গে আপনার যা বন্ধুত্ব দেখেছি, তাতে বুঝতে অসুবিধে হয় না, আপনারা সবাই একই দলের লোক, এসেছেন প্যান্ডোরা প্রজেক্ট নিয়ে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে।'

'মোটামুটি ঠিকই ধরেছেন,' বলল জুরকিচ। 'তবে ওই যে স্বার্থের কথা বললেন—ওটা জিয়ো-রিসার্চকে বাধা দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর কিছু নয়। আমরা সত্যিই বিজ্ঞানী, একটা মহৎ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছি, সাধারণ খুনে-বদমাশ নই।'

'ক্যাম্প ডিকেডে লাশটা পাওয়া যাবার পর ম্যাক্সিমের মনে সম্ভবত ওটার পরিচয় নিয়ে সন্দেহ জেগেছিল, তাই রাতের অন্ধকারে ওটাকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিল সে, তাই না?' বলে চলল রানা। 'আপনি সেটা জানতেন, ও মারা যাবার পর এটাও বুঝতে পেরেছেন যে, ওকে খুন করা হয়েছে। গত ক'দিন যা আচরণ করেছেন, তা শুধু বন্ধুশোকে নয়, ভয়ও পাচ্ছিলেন কখন আপনার পালা আসে, তাই ভেবে। জিয়ো-রিসার্চ আমাদের জোর করে বের করে দেয়ায় তাই আপনি আপত্তি করেননি। জানতেন, আপনার কাভার ফাঁস হয়ে গেছে, ওখানে থেকে কাজ করতে পারবেন না, খামোকা জানটা খোয়াবেন। কিন্তু চলে আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনও লাভ হয়নি, দেজান। প্লেনে বোমা রেখে কার্ন শুধু আমাকে আর লিয়াকে নয়, আপনাদেরও খুন করতে চেয়েছিল। মাত্র দুজনকে পথ থেকে সরাতে কেন লোকটা বারোজনের জীবন শেষ করে দিতে যাচ্ছিল, তার এটাই ব্যাখ্যা।'

'আমি জানি,' মাথা নিচু করে শান্ত গলায় বলল জুরকিচ। 'আমার কারণে পাঁচজন মানুষ মারা গেছে, আপনারাও আর কখনও ফিরতে পারবেন কি না সন্দেহ। বিবেকের দংশনে মরে যাচ্ছি আমি।'

'শুধু শুধু কষ্ট পাবেন না,' লোকটা যে ভান করছে না, তা এতক্ষণে বুঝতে পেরে বলল লিয়া। 'দায়ী তো কার্ন, দোষারোপ করতে হলে ওকে করুন।'

'ও একা নয়,' মুরল্যান্ড বলল। 'ম্যাক্সিম বোরোশিনকে অন্য কেউ খুন করেছে। কার্ন আসার আগে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'খুনীটা কে, বলতে পারো?'

'প্রমাণ নেই, তবে ধারণা করতে পারি,' বলল রানা। 'খুনী এমন কেউ, যে পিছন থেকে জ্যাক-হ্যান্ডেল চালিয়ে এক আঘাতে বোরোশিনের মাথা ফাটাতে পারে, কিন্তু লাশটা কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে পারে না... এত শক্তি নেই তার শরীরে, ফ্লোরের উপর দিয়ে টেনে টেনে লাশটা নিয়ে যেতে হয়েছিল তাকে।' সবার দিকে একবার করে তাকাল রানা। 'আমি বলব কাজটা কোনও মেয়ের।'

'মেয়ে?' বড় বড় চোখ করে তাকাল স্যাম। 'তারমানে... তারমানে...'

'ঠিকই আন্দাজ করছেন,' বলল রানা। 'পুরো ক্যাম্পে একটাই মেয়ে ফ্রেডারিখ কার্নের গার্লফ্রেন্ড... একটা মেয়েরই মানুষ খুন করার মত মানসিকতা আছে... সে হলো থেলমা শোয়ার্জ।'

'ওহ্ গড!' বলল জুরকিচ। 'জিয়ো-রিসার্চের অরিজিনাল স্টাফরা কেউ কার্নের সঙ্গে জড়িত নয় ভেবেছিলাম আমরা, মেয়ে বলে থেলমার কথা তো ভুলেও ভাবিনি।'

'ভাবা উচিত ছিল। তার আচার-আচরণ তো শুরু থেকেই সন্দেহ জাগাচ্ছিল।'

'আমরা ভেবেছি, তার স্বভাবই ওরকম। রস-কষহীন মেয়েমানুষ থাকে না কত!'

হাতের জার্নালটা আবার পড়তে শুরু করেছে লিয়া। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'দেজান, স্যাকলিচ নামে কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জিয়ো-রিসার্চের সম্পর্ক আছে কি না জানেন? এখানে বলছে, ওদেরকেই তেতাল্লিশ সালে প্যান্ডোরা প্রজেক্ট সম্পন্ন করার দায়িত্ব

দেয়া হয়েছিল; গ্রাবসহ অল্প ক'জন মিলিটারি এক্সপার্ট শুধু টেকনিক্যাল অ্যাসিসটেন্সের জন্য এসেছিল।'

মাথা ঝাঁকাল জুরকিচ। 'স্যাকলিচ গত বছর জিয়ো-রিসার্চকে কিনে নিয়েছে, যাতে এদের সায়েন্টিফিক ব্যাকগ্রাউন্ডের আড়াল নিয়ে নিজেদের কুমতলব হাসিল করতে পারে।'

'মতলবটা কী?' প্রশ্ন ছুঁড়ল স্যাম। 'আটাশ টন সোনা খুঁজে বের করা?'

জুরকিচের উত্তরে গ্রাবের কথাটাই প্রতিধ্বনিত হলো। 'সোনাটা এই গোটা অপারেশনের খুব সামান্য একটা অংশ।'

'সোনা নয়? তা হলে কী লুকোচ্ছিল ওরা?'

'কিছুই লুকোচ্ছিল না। ওরা বরফ খুঁড়ে একটা জিনিস বের করার চেষ্টা করছিল... এমন জিনিস, যেটা এই পৃথিবীর নয়।'

জুরকিচের এই উদ্ভট কথার অর্থ ধরতে পারল না কেউ, বোকার মত তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে, নীরবে ব্যাখ্যা চাইছে। কিন্তু রানার মগজ ঝড়ের বেগে কাজ করছে। চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর। বলল, 'উল্কাপিণ্ড! ...আপনি নিশ্চয়ই রেডিও-অ্যাকটিভ একটা উল্কাপিণ্ডের কথা বলছেন, যেটা ১৯৪৩ সালে গ্রিনল্যান্ডে এসে পড়েছিল।'

'ভেরি স্মার্ট, মি. রানা,' মুচকি হাসল জুরকিচ। 'উল্কাপিণ্ডই ওটা। তবে সময়টা আরও পেছাতে হবে, ওটা আসলে পৃথিবীতে এসে পড়েছিল ১৯০৮ সালে। অ্যাটমোস্ফিয়ার ভেদ করার সময় দুই টুকরো হয়ে যায় ওটা, বড় খণ্ডটা আঘাত করে রাশিয়ায়।'

সালটা শুনে কীসের কথা বলা হচ্ছে বুঝতে এক মুহূর্তও লাগল না রানার, এই জার্মান আবহাওয়াবিদ বিংশ শতকের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক রহস্যের রেফারেন্স টানছে। বিস্ময়ের ঘোরে একটা শব্দই শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল ওর—'তাঙ্গুশকা!'

'ঠিক, মি. রানা। আমি সেই তাঙ্গুশকা উল্কাপাতের কথাই বলছি, যেটা ১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সাইবেরিয়ায় আঘাত

হেনেছিল। ওটারই দ্বিতীয় খণ্ডটা খুঁজে বেড়াচ্ছিল নাৎসিরা।'

'কী বলছেন বুঝতে পারছি না। সাইবেরিয়া ফেলে গ্রিনল্যান্ডে কেন তাঙ্গুশকার উল্কা খুঁজবে ওরা?'

রানা ছাড়া বাকি সব শ্রোতা বোকার মত তাকিয়ে আছে ওদের দিকে। ওদের মুখ দেখে জুরকিচ বলল, 'দেখা যাচ্ছে, আপনারা কেউ ইতিহাস জানেন না। তা হলে গোড়া থেকেই বলি।' শুরু হলো গল্প, 'তাঙ্গুশকার বিস্ফোরণ হচ্ছে গেল শতাব্দীর সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর একটা। কেন ওটা ঘটল, তা সঠিকভাবে কেউ জানে না। বাজারে যেসব থিয়োরি প্রচলিত আছে, তাতে শুনবেন—একটা গ্রহাণু এসে পড়েছিল পৃথিবীতে, কেউ বা বলে ওটা একটা ধূমকেতু ছিল, আবার অনেকের ধারণা, মহাশূন্যে ভাসমান একটা ব্ল্যাকহোলের সঙ্গে ঘষা খেয়েছিল আমাদের গ্রহ। এমনকী এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়, যাদের স্থির বিশ্বাস—একটা ইউ.এফ.ও ক্র্যাশ করেছিল ওখানটায়, যেটার পারমাণবিক ইঞ্জিনের বিস্ফোরণে অমন কাণ্ড ঘটেছে। তবে কারণ যা-ই হোক, ফলাফলটা ছিল ভয়াবহ, সাইবেরিয়ার এক হাজার বর্গমাইল জঙ্গল ধ্বংস হয়ে মিশে গিয়েছিল মাটির সঙ্গে। দু-একটা গাছ যা-ও বা দাঁড়িয়ে ছিল, সেগুলোর অবস্থা হয়েছিল অ্যাটম বোমা পড়ার পর হিরোশিমার বিল্ডিংগুলোর মত। শকওয়েভের ধাক্কা ছড়িয়ে পড়েছিল দূর-দূরান্তে, সেই ওয়াশিংটনের সিসমোগ্রাফে পর্যন্ত ধরা পড়েছিল কম্পন। অস্বাভাবিক আলোর ছটা খালি চোখে দেখা গিয়েছিল ডেনমার্কের কোপেনহেগেন থেকেও। শুধু তা-ই নয়, প্রত্যক্ষদর্শীরা আকাশে দ্বিতীয় একটা উল্কাপিণ্ডকে উত্তরপূর্বমুখী হয়ে ছুটে যেতে দেখে। ওটাই এসে পড়েছিল গ্রিনল্যান্ডে। আপনাদের মনে রাখতে হবে, ওটা ছিল ১৯০৮ সাল, তখন কোনও বিমান-হেলিকপ্টার ছিল না, ছিল না স্যাটেলাইট, ছিল না ইলেকট্রনিক মিডিয়া। উল্কাপিণ্ডদুটো পড়েছিল সভ্যতা-বিবর্জিত দুর্গম দুটো অঞ্চলে। সাইবেরিয়ারটা তো তা-ও পরে প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু প্রায় একই

সময় যে গ্রিনল্যান্ডেও একটা পড়েছিল, তা কেউ জানতে পারেনি।

'এবার আসি মাসুদ রানার প্রশ্নটার প্রসঙ্গে। জার্মানরা যদি উল্কাপিণ্ডটাই চায়, তা হলে সাইবেরিয়া বাদ দিয়ে এই গ্রিনল্যাণ্ডে কেন তল্লাশি চালাচ্ছিল? এটার জবাব দিতে হলেও আবার ইতিহাসের দিকে তাকাতে হবে।' মুরল্যান্ডের বাড়িয়ে ধরা ব্র্যান্ডির মগ নিতে একটু থামল জুরকিচ, কয়েক চুমুকে ওটা খালি করে আবার খেই ধরল গল্পের। '১৯০৮-এ এত বড় ঘটনাটা ঘটে গেলেও প্রায় দুই দশক বিস্ফোরণটার উপর কোনও অনুসন্ধান চালানো হয়নি। এক্সপ্লোশন সাইটে প্রথম অভিযান পরিচালনা করা হয় ১৯২৭-এ, লিওনিদ কুলিক নামে এক রাশিয়ান বিজ্ঞানী নেতৃত্ব দেন সেটার। এই ভদ্রলোকের নামটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ, কষ্ট করে মনে রাখুন, একটু পরেই জানতে পারবেন কেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিদের হাতে ধরা পড়েন তিনি, ১৯৪২ সালে বন্দি অবস্থাতেই একটা প্রিজন ক্যাম্পে মারা যান। তাঁর উপর প্রচণ্ড অত্যাচার চালিয়েছিল জার্মানরা, ইন্টারোগেশনের তীব্রতায় তিনি ফাঁস করে দেন তাঙ্গুশকা বিস্ফোরণ সম্পর্কে যত গোপন তথ্য জানতেন, সব।

'উল্কাপিণ্ডটার ভয়াবহ ক্ষমতার কথা জানতে পেরে কুলিকের রিসার্চ নোটগুলো হাতে পাবার জন্য পাগল হয়ে যায় জার্মানরা, সেগুলো উদ্ধারের জন্য হাজার হাজার সৈনিকের জীবন চলে যায়...'

'কীভাবে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'যুদ্ধ করে। ধরা পড়ার আগে নোটবুকগুলো কুলিক পাঠিয়ে দিয়েছিলেন স্টালিনগ্রাদে এক বিশ্বস্ত সহকারীর কাছে। সেগুলো হাতে পাবার জন্য রাশিয়ায় হামলা চালায় তারা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী একটা লড়াই বেধে যায়...'

'এক মিনিট,' বলল স্যাম। 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না, বিখ্যাত স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ সামান্য কয়েকটা নোটবুক উদ্ধারের জন্য ঘটেছিল?'

'ঠিক তা-ই বলছি আমি,' হাসল জুরকিচ। 'ফ্রন্টে যখন

সম্মুখযুদ্ধ চলছিল, তখন কয়েক হাজার কমান্ডোকে পাঠানো হয় রাশিয়ান লাইনের পিছনে, নোটবুকগুলোর খোঁজে—তাদের বেশিরভাগই জীবন নিয়ে ফিরতে পারেনি। এটা শুনে অবাক হবার কিছু নেই, নিজের অবসেশনের তাড়নায় অ্যাডলফ হিটলার যেসব কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা কোনও কোনও ক্ষেত্রে গল্পকেও হার মানায়। সেগুলোর বেশিরভাগই উদ্ভট এবং পাগলামি হলেও দু-একটা ছিল জেনুইন বিষয়ের উপরে। তাঙ্গুশকার উল্কাপিণ্ডের ব্যাপারে ফ্যাসিনেশনটা সেই দুর্লভ বিষয়গুলোর একটা। ওই পদার্থ ঠিক যতটা ভেবেছিল হিটলার, তার চেয়েও শক্তিশালী ছিল।

'তো যা বলছিলাম, তাঙ্গুশকায় ১৯২৭-এ প্রথম অফিশিয়াল ইনভেস্টিগেশন চালানো হয়। তবে স্থানীয়ভাবে কিন্তু আরও আগেই লোকজন বিস্ফোরণটার রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছিল। উল্কাপাতের এক বছর পর প্রথমবারের মত একটা দল ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়, তবে বিরূপ আবহাওয়া এবং যাত্রার ধকল সইতে না পেরে তারা অর্ধেক পথ গিয়েই উল্টো ঘুরতে বাধ্য হয়। বলে রাখা ভাল, তাঙ্গুশকা হচ্ছে সাইবেরিয়ান তৈগা-র সবচেয়ে দুর্গম একটা এলাকা। এর দু'বছর পর, ১৯১১-তে একটা দল শেষ পর্যন্ত এক্সপ্লোশন সাইটে পৌঁছুতে সমর্থ হয়, আর তখনই কোনও মানুষ প্রথমবারের মত ধ্বংসযজ্ঞটা স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য লাভ করে।

'ওখানে কী ঘটেছে, এই খবর রাজধানী সেইন্ট পিটার্সবার্গে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ১৯১২ সাল হয়ে যায়। দেরি হবার কারণ ফিরতি পথে একের পর এক অভিযাত্রীর রহস্যময় মৃত্যু। কী একটা রোগ যেন ধরেছিল তাদের, সারা শরীর থেকে মাংস খসে পড়ছিল, শেষ পর্যন্ত লাশগুলোয় কঙ্কাল ছাড়া আর কিচ্ছু অবশিষ্ট থাকছিল না।'

এলমার গুডজনসেনের ছবিটা মানসচোখে ভেসে উঠল রানার, তার অ্যাগ্রেসিভ ক্যান্সারের সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে বর্ণনাটার।

'আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল স্থানীয় গ্রাম আর শহরগুলোতে,' বলে চলল জুরকিচ। 'অশিক্ষিত লোকজন বলাবলি করতে শুরু করল,

অভিশাপ নেমে এসেছে তাদের উপর। খোদ শয়তান ঘুসি মেরেছে তাঙ্গুশকায়, গোটা বন মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে, আর শয়তানের বিষাক্ত স্পর্শে মৃত্যুর নির্যাস ছড়িয়ে গেছে সবখানে, সেটাই মানুষ মেরে ফেলছে। এই সময় জঙ্গলের ভিতর ছোট ছোট পাথরের আকারে উল্কাটার বিভিন্ন অংশ পাওয়া যেতে থাকল, সেগুলো ধরলে উত্তাপ অনুভব করা যায়। এসব পাথর জনপদে পৌঁছুতেই রহস্যময় রোগটায় গ্রামের পর গ্রাম আর শহরের পর শহর উজাড় হয়ে যেতে শুরু করল। ব্যস, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ পাথরগুলোকে স্যাটানস্ স্কিন বা শয়তানের চামড়া বলতে শুরু করল, ঘুসির সময় যেটা ঝরে পড়েছে... শুরুতে ঘুসোঘুসিটা ছিল গুজব, এবার সেটা পরিণত হলো স্থির বিশ্বাসে। এই অবস্থায় উদয় হলো এক ধর্মযাজক, তার নির্দেশে অভিশাপের হাত থেকে বাঁচতে পাথরগুলো সোনাখচিত আইকনের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলতে শুরু করা হলো, যাতে আইকনের ভিতর থেকে শয়তানের অশুভ শক্তি বেরুতে না পারে।

'প্ল্যানটা কাজে লেগেছিল, এর পরে আর ক্ষতি হলো না কারও। তবে সেটা আইকনের জোরে নয়, সোনার কারণে। আনবিক ঘনত্ব বেশি হবার কারণে সোনা অনেকটা সীসার মতই রেডিয়েশন ঠেকাতে পারে। অবশ্য পরে লিওনিদ কুলিক গবেষণা করে বের করেছিলেন, উল্কাপিণ্ডটা যে রেডিয়েশন ছড়ায়, সেটা ঠেকাতে সীসার চেয়ে সোনাই বেশি কার্যকর। কারণটা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারেননি, অবশ্য সে আমলে তেজস্ক্রিয়তার ব্যাপারে মানুষ খুব একটা জানতও না। এতদিন পর আমরা যেটা ধারণা করতে পারি, তা হলো—উল্কাপিণ্ডটা আমাদের চেনা-জানা আলফা, বিটা, গামা এবং এক্স রে-র বাইরে আরও শক্তিশালী কোনও রেডিয়েশন ছড়াচ্ছে, যেটার মৌলিক বিশেষত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় শিল্ডিঙের জন্য স্বর্ণ বেশি কার্যকর হচ্ছে।'

দম নেয়ার জন্য থামল জুরকিচ। তার তত্ত্বে ফাঁক লক্ষ করে রানা জানতে চাইল, 'রেডিয়েশনটা যদি এতই শক্তিশালী হবে, তা

হলে ইম্প্যাক্ট সাইটে যারা গিয়েছিল, তারা সবাই পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল না কেন? বিশেষ করে প্রথম দলটা যখন গেল, তখন নিশ্চয়ই উল্কাটার অসংখ্য টুকরো সবখানে ছড়িয়ে রয়েছিল?'

'ওয়েল, কুলিক এর একটা সন্তোষজনক জবাব বের করতে পেরেছেন। যে-কোনও পদার্থ সময়ের সঙ্গে ক্ষয় হবার প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয়—*হাফ-লাইফ*। এই সময় পদার্থের আণবিক গুণাগুণ হ্রাস পেতে থাকে। উল্কাটারও হাফ-লাইফ আছে, তবে সেটার প্রকৃতি পৃথিবীর অন্যান্য পদার্থের চেয়ে ভিন্ন। কুলিক গবেষণা করে দেখেছেন, বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় প্রথমে ওটার উপরিভাগটা যখন বদলে যায়, তখন ওটাই একটা খোসার মত কাজ করে—ভিতরের অংশটাকে হাফ-লাইফের হাত থেকে বাঁচায়, সেইসঙ্গে রেডিয়েশনও বের হতে দেয় কম পরিমাণে। খোলসটা তখন ভিতর-বাইর দু'দিকের জন্যই ড্যাম্পেনিং ফিল্ড হয়ে দাঁড়ায়। এজন্যই তাৎক্ষণিকভাবে মানুষ মরে না, তবে রেডিয়েশনটার সামনে লম্বা সময়ের জন্য এক্সপোজড্ থাকলে মৃত্যু অনিবার্য। অভিযাত্রী আর গ্রামবাসীরা আস্তে আস্তে সময় নিয়ে এভাবেই মারা যাচ্ছিল। আর আপনি যদি একবার খোলসটা ভেঙে ভিতরের খাঁটি পদার্থটা বের করেন, তা হলে সঙ্গে সঙ্গেই মারা যাবেন।'

থিয়োরিটা নিয়ে ভাবল রানা, একেবারে অবিশ্বাস্য নয় পুরো ব্যাপারটা। বিশাল মহাশূন্যে এমন অনেক জিনিসই আছে, যা মানুষ আজ পর্যন্ত চোখে দেখেনি। একটা উল্কার সঙ্গে তেমন একটা অনাবিষ্কৃত নতুন পদার্থ পৃথিবীতে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

'বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শুনলাম অনেক,' বলল মুরল্যান্ড। 'আপনি আপনার গল্পটা শেষ করুন এবার।'

'নিশ্চয়ই,' বলল জুরকিচ। '১৯১২ সালের কথা বলছিলাম। রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা যখন খবর পেলেন যে, অদ্ভুত এক অভিশাপে তাঁর প্রজারা মারা যেতে শুরু করেছে, তখন তিনি

ব্যাপারটা তদন্ত করার জন্য তাঁর এক বিশ্বস্ত ধর্মযাজককে পাঠালেন ভ্যানাভারা... তাঙ্গুশকার সবচেয়ে নিকটবর্তী শহরে। এই ধর্মযাজকই প্রথম সোনার আইকনে পাথরগুলো ঢোকাতে শুরু করেন। তিনি অবশ্য জিনিসটাকে *স্যাটানস্ স্কিন* না বলে *স্যাটানস্ ফিস্ট*, মানে শয়তানের মুঠি বলতে বেশি পছন্দ করতেন। বিশাল এক প্রজেক্ট নেন সেই প্রিস্ট, সমস্ত শহর আর গ্রামের পাশাপাশি জঙ্গলে গিয়েও উল্কাটার যত খণ্ড পড়েছিল—সব খুঁজে নিয়ে আসেন, শয়তানের অভিশাপকে ঠেকানোর জন্য।'

'এজন্যই তা হলে উল্কাটার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি তাঙ্গুশকায়,' গম্ভীর ভাবে বলল রানা। 'কুলিক এবং পরবর্তী অন্যান্য অভিযাত্রীরা যাবার বহু আগেই জায়গাটা সাফ করে ফেলা হয়েছিল।'

'ঠিক,' জুরকিচ মাথা দোলাল। 'তবে উল্কার খণ্ডগুলো খুঁজে বের করার সময়ও প্রচুর লোক মারা যায়। এই প্রিস্ট নিজের জন্য সোনায় গড়া একটা বিশেষ বর্ম ব্যবহার করতেন বলে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, এই অশুভ পাথরগুলোকে আর কোনও মানুষের ক্ষতি করতে দেবেন না। আইকনের ভিতরে লুকানো পাথরগুলো তিনি সরিয়ে ফেলবেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।'

'কে এই প্রিস্ট?'

একটু হাসল জুরকিচ। 'তাঁর ভাল নাম গ্রেগোরি এফিমোভিচ নোভিখ।'

গল্পটায় লিয়া এতই মগ্ন হয়ে পড়েছিল যে, পরিচিত শব্দ তিনটে শুনেও প্রথমে ধরতে পারল না। কিন্তু জুরকিচের হাসিমুখ দেখে চিন্তিত হয়ে উঠল ও, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মনে পড়ে গেল কুখ্যাত লোকটার অতিপরিচিত ডাকনাম।

'রাসপুটিন!'

'হ্যাঁ, এই নামেই লোকে তাঁকে চেনে,' বলল জুরকিচ। 'রাসপুটিনই ছিলেন যারিনা আলেকজান্দ্রার সেই প্রতিনিধি!'

আট

রুদ্ধশ্বাস গল্পটা বলে চলেছে দেজান জুরকিচ।

'উল্কাপিণ্ডের সবগুলো টুকরো উদ্ধার করতে তাঙ্গুশকায় পুরো দুই বছর কাটান রাসপুটিন। সেইন্ট পিটার্সবার্গে ফেরার পর তিনি স্যাটাসন্ ফিস্টের কথা গোপন রাখেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে তখন, রাসপুটিনের ভয় হচ্ছিল, পদার্থটার খবর ফাঁস হলে সেটাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ১৯১৫-র জানুয়ারিতে জার্মানরা বোলিমভে বিষাক্ত গ্যাসের আক্রমণ চালালেও তিনি প্রতিশোধ নিতে চাননি, রহস্যটা চাপা দিয়ে রেখেছেন। যুদ্ধ আরও প্রবল আকার ধারণ করতেই স্যাটানস্ ফিস্টের ব্যাপারে কানাঘুষো শুরু হলো, রাসপুটিন বুঝতে পারলেন—তিনি চান আর না-ই চান, অত্যাচার করে হলেও তাঁর কাছ থেকে আইকনগুলোর খোঁজ বের করে নেবে তাঁর স্বদেশীরা। এই অবস্থায় বিশ্বস্ত কিছু প্রিস্টকে নিয়ে গোপন একটা সংঘ গড়লেন তিনি—নাম রাখলেন *ব্রাদারহুড অভ স্যাটানস্ ফিস্ট*, যাতে তিনি মারা গেলেও আইকনগুলো দেখাশুনোর কেউ থাকে। শেষ পর্যন্ত ১৯১৬-র ডিসেম্বরে হত্যা করা হয় রাসপুটিনকে—রাজ পরিবারের উপর অশুভ প্রভাব বিস্তারের জন্য নয়, ওটা ইতিহাসের বইয়ের লোক দেখানো কারণ; তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল রাশিয়ান সমরনায়কদের কাছে স্যাটানস্ ফিস্টের সন্ধান না দেয়ার অপরাধে।'

'তার মানে লোকের ধারণা ভুল? তিনি কোনও অর্ধোন্মাদ পিশাচ ছিলেন না?' জানতে চাইল লিয়া।

জুরকিচ হাসল। 'সেটা তাঁর আরেক সত্তা—ওটাতেও কোনও

মিথ্যে নেই। বরং বইপত্রে রাসপুটিনের যে অনৈতিক আর মন্দ চরিত্রের বিবরণ দেয়া হয়, তা অনেকটাই পরিশীলিত। বাস্তবে তিনি আরও খারাপ লোক ছিলেন। তবে ব্রাদারহুডের সদস্যদের চোখে তিনি একজন মহামানব, যিনি গোটা পৃথিবীকে মানুষের ধ্বংসের নেশার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন।'

'এর মধ্যে নাৎসিরা জড়িত হলো কীভাবে?' প্রশ্ন করল স্যাম।

'রাসপুটিনের মৃত্যুর কয়েক সপ্তাহ পরেই শুরু হয় প্রথম রাশিয়ান বিপ্লব। স্যাটানস্ ফিস্টের গুজব যারা জানত, তারা হয় মারা পড়ে, নয়তো দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। ধীরে ধীরে তাঙ্গুশকার বিস্ফোরণের ব্যাপারেও মানুষের কৌতূহল কমতে থাকে। মোট পঞ্চাশটা আইকনের ভিতর লুকানো ছিল উল্কার খণ্ডগুলো, সেগুলো দেশের আনাচে-কানাচে বিভিন্ন চার্চের ভিতর লুকিয়ে ফেলে ব্রাদারহুডের সদস্যরা। তারা কিছুদিন পর পরই জিনিসগুলোর লোকেশন বদলে ফেলত, যাতে কমিউনিস্টরা চেষ্টা করলেও সেগুলোর খোঁজ না পায়। এভাবে দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল। পুরনো সদস্যরা বুড়ো হয়ে পড়ল, ব্রাদারহুডের লক্ষ্য ধরে রাখার জন্য নতুন নতুন সদস্য আনা হলো। এদেরই একজন হলেন লিওনিদ কুলিক—সংঘের প্রথম সদস্য, যিনি প্রিস্ট নন। তাঁকে সংঘে ঢোকানোর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল—যাতে তিনি তাঙ্গুশকায় যেসব বৈসাদৃশ্য দেখেছেন, তা কাউকে না বলেন। অবশ্য স্রেফ মুখ বন্ধ রাখার জন্য কুলিককে সদস্য করা হলেও পরবর্তীতে আদর্শটার একজন সত্যিকার অনুসারী হয়ে ওঠেন তিনি, এমনকী একসময়ে সংঘের প্রধানও হন।'

'সংঘে কতজন সদস্য আছে? কারাই বা সদস্য হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা, সবার মত ও-ও বুঝতে পারছে, বোরোশিন আর জুরকিচ এই ব্রাদারহুডের লোক।

'সাধারণত কখনও পনেরো-বিশজনের বেশি সদস্য রাখা হয় না,' জানাল জুরকিচ। 'আকারে ছোট হওয়াতেই এত বছর ধরে

নিজেদের লুকিয়ে রাখতে পেরেছি আমরা। আগে শুধু রাশিয়ান প্রিস্টরাই সদস্য হতেন, তবে কুলিক দায়িত্ব নেয়ার পর ঠিক করলেন, দুনিয়া যেভাবে পাল্টাচ্ছে, তাতে সমমনা কিছু বিদেশি সদস্য নিয়োগ না দিলে ভবিষ্যতে বিপদ দেখা দেবে। তা ছাড়া সংঘে বিজ্ঞানীও প্রয়োজন, কারণ তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, স্যাটানস্ ফিস্ট আসলে কোনও অভিশাপ নয়, ওটা একটা বৈজ্ঞানিক বিস্ময়। ততদিনে তেজস্ক্রিয়তার উপর যথেষ্ট গবেষণা হয়েছে, ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে মানুষ জানতে পেরেছে। কুলিক ভেবে দেখলেন, পদার্থটা যদি একবার কোনও ফিযিসিস্টের হাতে পড়ে, তা হলে নিঃসন্দেহে ওটা পারমাণবিক বোমা তৈরিতে ব্যবহার করা হবে। তাই তিনি আইকনগুলো ধ্বংস করে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। একে একে সিমেন্টের চাঁইয়ে ভরা হলো উনপঞ্চাশটা আইকন, সেগুলো ফেলে দিয়ে আসা হলো সাগরে। শেষটা ছিল দুর্গম এক মঠে, সেটা তখনও আনা সম্ভব হয়নি, এমন সময় হানা দিল দুর্ভাগ্য। সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে বসল জার্মানি, কুলিক তখন ব্রাদারহুডের জন্য নতুন একটা মিশন নিয়ে ব্যস্ত—হিসেব করে বের করে ফেলেছেন উল্কার দ্বিতীয় খণ্ডটার ট্র্যাজেক্টরি, কোথায় সেটা পড়েছে। তাঁর ইচ্ছে ছিল ওটাকেও প্রথমটার মত সোনায় মুড়ে সাগরে ফেলে দেবেন। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হলো না, হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে গেলেন বেচারা। নাৎসিরা টরচার করে তাঁর পেট থেকে সব কথা বের করে নিল। সবকিছু শুনে হিটলার পাগল হয়ে গেল স্যাটানস্ ফিস্ট হাতে পাবার জন্য।'

কথা বলতে বলতে কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে, গ্লাসে ব্র্যান্ডি নিয়ে গলা ভেজাল জুরকিচ। তারপর খেই ধরল, 'স্টালিনগ্রাদের যুদ্ধ করে জার্মানরা শেষ পর্যন্ত শুধু কুলিকের নোটবুকগুলোই উদ্ধার করতে পেরেছিল, কোনও আইকন পায়নি। একটা বাদে সবগুলো আগেই ফেলে দেয়া হয়েছে পানিতে, শেষটাও ওদের অজান্তে সাধারণ

ট্রেজারের সঙ্গে লুঠ হয়ে গেছে। এই অবস্থায় পদার্থটার উৎস রইল শুধু দ্বিতীয় পিণ্ডটা, ওটার দিকেই নজর দিল তারা। কুলিকের ক্যালকুলেশন থেকে ওটা কোথায় পড়েছে, তা জেনে গেল সহজেই।'

'এখানে পড়েছিল ওটা,' বলল রানা। 'এই গ্রিনল্যান্ডে।'

'হ্যাঁ। কুলিকের নোটবুক থেকে উল্কাপিণ্ডটার লোকেশন জানতে পারে নাৎসিরা, তবে সেটা লাখ লাখ টন বরফের তলায় চাপা পড়ে গেছে। তখন চালু করা হলো প্যান্ডোরা প্রজেক্ট, পিণ্ডটা উদ্ধার করার জন্য। কন্ট্র্যাক্টটা দেয়া হয় স্যাকলিচ কর্পোরেশনকে, তাদেরকে সাহায্য করার জন্য সেবাস্টিয়ান গ্রাবসহ কয়েকজন এক্সপার্ট আসে, আর আসে কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে এক হাজার শ্রমিক। ইম্প্যাক্ট জোনের পাঁচ মাইল দূরে একটা গুহা খুঁজে বের করে ওরা, আন্ডারওয়াটার টানেল ধরে সাবমেরিনে করে ওখানে পৌঁছায়, শুরু করে খনন কাজ। আটাশ টন সোনা আনা হয়েছিল উদ্ধারকৃত স্যাটানস্ ফিস্টের স্টোরেজ বক্স তৈরি করার জন্য।' লিয়ার দিকে তাকাল জুরকিচ। 'কষ্ট করে জার্নালটা আপনার পড়তে হবে না, ডা. নোভাক। ওতে কী আছে না আছে সব আমি জানি, আপনার আগেই জিনিসটা আমি পড়ে দেখেছি। ওখানে শুধু এয়ারশাফট তৈরি আর টানেলিং শুরু হওয়া পর্যন্ত বর্ণনা পাবেন, এরপরই পা ভেঙে গ্রাব জার্মানি ফিরে আসে, প্রজেক্টটার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছে, জানত না সে।'

'আপনি জানেন?'

'না, পৃথিবীর কেউ জানে না। ক্যাম্প ডিকেডে পাওয়া ওই হতভাগ্য বন্দিই সম্ভবত একমাত্র মানুষ, যে আমাদের বলতে পারত—ওখানে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল।'

'এই জার্নাল আপনি পড়লেন কী করে?' ভুরু কোঁচকাল লিয়া।

'ওটা আমার হাত হয়েই আপনাদের কাছে এসেছে।'

'মানে!'

'আপনার দেহরক্ষী... মানে যাকে আপনারা রহস্যময় স্নাইপার বলছেন, সে আমাদের এক ভাই। আমাদের মিশনের জন্য আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন, সেজন্য আপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাকে। গ্রাবের বাড়িতে সে-ই আপনাকে বাঁচায়, আপনি চলে আসার পর খানিক পরে বাড়িটা তল্লাশি করে ও, জার্নালটা খুঁজে বের করে। মি. রানার কাছে জিনিসটা পাঠানোর আগে স্টাডি করি আমি।'

'জার্নালটা তা হলে আপনারা পাঠিয়েছেন আমার কাছে?' জানতে চাইল রানা।

'ইয়েস, মি. রানা।' বলল জুরকিচ। 'ডা. নোভাক তো তাঁর দাদু আর সেবাস্টিয়ান গ্রাবের মাধ্যমে প্যান্ডোরা প্রজেক্টের কথা জানতে পারছেন, কিন্তু আপনি আসছিলেন একেবারে অন্ধ হয়ে। এখানে কী ঘটতে যাচ্ছে, তার একটা আভাস দেয়ার জন্য মিউনিখের এক বিশ্বস্ত উকিলের মাধ্যমে গ্রাবের নামে জিনিসটা আপনার কাছে পাঠাই আমরা।'

'আমাকেই কেন? দুনিয়ায় এত লোক থাকতে আমার উপরেই আপনাদের নজর পড়ল কেন?'

'আমরা একটা ছোট সংগঠন, মি. রানা, সদস্যরা সাধারণ ধর্মযাজক বা বিজ্ঞানী। স্যাকলিচ বা নিয়ো-নাৎসিদের সঙ্গে কি লড়াই করে পেরে ওঠা সম্ভব আমাদের পক্ষে? সেজন্য আমাদের দরকার ছিল একজন দক্ষ, দুর্ধর্ষ লোক—যার এধরনের কাজে অভিজ্ঞতা আছে, একইসঙ্গে তাকে হতে হবে নির্লোভ এবং নিঃস্বার্থ... যে কিনা স্যাটানস্ ফিস্টের খোঁজ পেয়ে নিজের স্বার্থে ওটা ব্যবহার করবে না। বলতে দ্বিধা নেই, মি. রানা, সারা দুনিয়া খুঁজে অমন মানুষ কেবল একজনকেই পেয়েছি আমরা।'

'আর ববি?'

'মি. মুরল্যান্ড আপনার যোগ্য পার্টনার—সৎ, নিষ্ঠাবান, নির্লোভ। দুজনে একই ধরনের মানুষ আপনারা, সেইসঙ্গে

অসাধারণ একটা টিম। দুজনে মিলে ইতোপূর্বে স্যাকলিচের মত বড় বড় এবং ক্ষমতাবান প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিয়েছেন আপনারা—হীরকসম্রাট রডনি বুমার, চাইনিজ শিপিং ম্যাগনেট হুয়ান হান, আর্জেন্টাইন শিল্পপতি হিউগো হারমান... আরও শুনতে চান। আপনাদের এসব পুরনো মিশন স্টাডি করি আমরা... সেগুলো থেকে বুঝতে পারি, টাকার জোরে যারা সারা পৃথিবীকে বশ করতে চায়, তাদের ঠেকানোর ব্যাপারে আপনাদের একটা ন্যাক আছে। তা ছাড়া সার্ভেয়ার্স সোসাইটিতে আমাদের কানেকশন থাকায় আপনাদের সাহায্য চাওয়ার একটা পথও দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা—নিকোলাই ডেমেঙ্কোর বাবা এককালে আমাদের ব্রাদারহুডের একজন নিবেদিতপ্রাণ সদস্য ছিল। তার সাহায্য চাই আমরা, আপনাদের গ্রিনল্যান্ডে পাঠানোর একটা ব্যবস্থা করতে বলি। সে-ই ড্যানিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে জিয়ো-রিসার্চের এক্সপিডিশনের সঙ্গে সার্ভেয়ার্স সোসাইটি আর আমাদের টিমের থাকার ব্যবস্থা করে দেয়।'

'এত কিছুর প্রয়োজন ছিল কি? আমাদের উপর যদি আপনাদের এতই আস্থা থাকে, তা হলে সরাসরি সাহায্য চাইলেন না কেন? কেন এত লুকোচুরি করলেন? কেন চালাকি করে আমাদের এখানে এনে ফেললেন?'

'জবাবটা নিজেই চিন্তা করুন। নাম-পরিচয়হীন একটা গুপ্ত সংস্থা... যাদের সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না, যাদের মূল উদ্দেশ্য আপনার অজানা... এমন কেউ যদি মহাশূন্য থেকে আসা একটা অত্যাশ্চর্য পদার্থের আজগুবি গল্প আপনাকে শোনাতে আসতো, আপনি বিশ্বাস করতেন? তাদের সাহায্য করতেন?'

'হয়তো করতাম না,' স্বীকার করল রানা। 'তারপরও আপনাদের কোনও অধিকার ছিল না নিরীহ-নিরপেক্ষ-অপ্রস্তুত কিছু মানুষকে নিজেদের লড়াইয়ে টেনে আনার।'

'লড়াইটা আমরা করছি... এটা ঠিক। কিন্তু করছি কার জন্য?

আপনার জন্য, আপনার মত সারা পৃথিবীর কয়েক বিলিয়ন মানুষের জন্য, গোটা মানবজাতির জন্য। গত প্রায় একশো বছর ধরে ব্রাদারহুড অভ স্যাটানস্ ফিস্টের হাতে গোনা কয়েকজন সদস্য এই কঠিন কাজটা করে আসছে। আমরা অতিমানব নই, একা আর কতই বা সামলাব!' উত্তেজনা ফুটল জুরকিচের গলায়। 'কাম অন, মি. রানা! আমি তো মনে করি, যে-কারও সাহায্য নেয়ার অধিকার আছে আমাদের!'

'তাই বলে তাদের অজান্তে?'

'কাকে কতটুকু জানানো হবে, সেটা নির্ভর করে পরিস্থিতির উপর। আসলে... শুরুতে আমরা যেভাবে মিশনটা সাজিয়েছিলাম, তাতে বিপদের তেমন কোনও ঝুঁকিই ছিল না, আপনাকে আর মি. মুরল্যান্ডকে রাখা হয়েছিল ব্যাকআপ হিসেবে, হঠাৎ করে পরিস্থিতি বিগড়ালে যাতে সাহায্য চাওয়া যায়। এজন্যই কিছু জানাইনি আপনাদের।'

'খালি গ্রিনল্যান্ডে হাজির করলেই চলবে? চাইলেই যে সাহায্য করব, তা-ই বা ভাবলেন কী করে?'

'ওমা! এখন তা হলে করছেনটা কী?' হাসল জুরকিচ। 'আপনাদের রেপিউটেশন আমাদের খুব ভালই জানা আছে, মি. রানা। বিপদ দেখবেন, ঝামেলা দেখবেন... অথচ নিরীহ মানুষকে সাহায্য করবেন না, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবেন না... এ আপনারা কখনোই করবেন না। বরং আগ বাড়িয়ে যাবেন সমস্যাটা সমাধান করতে।'

'খোঁটা দিচ্ছেন?'

'জী না, প্রশংসা করছি। আপনার আর মি. মুরল্যান্ডের ভরসাতেই তো হাজারটা ঝামেলা শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও মিশনটা বাতিল করিনি আমরা।'

'কীসের কথা বলছেন, পরিষ্কার করে বলুন।'

'বলছি। জিয়ো-রিসার্চের আড়ালে স্যাকলিচ কর্পোরেশন

গ্রিনল্যান্ডে একটা অপারেশন শুরু করতে যাচ্ছে—এমন একটা গোপন খবর পাওয়ার পর তাদের ঠেকানোর জন্য মাঠে নামি আমরা। আমাদের প্রাথমিক প্ল্যানটা ছিল খুব সাদামাটা। প্রথমে আমরা ড. রাইমুন্ড নোভাকের কাছে সোনার কনসাইনমেন্টটার ব্যাপারে খবর পাঠাতে শুরু করি, যাতে তিনি তদন্ত করে সেবাস্টিয়ান গ্রাবের খোঁজ পান এবং তার কাছ থেকে তথ্য পেয়ে গ্রিনল্যান্ডের অপারেশন শুরু হবার আগেই সারা দুনিয়ার সামনে স্যাকলিচের গোমর ফাঁস করে দিতে পারেন। তবে তিনি যদি ওই সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করতে না পারেন, আর জিয়ো-রিসার্চ গ্রিনল্যান্ডে পৌঁছে যায়, তখন কী করা হবে—সেটার জন্য তৈরি রাখা হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনাটা। সেটা হলো—এক্সপিডিশনে ব্রাদারহুডের একটা দল পাঠানো, যাদের দায়িত্ব হবে জিয়ো-রিসার্চের কাজে স্যাবোটাজ ঘটানো। দলটার সাহায্যের জন্য আনা হয় আপনাকে আর মুরল্যান্ডকে, আর লিয়াকে আনা হয় ড. রাইমুন্ড নোভাকের প্রতিনিধি হিসেবে—যাতে এখানে কী ঘটছে না ঘটছে, তা দেখে দাদার কাছে রিপোর্ট পৌঁছে দিতে পারে, সেটা স্যাকলিচের মুখোশ খোলার সময় জোরালো প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে। বিপদের তেমন কোনও আশঙ্কা ছিল না, ভেবেছিলাম জিয়ো-রিসার্চকে দেরি করিয়ে দিতে পারব আমরা, লিয়াও যথেষ্ট প্রমাণ পেয়ে যাবে, রাইমুন্ড নোভাক সেগুলো প্রকাশ করে দেবেন, স্যাকলিচ ধ্বংস হয়ে যাবে, আপনাকে আর মুরল্যান্ডকে কিছুই করতে হবে না। ক্যাম্প ডিকেডের এক্সপিডিশন শেষ করে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবেন।

'সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেল গ্রাবের বাড়িতে স্যাকলিচ এজি-র স্পেশাল প্রজেক্টস্ ডিরেক্টর ফ্রেডারিখ কার্ন গিয়ে হাজির হওয়ায়। ঠিক ওই একই সময় যে লিয়া ওখানে গেলেন, সেটা কো-ইন্সিডেন্সই ছিল, তবে কো-ইন্সিডেন্সটা না ঘটলে আমরা জানতেই পারতাম না যে, শুরুর আগেই আমাদের মিশন পণ্ড হয়ে

যেতে বসেছে।'

'কী রকম?' জানতে চাইল রানা।

'গ্রাবের কাছে যাওয়ার কোনও কারণই নেই ফ্রেডারিখ কার্নের,' ব্যাখ্যা করল জুরকিচ। 'আপনি যেটা ধারণা করেছেন, এয়ারশ্যাফটের লোকেশন জানতে গিয়েছিল লোকটা—তা ঠিক নয়। শাফটটা ঠিক কোথায় আছে, তা না জানলেও স্যাকলিচের পুরনো রেকর্ডপত্রে তার নিশ্চয়ই কোনও আভাস আছে। জিয়ো-রিসার্চের কাছে যে ধরনের টেকনোলজি আছে, তাতে শাফটটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হবার কথা নয়। অন্তত যে জিনিস সামান্য চেষ্টায় পাওয়া সম্ভব, তার খবর জানতে নব্বুই বছরের একজন বৃদ্ধকে টরচার করার কোনও যুক্তিই পাওয়া যায় না।'

'তা হলে টরচারটা করা হচ্ছিল কীসের জন্য?'

'কার্ন জানতে চাইছিল, ব্রাদারহুডের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক আছে কি না, সে আমাদেরকে প্যান্ডোরা প্রজেক্ট সম্পর্কে কিছু বলে দিয়েছে কি না। ব্যাপারটা খুবই অবাক করল আমাদের, কারণ যে পরিমাণ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে আমরা যে স্যাকলিচের বিরুদ্ধে নেমেছি, তা কারও জানার কথা নয়। পরে অনেক খোঁজখবর নিয়েছি আমরা, জেনেছি, নিয়ো-নাৎসিরা প্রায়ই নাৎসি হান্টারদের উপর নজর রাখে, তাদের বাড়িঘর আর অফিসে দূর থেকে আড়ি পাতে। সম্ভবত সেভাবেই ওরা জেনে গেছে, ড. রাইমুন্ড নোভাকের মাধ্যমে প্যান্ডোরা প্রজেক্টের খবর ফাঁস করে দেবার চেষ্টা করছি আমরা। গ্রাব ছিল পুরো ব্যাপারটার একমাত্র জীবিত সাক্ষী, তাই তাকে টরচার করে মেরে ফেলতে গিয়েছিল কার্ন।'

'কিন্তু আপনারা তাকে বাঁচাতে পারতেন,' থমথমে গলায় বলল লিয়া। 'আমার দিকে নজর রাখার জন্য লোক লাগিয়েছিলেন, তার জন্য কিছু করেননি কেন?'

'সে যে কোনও বিপদে আছে তা-ই তো জানতাম না,' বলল

জুরকিচ। 'আপনার দাদুর অফিস থেকে খবর ফাঁস না হলে লোকটা সম্পূর্ণ নিরাপদই থাকত। আমরা তারপরও তাকে ফোন করেছিলাম, কোনও সমস্যা আছে কি না জানার চেষ্টা করেছিলাম, কিছুর আভাস পাইনি। গ্রাবের বাড়িতে কার্নকে দেখে আমরা অবাক হইনি ভেবেছেন? তারপরও আমাদের লোক আপনাদের দুজনকেই বাঁচানোর জন্য কার্নের উপর হামলা চালিয়েছিল। ভাগ্যের জোরে আপনি বেঁচেছেন, বেচারা গ্রাব বাঁচেননি। আপনারা দুজনই মরতে পারতেন, কী-ই বা আর করতে পারত একা আমাদের একটা লোক?'

কোনও জবাব দিতে পারল না লিয়া, জুরকিচের কথায় যুক্তি আছে। সবকিছু শোনার পর এদের ব্যাপারে ভুল ভেঙে যাচ্ছে ওর।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার মুখ খুলল জুরকিচ। 'ঘটনাটার পর আমরা বুঝতে পারি, ব্রাদারহুডের প্রাথমিক প্ল্যান ভেস্তে গেছে। গ্রাব মারা যাওয়ায় প্যান্ডোরা প্রজেক্টের অস্তিত্ব প্রমাণ করার কেউ রইল না। বাকি রয়েছে শুধু দ্বিতীয় পথটা—গ্রীনল্যান্ডে এসে জিয়ো-রিসার্চকে হাতেনাতে ধরা, লিয়ার মাধ্যমে ড. নোভাকের কাছে প্রমাণ পৌছে দেয়া। কিন্তু ওটাতেও ঝুঁকি দেখা দিল—ব্রাদারহুড যে পিছনে লেগেছে, তা জেনে গেছে ওরা। এখানে খুনোখুনি পর্যন্ত গড়াতে পারে ব্যাপারটা। মিশনটা বাতিল করে দেয়াই হয়তো ভাল হতো, কিন্তু তার ফলাফলটা হতো ভয়াবহ। নিয়ো-নাৎসিরা সুভ্যেনিরের জন্য চাইছে না স্যাটানস্ ফিস্ট, ওটা তারা সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। তা হতে দেয়া যায় না। মি. রানা, আপনি আর মুরল্যান্ডই ছিলেন আমাদের একমাত্র ভরসা, আপনাদের উপর আস্থা রেখেই আমরা জীবনের মায়া ত্যাগ করে এখানে এসেছি স্যাকলিচ আর নিয়ো-নাৎসিদের ঠেকাতে। আমি দুঃখিত যে এ-পর্যন্ত বেশ কয়েকজন মানুষ মারা গেছে, আমাদের লোকের পাশাপাশি এ-সবের সঙ্গে জড়িত নয়, এমন নারী-পুরুষও আছে—এই দায় আমি অস্বীকার করব না।

কিন্তু এদের... এমনকী আমার নিজের প্রাণের বিনিময়েও যদি স্যাকলিচকে ঠেকাতে পারি, তা হলে স্রষ্টা আমাকে নরকে পাঠালেও দুঃখ পাবো না।' একটু দম নিল জুরকিচ, তাকাল রানার দিকে। 'এই-ই ছিল আমার সব কথা, মি. রানা। সব খুলে বলেছি আপনাদের। এখন বলুন, আপনারা সাহায্য করবেন কি করবেন না। নাকি লিয়ার পরামর্শমত আমাকে গুলি করে মারবেন।'

মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'ববি, তুমি কী বলো?'

'যেহেতু বিশ্বযুদ্ধে আমরা জিতেছি, উল্কাপিণ্ডটা জার্মানদের হাতে পড়েনি একথা ধরে নেয়া যায়,' বলল মুরল্যান্ড। 'তার মানে ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে বরফের নীচে পড়ে আছে ওটা।'

'ঠিক।'

'আমার প্রশ্ন হলো হঠাৎ করে স্যাকলিচ ওটা হাতে পাবার জন্য এত মরিয়া হয়ে উঠল কেন? আগেই কেন চেষ্টা করেনি?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ। দেজান, আপনি জানেন?'

'না,' মাথা নাড়ল জুরকিচ।

'হুঁ, কারণটা যা-ই হোক, জিনিসটা ওদের হাতে পড়তে দেয়া যায় না,' গম্ভীর গলায় বলল রানা। 'আগের প্ল্যান মাফিকই কাজ করতে হবে আমাদের। প্যান্ডোরা গুহায় যাবো, ভিতরে ঢুকে এয়ারশাফটের মুখ ঢেকে দেব, কার্ন যেন ওটা খুঁজে না পায়।'

'এখনও যে পায়নি তা বুঝছি কী করে?' জিজ্ঞেস করল স্যাম। 'দেজান কী বলল, শোনেননি? ওদের কাছে কোম্পানির পুরনো কাগজপত্র আছে, গিয়ে হয়তো দেখব, অলরেডি দলবল নিয়ে ভিতরে ঢুকে বসে আছে সে।'

'মনে হয় না,' রানা মাথা নাড়ল। 'লোকেশন জানা থাকলে ওদের ক্যাম্প উত্তরে শিফট করতে হতো না। একটা হেলিকপ্টারে করে গিয়ে সোজা শাফটের সামনে নেমে পড়লেই চলত। ওদেরকে খোঁজাখুঁজি করতে হবে, স্যাম, লম্বা সময় নিয়ে। সেজন্যই থাকার ব্যবস্থা করেছে ওখানে। আমাদের সঙ্গে ম্যাপ আছে, আমরা ওদের

আগে পৌঁছুতে পারব।'

'কিন্তু গুহাটা মারাত্মক রেডিয়েশনে ভরা!' স্যাম আতঙ্কিত। 'আমরা সবাই মরব ওখানে গেলে।'

'সেটাও আমার মনে হচ্ছে না,' বলল রানা। 'যুদ্ধবন্দি লোকটা তা হলে দশ বছর ওখানে কাটাতে পারত না। ওখানে নিশ্চয়ই জার্মানদের রেখে যাওয়া খাবার-দাবারও আছে। ওগুলো আমাদের কাজে লাগবে।'

'কিন্তু তার শরীর রেডিয়েটেড ছিল! কে জানে, হয়তো দশ বছর পর ওখানে রেডিয়েশন লিক হয়েছিল... হয়তো সে কারণেই গুহা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হয় তাকে!'

'হতে পারে,' স্বীকার করল রানা। 'তবে লিকের মাত্রাটা খুব সিরিয়াস ছিল বলে বিশ্বাস করি না। যদি তা-ই হতো, তা হলে তিনশো কিলোমিটার হেঁটে ক্যাম্প ডিকেডে পৌঁছুতে পারত না লোকটা, অনেক আগেই মারা পড়ত। ডোন্ট ওয়ারি, স্যাম। যদি ওখানে রেডিয়েশন থাকেই, সেটা কতটুকু আর সেখানে কতক্ষণ থাকা নিরাপদ—এসব নির্ণয়ের জন্য গাইগার কাউন্টারটা আছে আমাদের কাছে।'

'কিন্তু কার্নের নৃশংসতা প্রমাণের মত কোনও যন্ত্র কি আছে আপনার কাছে?' তিক্ত গলায় বলল স্যাম। 'সে যখন ডিসি-থ্রী'র ধ্বংসাবশেষটা খালি অবস্থায় আবিষ্কার করবে, তখন কি বুঝে ফেলবে না—কোথায় যেতে পারি আমরা?'

'মোটেই না। সে কল্পনাও করতে পারবে না যে আমরা গুহাটার দিকে যেতে পারি, আমাদের কাছে যে ম্যাপ আছে—তাও জানে না লোকটা। সে বড়জোর এটা ভাবতে পারে যে, উদ্ধার পাবার আশায় আমরা উপকূলের দিকে যাচ্ছি।'

'কিন্তু গুহায় পৌঁছানোর পর কী ঘটবে? এয়ারশাফটের মুখ শুধু লুকিয়ে রাখলেই যে তাকে নিরস্ত করা যাবে, এটা আমি বিশ্বাস করি না। ওটার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই হাল ছাড়বে না।'

'ঠিক। কিন্তু তার হাতে সময় নেই বেশি। ড্যানিশ সরকার একজন ইনভেস্টিগেটর পাঠাচ্ছে জিয়ো-রিসার্চের এক্সপিডিশনের উপর নজর রাখার জন্য। এরপর জাপানি একটা টিম চলে আসবে আমাদের জায়গাটা নিতে। চাইলেও সে এই এলাকায় অনন্তকাল থাকতে পারবে না। সোলার ম্যাক্সও কেটে যাবে এর মধ্যে, আপনার স্যাট-ফোনটা কাজে লাগিয়ে আমরা রি-এনফোর্সমেন্ট নিয়ে আসতে পারব।'

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্যাম, রানার সঙ্গে যুক্তিতে পেরে উঠছে না। 'আমরা তা হলে যাচ্ছিই?'

'নিশ্চয়ই,' সিদ্ধান্ত নেয়ার সুরে বলল রানা। 'আমাদেরকে জানতে হবে, প্যান্ডোরা প্রজেক্ট কেন ব্যর্থ হয়েছিল। চৌষট্টি বছর আগে ওখানে ঘটেছিলটা কী?'

সূর্য ওঠার আগেই সবাইকে জাগিয়ে তুলল রানা। রাতে ও হিসেব করে দেখেছে, ভোরের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যদি রওনা দেয়া যায়, তা হলে দুই দিনের মধ্যে আটাশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব—আগামীকাল রাতের মধ্যেই পৌঁছে যাবে ওরা প্যান্ডোরা গুহায়। আর্কটিক গিয়ার, প্রয়োজনীয় সাপ্লাই আর খুব জরুরি ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছাড়া কাউকে কিছু নিতে দিল না ও আর মুরল্যান্ড। তারপরও লাগেজের স্তূপ বিশাল হয়ে গেল, সবার পিঠেই ওঠাতে হলো ভারী বোঝা। মানুষ ওরা সাতজন হলেও আহত কো-পাইলট আরসেন কিছু নিতে পারবে না, তার ভাগের জিনিসপত্র হাসিমুখে নিজের কাঁধে তুলে নিল মুরল্যান্ড, ষাট পাউন্ড

ওজনের এক বিরাট বোঝার নীচে তার বেঁটে-খাটো শরীরটা কিম্ভূতকিমাকার দেখাতে থাকল।

যে ক'টা অবিকৃত লাশ আর মৃতদেহের খণ্ড পাওয়া গিয়েছিল, সেগুলো সবই গতকাল রানা স্ট্র্যাটোফ্রেইটারের দিকে রওনা হবার পর বরফ খুঁড়ে কবর দিয়েছিল মুরল্যান্ড, স্যাম আর জুরকিচ। যাত্রা শুরু করার আগে কবরগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত সম্মান জানাল বেঁচে থাকা সাতজন যাত্রী। এরপর সূর্য উঠতেই বেরিয়ে পড়ল অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উদ্দেশে, কেউ জানে না, সামনে কী বিপদ অপেক্ষা করছে। জানে না, আদৌ ওরা আর ওখান থেকে ফিরতে পারবে কি না।

সি-নাইন্টি সেভেনটার ধ্বংসাবশেষকে পাশ কাটিয়ে ওদেরকে প্যান্ডোরা গুহায় যেতে হবে বলে রানা ঠিক করেছে, ওখানেই প্রথম যাবে ওরা, মেজর কনওয়ের লাশটাকে কবর দিয়ে যাবে। কার্ন যাতে বিমানটা পরীক্ষা করে রানার মত বুঝে না ফেলে যে, ক্যাম্প ডিকেডের লাশটা পাইলটের ছিল না। কোনওভাবে যুদ্ধবন্দির কথা টের পেলে ওদের প্ল্যানটা সে আঁচ করে ফেলতে পারে।

কুয়াশা কেটে গেছে। পথ চলতে গিয়ে রানা লক্ষ করল, ওর গতকালের ট্র্যাকের চিহ্নও নেই, দুরন্ত বাতাস তুষার উড়িয়ে ঢেকে দিয়েছে সব। খুশি হয়ে উঠল ও, কয়েক ঘণ্টার ভিতর ওদের এবারের ট্র্যাকও মুছে যাবে, কেউ অনুসরণ করতে পারবে না।

গতকালের চেয়ে আজ আবহাওয়ার অবস্থা ভাল, তাই ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই ক্র্যাশসাইটে পৌঁছে গেল দলটা। ককপিট থেকে মেজর কনওয়ের লাশ বের করে এনে কবর দিতে লাগল আরও একটা ঘন্টা, তারপর ত্রিশ মিনিটের বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হলো ওরা।

এক সারিতে এগোচ্ছে সাতজন মানুষ। শুরুতে রানাই গাইডের ভূমিকায় ছিল, তবে বেলা বাড়তেই বোঝা গেল—সবার সামনে থেকে একজন মানুষের পক্ষে পুরো রাস্তার বাতাস আর ঠাণ্ডার

কামড় খেয়ে ট্রেইলব্লেজিং করা সম্ভব নয়। ঠিক করা হলো, সমর্থ পুরুষেরা এক ঘণ্টা পর পর পালা বদলে সামনে চলে যাবে। লিয়া প্রতিবাদ করে উঠল—মেয়ে বলে তাকে অবহেলা করা হচ্ছে, কারও চেয়ে কম যায় না ও, রোস্টারে তাকেও নিতে হবে। বুদ্ধি করে ওকে নিরস্ত করল রানা, ডিসি-থ্রী'র ইমার্জেন্সি কিট থেকে আনা কম্পাসটা ও ধরিয়ে দিল লিয়ার হাতে, রাখল গাইডের ঠিক পিছনে, দায়িত্ব দিল সামনের মানুষটাকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার।

পথটা কঠিন হলেও রানা ও মুরল্যান্ড চেষ্টা করে গেল বাকিদের সাহায্য করার—এক ঘণ্টার জায়গায় দেড়-দু'ঘণ্টা করে গাইডের দায়িত্ব পালন করল, পিছনে এসেও আরসেন ও সিলভিয়াকে সাহায্য করল হাঁটতে, এই দুজনই দলের সবচেয়ে দুর্বল সদস্য। আরসেন অবশ্য তেমন কষ্ট দিল না কাউকে, লিয়া কী একটা পেইনকিলার যেন দিয়েছে তাকে—ব্যথা কমলেও চেতনা ঠিকমতই কাজ করছে তার, তা ছাড়া বয়সও অল্প, স্লিঙে একটা হাত বাঁধা থাকা সত্ত্বেও ব্যালেন্স রেখে মোটামুটি তাল মিলিয়েই এগোতে পারছে সে।

লেটেস্ট ফাউল-ওয়েদার গিয়ার পরে থাকায় ঠাণ্ডাটা সহজেই মোকাবেলা করতে পারছে সবাই, শুরুতে চলতেও পারল বেশ দ্রুত, কিন্তু সময় বাড়তেই ক্রমে ছেঁকে ধরল ক্লান্তি, তাই কমতে শুরু করল চলার গতি—যাত্রার শুরুতে যে গতিতে এগোচ্ছিল, পরে সেটা নেমে এল চারভাগের একভাগে। বিশাল দেহের কারণে সিলভিয়া প্রথমে ভেঙে পড়বে মনে হয়েছিল, এমনকী আরসেনকেও কাঁধে তুলে নিতে হবে—এমন ভয় ছিল। কিন্তু রানাকে অবাক করে দিয়ে সবার আগে মচকাল জুরকিচ—বিজ্ঞানী সে, কায়িক পরিশ্রমে মোটেই অভ্যস্ত নয়। শেষ দিকে এসে সারাক্ষণ তাকে তাড়া দিতে হলো, আর আবহাওয়াবিদের এই অবস্থার মাশুল গুনতে হলো সবাইকে। বিকেল পাঁচটায় ওরা যখন থামল, তখন মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পথ পাড়ি দেয়া গেছে। মাত্র একটা রাতের বেশি

খোলা আকাশের নীচে কাটাবে না বলে রানা যে পরিকল্পনাটা নিয়েছিল, সেটা আর ঠিক থাকছে না।

রাতের মত থামার সিদ্ধান্ত নিল রানা। ডানে একটা মাউন্টেন রিজ আছে, ওটার আড়ালে আশ্রয় নেবে বলে ঠিক করল। মাথার উপর ছাদ না থাকলেও দমকা হাওয়ার হাত থেকে বাঁচা যাবে ওখানে। বাতাসের বিপরীতমুখী ঢালে চলে গেল ওরা, রানা সবাইকে স্লেড ডগের কায়দায় বরফে গর্ত খুঁড়ে রাত কাটাতে নির্দেশ দিল।

যার যার গর্ত খুঁড়তে শুরু করেছিল ওরা, লিয়া বাধা দিল। বরফমোড়া পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে ওর, সার্ভাইভালের জন্য কী করতে হবে জানে। 'এভাবে না,' বলল ও। 'একেক গর্তে কমপক্ষে দুজন থাকতে হবে, যাতে বডি হিট শেয়ার করা যায়। আপনারা যার যার সঙ্গী বেছে নিন।'

'থ্যাংকস্, লিয়া,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা মাথায় আসেনি আমার।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কিছু নেই,' গগলস্ খুলে হাসল লিয়া। 'আমরা একে অন্যকে সাহায্য করতেই তো এসেছি, তাই না?' জ্যাকেটের চেন খুলে ফেলেছে ও, চোখের তারাদুটো কি আমন্ত্রণ জানাচ্ছে?

খুব লোভ হলো রানার ওকে সঙ্গী হিসেবে পেতে, কিন্তু দেখা গেল ডাক্তার তার রোগীর কথা ভুলে যায়নি। 'আরসেন, তুমি থাকছ আমার সাথে।'

পথশ্রমে মুখের রক্ত সরে গেছে কো-পাইলটের। তারপরও রানার দিকে চেয়ে শুকনো একটা হাসি দিয়ে সে বলল, 'আমি জানতাম, হাত ভাঙার কোনও না কোনও সুবিধে আছেই।'

সংখ্যায় ওরা বেজোড়, তাই একটা গর্তে তিন জন থাকতে হবে। সিলভিয়া মোটাসোটা বলে তার গর্তেই বেশি লোক রাখার সিদ্ধান্ত হলো। কিন্তু থাকবেটা কে? রানার আপত্তি নেই, বাকিদের মধ্যে টস হলো, তাতে হেরে গেল মুরল্যান্ড। মুখ কালো করে

বলল, 'হাতটা আমার ভাঙল না কেন—এই দুঃখে মরে যাচ্ছি আমি।'

রাত বাড়তেই হাসি-ঠাট্টার অবস্থা আর রইল না কারও, গর্তগুলো ঠাণ্ডার বিরুদ্ধে ইনসুলেশন হিসেবে কাজ করার পরও তেমন লাভ হলো না ওদের। প্রচণ্ড শীতে দাঁতে দাঁত ঠোকাঠুকি হতে থাকল সবার, কেউ কাউকে সান্ত্বনা বা সাহস দিতে পারল না। এই পরিস্থিতিতে ঘুমানোর চেষ্টা করা বৃথা; শুধু চোখ বুজে, মাটি কামড়ে রাতটা পার করে দেবার প্রয়াস চালাল অসহায় মানুষগুলো। তা-ও সহজ হলো না।

মাঝরাতের পর দিক বদলাল বাতাস, ওদের শরীরের উপর থেকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকল তুষারের চাদর, নির্দয়ভাবে চামড়ায়ও কামড় বসাচ্ছে। সবাইকে উঠে যেতে নির্দেশ দিল রানা, পাহাড়ের অন্যপাশের ঢালে গিয়ে বড় করে একটা গর্ত খোঁড়াল; সেটাতে ঢুকে পড়ল গোটা দলটাকে নিয়ে। সবাই এক সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে শোয়ায় এবার কিছুটা আরামদায়ক হলো পরিস্থিতি, এক পর্যায়ে ক্লান্ত শরীরগুলো হাল ছেড়ে দিয়ে ওদের ঘুমও পাড়িয়ে দিল।

ভোরের আলো ফুটতেই গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে এল সাত অভিযাত্রী, সঙ্গে আনা একমাত্র স্টোভটায় বরফ গলিয়ে পানি বানাল, তারপর সেটা আর প্রোটিন বার দিয়ে সাদামাটা ব্রেকফাস্ট সারল। সামনে কষ্টকর একটা দিন অপেক্ষা করছে।

জিনিসপত্র গোছগাছ করে আবার পথে নামল দলটা। বাতাসের গতি বেড়ে গেছে, পিছন থেকে ঠেলছে তুমুল আক্রোশে। ওদের রেখে আসা পায়ের ছাপগুলো মুহূর্তেই হারিয়ে যাচ্ছে, তুষার এসে চাপা দিয়ে যাচ্ছে সব। গতকাল গাইড পাল্টানোর যে পদ্ধতিটা অনুসরণ করেছিল, সেটার পুনরাবৃত্তি করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে [illegible] ওরা উত্তরদিকে। বিরূপ প্রকৃতির মাঝখানে এসে মাথা কাজ [illegible] না কারও, কোথায় যাচ্ছে তার কোনও চিন্তা নেই, যন্ত্রের

মত শুধু যার যার সামনে থাকা মানুষটাকে অনুসরণ করছে। কম্পাস হাতে নেভিগেটর হিসেবে লিয়া আর নেতা হিসেবে রানার প্রতি অবিচল আস্থার এ যেন এক মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

আগের দিনের মত আজও রানা আর মুরল্যান্ডকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট করতে হলো। ওদের দুজনের দিকে তাকিয়েই আশায় বুক বেঁধেছে বাকি পাঁচজন মানুষ, এ কারণে যখনই পথ কঠিন হয়ে উঠল, যখনই আবহাওয়া বেশি খারাপ হয়ে উঠল, গাইডের দায়িত্ব নিল ওদের একজন... বাকিদের সাহস দিতে। তা ছাড়া সারাটা পথ সবাইকে চাঙ্গা রাখা আর দুর্বলদের সাহায্য করার গুরুদায়িত্ব তো আছেই, নিজেদের কষ্টটাও গোপন রাখতে হচ্ছে। ব্যাপারটা ওদের পিঠে ঝুলতে থাকা ভারী বোঝাগুলোর চেয়েও ওজনদার হয়ে উঠল।

এগারোটা নাগাদ সত্যিকার অর্থে একটা দুর্গম এলাকায় পৌঁছাল ওরা। এখানকার সারফেস খুবই অসমতল, বরফ ফেটে গেছে জায়গায় জায়গায়, তৈরি হয়েছে প্রেশার রিজ, একেকটা ফাটলের গভীরতা পনেরো ফুটের কম নয়। কিছু কিছু জায়গা লাফ দিয়ে পার হওয়া গেলেও বেশিরভাগই একপাশ দিয়ে নেমে অন্যপাশে বেয়ে উঠতে হবে। পোলার এক্সপিডিশনে এ ধরনের এলাকা পাড়ি দেয়ার জন্য সঙ্গে লাইটওয়েট ল্যাডার রাখতে হয়, কিন্তু ওদের কাছে নেই। বাকিরা কষ্টে-সৃষ্টে নিজের চেষ্টায় যা-ও বা ফাটলগুলো পার হলো, আরসেনকে নিয়ে ধকলটা গেল সবচেয়ে বেশি। ফাটলের দু'প্রান্তে দড়ি বেঁধে আহত কো-পাইলটকে পার করতে হলো, এর ফলে জায়গাটা অতিক্রম করতে অস্বাভাবিক রকম দীর্ঘ সময় লেগে গেল ওদের।

অবশ্য এত কষ্টের পরও কেউ অভিযোগ করল না, আর করল যে না—তারজন্য পুরো কৃতিত্ব রানা আর মুরল্যান্ডকে দিতে হয়। অভিযাত্রীদের প্রতি পদক্ষেপে প্রকাশ পাচ্ছে যন্ত্রণা আর ক্লান্তি, কিন্তু দুই বন্ধুর অবিরাম চেষ্টায় সেটা ভুলে যাচ্ছে সবাই। পাঁচ জন পুরুষ

আর দু'জন নারী—যারা কয়েকদিন আগে একে অন্যের নাম পর্যন্ত জানত না, তারা এই নিদারুণ কষ্টে মিলেমিশে গেছে। যোগ্য নেতা আর তার সহকারী ওদের শেখাচ্ছে, কীভাবে পরস্পরকে সাহায্য করতে করতে বিপদ পাড়ি দিতে হয়, কীভাবে সহ্যের সীমা পার হয়ে যাবার পরেও মানুষ মানুষকে কয়েক গুণ বেশি যন্ত্রণা সইবার শক্তি যোগাতে পারে।

এই চরম ঠাণ্ডা আর বরফের রাজ্যেও যে এভাবে পানির পিপাসা ধরতে পারে, তা ওদের অনেকেই জানত না। পরিশ্রমে ওরা যে শুধু ঘামছে, তা-ই নয়, প্রতিটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে শরীরের ভিতর থেকে মূল্যবান জলীয় বাষ্প; কারণ আর্কটিকের বাতাসে মানুষকে কষ্ট দেবার মত সবই আছে, নেই শুধু আর্দ্রতা। শরীরের কাছাকাছি ক্যান্টিন বেঁধে রেখেছে অভিযাত্রীরা, যাতে ভিতরের পানিটা বরফ হয়ে না যায়। তারপরও বোতলগুলো এত দ্রুত খালি হয়ে যাচ্ছে যে, নতুন করে ভরে নেয়ার জন্য দু'ঘণ্টা পর পর থেমে স্টোভে বরফ গলিয়ে ভরে নিতে হচ্ছে। এতেও বেরিয়ে গেল অনেকটা সময়। শেষ পর্যন্ত গতকালের তুলনায় এক ঘণ্টা বেশি হাঁটার পরও যখন ওরা রাতের মত থামল, রানা হিসেব কষে দেখল—পরিবর্তিত প্ল্যানমাফিক ওরা সারাদিনে বরাদ্দ দ্বিতীয়-তৃতীয়াংশ রাস্তা পেরুতে পারেনি। শরীরের শক্তিও শেষ হয়ে এসেছে সবার।

সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দেজান জুরকিচের। ফেস-মাস্কের ফাঁক গলে কীভাবে যেন তার চামড়ার নাগাল পেয়ে গিয়েছিল কনকনে বাতাস, ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হয়েছে গালের উপরের অংশ। লিয়া যখন তার বুট খোলাল, দেখা গেল পায়ের পাতা দুটো অস্বাভাবিক রকম ফ্যাকাসে সাদা হয়ে রয়েছে।

'এ কী অবস্থা!' বিস্মিত গলায় বলল তরুণী ডাক্তার। 'পা জমে যাবার অবস্থা... আপনি কাউকে কিছু বলেননি কেন? হিরো সাজতে চান নাকি? আগামীতে এমন হলে অবশ্যই আমাদের বলবেন,

আমরা থেমে আপনার পা গরমের ব্যবস্থা করব। ফ্রস্টবাইটে পা চলে গেলে আমরা আপনাকে তুলে নিয়ে যেতে পারব না কিন্তু!'

স্টোভ জ্বালানো হয়েছে, আগুনের কাছে পা দুটো নিয়ে ম্যাসাজ করতে শুরু করল লিয়া। রক্ত চলাচল ফিরে আসছে, ব্যথায় মুখ কোঁচকাল আবহাওয়াবিদ। দুর্বল গলায় বলল, 'এমনিতেই যথেষ্ট আস্তে যাচ্ছি আমরা। তার উপর আমার পা গরম করার জন্য সবার দেরি করিয়ে দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?'

'আর আপনাকে বরফের উপর ফেলে চলে গেলেই বুঝি সবাই দৌড়ানোর শক্তি পাবে?' রাগী গলায় বলল লিয়া। 'ফালতু কথা একদম বলবেন না!'

ওদের কথাবার্তায় মন নেই রানার, আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। সারাদিন ধরে দিগন্ত পর্যন্ত ছেয়ে রাখা মেঘটা সরে গেছে হঠাৎ করে, উপরটা একদম পরিষ্কার। মস্ত এক কালো পর্দার উপর যেন খেলা দেখাচ্ছে মেরুজ্যোতি, রং বদলাচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে—লাল, নীল, সবুজ, আরও কত কী! এটাই হলো সেই বিখ্যাত অরোরা বোরিয়ালিস। রানার জানা আছে, এই বিচিত্র বর্ণগুলো বায়ুমণ্ডলের ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর সঙ্গে সৌরবায়ুর ঘর্ষণের ফলে সৃষ্টি হয়—লালটা সাধারণ নাইট্রোজেন, বেগুনীটা আয়োনাইজড্ নাইট্রোজেন, সবুজটা অক্সিজেনের জন্য। কিন্তু এসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নিয়ে ভাবছে না ও। অরোরার স্বর্গীয় আলো এমনই এক অতিপ্রাকৃত দৃশ্য যে, মুগ্ধতা ছাড়া আর কিছু মাথায় থাকে না। সারাক্ষণ সরীসৃপের মত নড়তে-চড়তে থাকা স্বচ্ছ আলোর রঙিন ফিতেগুলো জান্তব, সম্মোহনী এবং হৃৎকম্প জাগানোর মত সুন্দর।

আকাশ দেখতে দেখতে হঠাৎই রানা অনুভব করল, বাতাসের প্রকোপ কমে গেছে। গত কয়েকটা দিন একটানা ঝোড়ো বাতাসে এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, এই শান্ত পরিবেশটা কেমন বিসদৃশ ঠেকল ওর কাছে। ব্যাপারটা কী, এটা কি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা, নাকি অন্য কিছু? সঙ্গে সঙ্গে বর্গ হোটেলের সামনে

দাঁড়িয়ে ম্যাক্সিম বোরোশিন কী বলেছিল, মনে পড়ে গেল ওর।

'পিটারাক' কী, জানেন তো? মাধ্যাকর্ষণজনিত বায়ুপ্রবাহ। অসম্ভব ঠাণ্ডা। দক্ষিণ থেকে প্রথমে হালকা একটা বাতাস আসে, তারপর সব চুপচাপ। দশ মিনিট সময় পাবেন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। এরপরই উত্তরদিক থেকে শুরু হবে ভয়ঙ্কর বাতাস, ঘণ্টায় দুশো চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত গতি ওঠার প্রমাণ পাওয়া গেছে। দশ বছর আগে এক লোক ওটার কবলে পড়েছিল। তার লাশটা পাওয়া যায় বিশ কিলোমিটার দূরে...

আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল রানা, সন্দেহটাকে অমূলক প্রমাণ করতে চায়। 'ববি, খানিক আগে কি হালকা বাতাস বইছিল?'

'হ্যাঁ, এখন তো থেমেই গেছে,' জানাল মুরল্যান্ড। 'আহ্, কী শান্তি! সারাক্ষণ যদি এমনটা হতো! শোঁ শোঁ আর ভাল্লাগে না...'

'খোদার দোহাই! এমন প্রার্থনা ভুলেও কোরো না!'

'কেন? হয়েছেটা কী?' মুরল্যান্ড বিস্মিত।

তিক্ত একটা হাসি হাসল রানা, অদৃষ্ট ভালমতই খেলছে ওদের নিয়ে, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রকৃতি—অসহায় মানুষগুলোকে পাঁচ আঙুল দেখিয়েই ছাড়বে। ও বলল, 'পিটারাক... একটা পিটারাকের কবলে পড়তে চলেছি আমরা।'

দশ

'সবাই কাভার নিন, জলদি!' তাড়া লাগাল রানা।

'কেন, কী হয়েছে?' বোকা বোকা গলায় প্রশ্ন করল স্যাম।

'ভয়ঙ্কর একটা ঝোড়ো বাতাস আসবে এখনই, অনেকটা হারিকেনের মত। খোলা জায়গায় থাকলে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। ফর গডস্ সেক, বসে থাকবেন না কেউ! তাড়াতাড়ি আড়াল খুঁজে বের করুন।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সবাই, হাতের কাজ ফেলে গর্ত খুঁড়তে শুরু করল।

'এখানে না,' বলল রানা। 'আমরা ভুল দিকে আছি। ঢাল টপকে পাহাড়ের উল্টোপাশে যেতে হবে।'

যত দ্রুত সম্ভব জিনিসপত্র তুলে নিয়ে ছুটতে শুরু করল রানা, বাকিরা ওর পিছু পিছু। উত্তরদিকের ঢালে পৌঁছেই ডাইভ দিল ও, পাগলের মত তুষার সরাতে শুরু করেছে। দলের অন্যেরাও ওর দেখাদেখি তা-ই করছে। গতকালের মত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে হলো না কাজটা, সঙ্গী-টঙ্গী বাছাই করল না কেউ, যে যার নিজের গর্ত খুঁড়ছে। রানা অবশ্য একবার চেঁচিয়ে সবাইকে বলে দিল কাছাকাছি থাকতে, তবে নির্দেশটা কতটা কার্যকর হলো বোঝা গেল না, দক্ষিণ দিক থেকে ক্রমশ একটা শোঁ শোঁ শব্দ আসতে শুরু করেছে, আতঙ্কে অস্থির হয়ে আছে ওরা।

'দ্যাট্স্ ইট!' গালে বাতাসের সামান্য ছোঁয়া পেয়েই চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'সময় হয়ে গেছে, সবাই গর্তে ঢুকুন, এক্ষুনি!'

গর্তগুলো যথেষ্ট পরিমাণ গভীর হয়েছে কি না বোঝার উপায় নেই, গায়ের উপর চলে এসেছে পিটারাক, যে-কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে প্রবল আক্রোশে। গর্তে ঢুকে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা, বরফ খুঁড়তে খুঁড়তে দুহাত অসাড় হয়ে গেছে, গ্লাভ খুলে তালু দুটো ঘষতে থাকল ও। বিপদ হানা দিতে পারার আগেই আশ্রয় নিতে পারায় এক মুহূর্তের জন্য নিরাপদ বোধ করল, পরমুহূর্তেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল বাকিদের জন্য।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কেউ?' গলা উঁচিয়ে ডাকল রানা।

'হ্যাঁ,' লিয়ার গলা শোনা গেল, মনে হচ্ছে যেন বহুদূরে আছে,

যদিও দূরত্বটা কয়েক গজের বেশি হবার কথা নয়।

'কোথায় তুমি?'

'খুব কাছে, আমি তোমার আলো দেখতে পাচ্ছি।'

'তা হলে যদি পারো, চলে এসো এখানে। মাথা বের কোরো না, বরফের তলা দিয়ে যদি গর্ত করে আসতে পারো, তবে এসো।' বাকিদের উদ্দেশে গলা চড়াল এবার রানা। 'লাইটটা আমি জ্বেলে রাখছি, যারা পারবেন—আমার কাছে চলে আসুন। একসঙ্গে থাকতে পারলে সুবিধে হবে। খবরদার, বাইরে বেরুবেন না, এলে বরফের তলা দিয়ে আসুন।'

পরামর্শটা শুনে শেষ পর্যন্ত আসতে পারল শুধু লিয়া, মুরল্যান্ড আর জুরকিচ। ততক্ষণে কথা বলার আর উপায় নেই, যে যাকে পারল শক্ত করে ধরে রইল, কারণ ওদের মাথার কয়েক ফুট উপর দিয়ে শুরু হয়ে গেছে তাণ্ডব। উত্তরমুখী হয়ে উচ্চচাপের এলাকায় গত কয়েক ঘণ্টা ধরে যে লক্ষ লক্ষ টন বায়ু গিয়েছিল, তা এবার হিংস্র বাঘের মত ক্রোধ নিয়ে ছুটে এল দক্ষিণ দিকে, নিম্নচাপের ফলে শূন্য হয়ে যাওয়া জায়গাটা পূরণ করতে। প্রবাহটা নিস্তরঙ্গ-স্থির অবস্থা থেকে দমকা ঝোড়ো হাওয়ায় পরিণত হলো চোখের পলকে। এর অবিশ্বাস্য শক্তির কাছে হার মানল বছরের পর বছর জমে থাকা তুষার, উড়ে গিয়ে গ্রিনল্যান্ডের সত্যিকার পাথুরে সারফেস উন্মুক্ত করে দিল, গত কয়েক দশকে হয়তো আকাশের চেহারাই দেখেনি এই সারফেস। ভাগ্যিস রানারা পাহাড়ি ঢালের অপর পাশে রয়েছে, নইলে উড়ে যেত শুকনো পাতার মত।

তবে স্বস্তি বলতে ওটুকুই। তীক্ষ্ণ সুরের বাঁশির মত পিটারাকের গর্জন অভিযাত্রীদের স্নায়ুর উপর অসহ্য চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে, শান্তি পেতে দিচ্ছে না, আতঙ্কে অস্থির করে রাখছে। এই ভয়াবহ আওয়াজে কথা বলা সম্ভব নয়, শুধু একে অন্যকে স্পর্শ করেই সাহস জুগিয়ে যাচ্ছে। রানার একদম বুকের মধ্যে সেঁধিয়ে রয়েছে লিয়া, যেন প্রকৃতির নিদারুণ ক্রোধ ওর নাগাল পেয়ে গেলেও এই

দুর্ধর্ষ মানুষটা তাকে রক্ষা করবে। রানার সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে রয়েছে মুরল্যান্ড, জুরকিচকে ধরে রেখেছে সে। স্যাম, সিলভিয়া আর আরসেন কোথায় আছে কে জানে? তাদের জন্য দুশ্চিন্তা হলো রানার, ঠিকমত গর্তে ঢুকতে পেরেছিল তো ওরা?

যে প্রচণ্ড শক্তিতে ঝড়টা বয়ে চলেছে, তা কিছুতেই চিরস্থায়ী হতে পারে না। আর কথাটা প্রমাণ করার জন্যই যেন মিনিট দশেক পর কমে এল বাতাসের তোড়, সেই সঙ্গে উত্তাল গর্জনও যেন ম্লান হয়ে এল। রানা ধারণা করল, থেমে যাচ্ছে ঝড়টা—দীর্ঘ সময় টিকে থাকার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি ওটা। কিন্তু ধারণাটা যে কী বিরাট ভুল, তা কয়েক সেকেন্ড পরেই প্রমাণ হয়ে গেল।

কাঁপতে থাকা লিয়াকে সাহস দেয়ার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিল ও, ঠিক তক্ষুনি আঘাত হানল পিটারাকের মূল প্রবাহটা। বিস্ময়ে চোয়াল ঝুলে পড়ল রানার, দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেল। এতক্ষণ যা চলছিল, তা স্রেফ মূল পণ্যের একটা বিজ্ঞাপন ছিল যেন। এবার শুরু হলো আসল খেলা। নিজস্ব ওজনের কারণে বায়ুমণ্ডলের হাই-প্রেশার ফ্রন্ট ভেঙে পড়ল, পাত্র ভেঙে পানি যেমন চারপাশ সয়লাব করে দেয়, ঠিক সেভাবে ছুটে এল বাঁধ ভাঙা নদীর মত। এমন শক্তিমত্তা কল্পনাও করা যায় না—চলার পথে কোনও বাধা মানছে না এই বাতাস... সামনে যা পাচ্ছে সব দুমড়ে-মুচড়ে, ভেঙে-চুরে ছুটে আসছে অমোঘ নিয়তির মত, গতিবেগ পৌঁছে গেছে ঘণ্টায় দেড়শো মাইলে, প্রতি মুহূর্তে তা বাড়ছে আরও। এই অসহ্য অত্যাচারে জান্তব শব্দ তুলে ভাঙছে গ্লেসিয়ারের পাথরের মত শক্ত বরফের সারফেস, একেকটা টুকরো আর্টিলারি শেলের মত প্রচণ্ড বেগে ছিটকে যাচ্ছে। রানাদের রক্ষাকবচ হয়ে থাকা পাহাড়টার গায়ে এসব টুকরো এমনভাবে আঘাত করছে যেন কার্পেট-বম্বিং চলছে। সে এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতি... শরীরের নীচে বরফের কাঁপন অনুভব করে রানার মনে হলো ভূমিকম্প ঘটছে চারপাশে।

বাঁশির মত যে শব্দটা ওদের কাছে একটু আগে অসহ্য লাগছিল, এখন বোধহয় সেটা শোনার জন্য ওরা পয়সাও দিতে রাজি হবে—অন্তত এখনকার চেয়ে ভাল ছিল ওটা। চারপাশের নরক গুলজার কেউ চোখে দেখছে না বটে, কিন্তু সেটা মাথার ভিতর হাজারটা দামামার মত বেজে চলেছে অবিরাম, সারা দেহ ঝনঝন করছে। শব্দের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য দুহাতে কান চেপে ধরে রেখেছে সবাই, তাতেও বিশেষ লাভ হচ্ছে না।

এই অভিশাপ কোনও রকম বিরতি ছাড়া একটা ঘণ্টা পার করল... তারপর দুই... তারপর তিন। মাথার উপর এখনও ঝড়টা আগের মতই শক্তিশালী, যেন অন্যভুবন থেকে মর্ত্যে নেমে আসা কোনও নৃশংস পশু—রুদ্র ভঙ্গিতে গোঙাচ্ছে অনবরত, হার মানছে না। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিযাত্রীদলটার অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে, এভাবে যুদ্ধ করে কতক্ষণই বা আর টিকতে পারে নাজুক মানবশরীর! গর্তের ভিতর নড়াচড়ার কোনও উপায় নেই, ইতোমধ্যেই উপরে কয়েক ফুট তুষার জমে গেছে, শুধু সিলভার ব্ল্যাঙ্কেটে নিজেদের মুড়িয়ে রেখেছে বলে বাতাস চলাচলের সামান্য জায়গা আছে। রানা বুঝতে পারছে, বাতাসটা একবার দিক বদলে ওদের নাগাল পেলেই হয়—কেউ বুঝতেও পারবে না কিছু, খাবলা দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে সবাইকে, শেষ পর্যন্ত যখন মাটিতে নামিয়ে রেখে যাবে, তখন ওরা স্রেফ লাশ। মৃত্যুটা হবে খুব দ্রুত। পঞ্চম ঘণ্টায় এসেও যখন পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র উন্নতি হলো না, তখন সার্ভাইভালের সমস্ত ট্রেনিং উবে যেতে থাকল ওর মন থেকে, সে জায়গাটা দখল করল সহজাত হতাশা। সন্দেহ হতে থাকল—এই অসহ্য অত্যাচারের মধ্যে সবাইকে ফেলা ঠিক হলো কি না। এরচেয়ে ঝড়ের সামনে গিয়ে বুক পেতে দাঁড়ালেই হয়তো ভাল হতো, দ্রুত মৃত্যু এসে মুক্তি দিত ওদের, কষ্টটা কেউ টেরও পেত না। তবে ইন্সটিঙ্কট এসে মনে হানা দেয়ার একটা সুবিধেও পেল —বেঁচে থাকার আকুতি জেগে উঠল ভিতরে, হাল ছাড়তে দিল না

গত কষ্টের পরেও।

অবশেষে... ছ'ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার পর যেন আক্রোশে ভাটা পড়ল প্রকৃতির, ঝড়ের প্রকোপ কমে এল ধীরে ধীরে। বাতাসের গর্জন কমে আসতেই লিয়ার কণ্ঠ শুনতে পেল রানা, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে মেয়েটা, বোধহয় প্রার্থনা করছে। কথাগুলো বোঝা না গেলেও শোনা যে যাচ্ছে, সেটাই স্বস্তির ব্যাপার—মানেটা হলো, থেমে যাচ্ছে পিটারাক। ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বেলে বুক থেকে লিয়ার মাথাটা তুলে ধরল রানা, এক চিলতে আলোয় অপূর্ব লাগছে ওর সুনীল চোখদুটো। ভয়ার্ত হলে মেয়েদের নাকি আরও সুন্দর লাগে, লিয়ার চেহারা দেখে কথাটা বিশ্বাস করল ও।

একটু হাসল রানা, অভয়ের সুরে বলল, 'ঝড় থেমে যাচ্ছে।'

বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল লিয়া, এতক্ষণ শক্ত করে রানাকে আঁকড়ে ধরে থাকা হাতদুটোয় ঢিল দিল, তাতে সেটা একটা নরম আলিঙ্গনে পরিণত হলো। অন্যসময় হলে ব্যাপারটা উপভোগ্যই হতো রানার কাছে, কিন্তু এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। হাত বাড়িয়ে পিছনে পিঠ লাগিয়ে থাকা মুরল্যান্ডের বাহু ধরে চাপ দিল ও, সঙ্কেত দিচ্ছে।

'হুঁ, আমিও টের পেয়েছি,' বলল মুরল্যান্ড। 'বের হওয়া যাবে এখন? জুরকিচের জ্ঞান ফেরার পর আমি তার নাগালের মধ্যে থাকতে চাই না।'

'কেন, কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

'ওর যে ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে, জানতাম না। গর্তে ঢোকার পর প্রথমে চুপচাপই ছিল, পরে শুরু করল পাগলামি। বক্সিং মেরে ওকে বেহুঁশ করে রেখেছি।'

'বক্সিং মেরেছ!' রানা বিস্মিত।

'কেন, সিলভিয়ার কাছে শেখোনি?' হালকা সুরে বলল মুরল্যান্ড। 'পাগল ঠাণ্ডা করার উপায় তো একটাই।'

'হাত লাগাও, বেরুতে হবে এখান থেকে।'

তুষারে পুরো কবর হয়ে গেছে ওদের, দুই বন্ধু মিলে হাত দিয়েই তুষার সরাতে শুরু করল। কাজটা কষ্টের, গ্লাভ থাকার পরও হাত অসাড় হয়ে যাচ্ছে, ব্যথায় টনটন করছে আঙুলগুলো। তারপরও থামল না ওরা, কাজ করেই চলল।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সারফেসে উঠতে পারল ওরা, পুরো আট ফুট আস্তর ভেদ করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে। মুরল্যান্ড বলল, 'নিজেকে কেমন কেঁচোর মত লাগছে।'

'খোলা জায়গায় থাকতে হলে কেঁচোই হতে হবে আমাদের,' বলল রানা। 'নাহ্, এভাবে আর চলে না।'

লিয়াকে উঠতে সাহায্য করল ওরা, জুরকিচের জ্ঞান ফিরেছে, উঠিয়ে আনল তাকেও। পরের পনেরো মিনিটের মধ্যে সামান্য দূরের বরফ ভেদ করে হরর ছবির ভূতের মত সিলভিয়া আর স্যামকেও বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কিন্তু আহত কো-পাইলটের চিহ্ন নেই কোথাও।

'আরসেন কোথায়?' স্যামের কাছে জানতে চাইল রানা।

'জানি না,' বলল স্যাম। 'ঝড় শুরু হবার আগে আমি আর ববি তাকে গর্ত খুঁড়ে দিয়েছিলাম। ওখানেই তো থাকার কথা।' আঙুল তুলে দেখাতে গিয়ে থমকে গেল সে।

যেখানটায় কো-পাইলট আশ্রয় নিয়েছিল, সে জায়গাটায় কীভাবে যেন একবার কামড় বসাতে পেরেছিল দুরন্ত বাতাস, বিশাল এক খাবলা মেরে তুলে নিয়ে গেছে অনেকখানি তুষার, এখন সেখানে স্রেফ একটা গহ্বর।

'ছড়িয়ে পড়ুন সবাই,' নির্দেশ দিল রানা। 'বেচারা আশপাশে আহত হয়ে পড়ে থাকতে পারে, খুঁজে বের করতে হবে।' আরসেনের কপালে কী ঘটেছে, তাতে সন্দেহ নেই ওর মনে, তারপরও এখুনি সেটা সবাইকে বলে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়ার কোনও মানে হয় না। বরং কাজের মধ্যে থাকলে এলোমেলো চিন্তা করতে পারবে না, শরীরের আড়ষ্টতাও কাটবে।

আকাশে আবার মেঘ করেছে, ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ, মেরুজ্যোতিও অদৃশ্য। ম্লান একটা আলো রয়েছে শুধু, বিনকিউলার তুলে এর মধ্য দিয়েই চারপাশটা জরিপ করল রানা। ভয়ঙ্কর একটা পিটারাক বয়ে গেছে, তারপরও গ্রিনল্যান্ডের চিরাচরিত দৃশ্যের কোনও পরিবর্তন হয়নি। তুষার সরিয়ে নগ্ন জমি বেরিয়েছিল অল্প একটু সময়ের জন্য, যাবার পথে আবার সেটাকে নতুন তুষার ঢেলে ঢেকে দিয়ে গেছে ঝড়টা। দেখে বোঝারই উপায়ই নেই কত বড় তাণ্ডব ঘটে গেছে কিছুক্ষণ আগে।

দক্ষিণদিকে নজর দিল রানা, ওরা যে পাহাড়টার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছিল একটু দূরে তেমনই আরেকটা পাহাড় দেখা যাচ্ছে, বায়ুমুখী ঢালটার তুষার সরে গিয়ে মুখ ব্যাদান করে আছে নগ্ন পাথর। আলো-আঁধারিতে এরচেয়ে বেশি কিছু বোঝা সম্ভব হলো না। যেসব গিয়ার আর লজিস্টিকস্ বাঁচানো গেছে, সেগুলো একত্র করার দায়িত্ব মুরল্যান্ডকে দিয়ে দ্বিতীয় পাহাড়টার দিকে রওনা হলো ও, মিনিট বিশেকের মধ্যে পৌঁছে গেল গন্তব্যে। ঢালের উপর পাওয়া গেল আরসেনের দেহাবশেষ। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য, দেখলে গা শিউরে ওঠে। ঝোড়ো বাতাসে উড়ে যেতে যেতে এখানে এসে আছড়ে পড়েছে সে—দেহ থেঁতলে গেছে, খুলিও ফেটে গেছে নারকেলের মত। তারপরও রেহাই দেয়নি নির্মম প্রকৃতি, অসম্ভব গতিতে ক্রমাগত বয়ে যাওয়া হিমবাতাস শিরিষ কাগজের মত ঘষে গোটা শরীর থেকে তুলে নিয়ে গেছে জামা-কাপড় আর চামড়া। স্রেফ একটা জমাট বাঁধা রক্তাক্ত মাংসপিণ্ডের তালে পরিণত হয়েছে হতভাগ্য মানুষটা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাশটা তুলে ঢালের গোড়ায় নিয়ে এল রানা, খুঁজে-পেতে একটা খাঁজ বের করে নামিয়ে রাখল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওটা ঢেকে যাবে তুষারে, কবর হয়ে যাবে। যা করার একাই করল ও—লাশটার ভয়াবহ চেহারা দেখিয়ে দলের অবশিষ্ট মনোবলটুকু ধ্বংস করে দেয়ার কোনও মানে হয় না।

চুপচাপ বাকিদের কাছে ফিরে এল ও, নরম সুরে আরসেনের মৃত্যুসংবাদ দিল। খবরটা শুনে সবারই মন খারাপ হয়ে গেছে, লক্ষ করল। মুরল্যান্ড হৈ-হল্লা করে খানিক পরেই সবাইকে হাসাতে শুরু করায় পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এল।

বড় একটা খোঁড়ল তৈরি করে গতদিনের মত বাকি রাতটা কাটিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। গর্তে ঢুকে রানার বুকে মাথা রেখে মাথা রেখে লিয়া এমনভাবে শুলো, যেন সেটাই স্বাভাবিক।

'কী ব্যাপার, কী ভাবছ এত?' রানা চুপ করে আছে দেখে জানতে চাইল ও।

'কিছু না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'বেচারা আরসেন... ও যে অসুস্থ, তা তো জানতামই। কাছে না রেখে আমিই ভুল করেছি...'

'শুধু শুধু নিজেকে দোষারোপ কোরো না, রানা। তুমি একা একটা মানুষ কতদিক দেখবে? আরসেনের জন্য তোমার কিছুই করার ছিল না। আমরা বাকি পাঁচটা মানুষ যে তোমার কারণে এত বড় একটা বিপদের পরও বেঁচে গেলাম—সেটা কি কম কথা?'

'জানি, কিন্তু মন মানছে না...'

'চুপ, এ বিষয়ে আর কথা নয়। চোখ বোজো তুমি, আমি চুলে বিলি কেটে দিচ্ছি।'

লিয়ার কোমল হাতের ছোঁয়ায় সত্যিই দুশ্চিন্তা হারিয়ে গেল রানার ভিতর থেকে, ঘুম এসে গেল। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সে রাতে চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখল ও।

ভোরে যাত্রা শুরুর আগে সবার চেহারা দেখে স্বস্তি পেল রানা। আরসেনের মৃত্যুশোক কাটিয়ে উঠেছে সহযাত্রীরা। কাল রাতের ভয়ঙ্কর পিটারাকে একটা কাজের কাজ হয়েছে—এত বড় একটা দুর্যোগ পেরিয়ে টিকে থাকতে পারায় আত্মবিশ্বাস ফিরে এসেছে সবার। ওরা জানে, উত্তর মেরুর সবচেয়ে খারাপ রূপটা দেখে ফেলেছে। ওটায় যখন কিছু হয়নি, তারমানে আর কোনও ভয় নেই

প্রকৃতিকে। আর মাত্র বারো মাইল দূরে গন্তব্য, সেখানে পৌঁছুতে পারবে বলে নিশ্চিত সবাই।

রওনা হবার ঠিক আগে রানাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল স্যাম। লজ্জিত গলায় জানাল, 'স্যাটেলাইট ফোনটা হারিয়ে ফেলেছি আমি। ঝড় আসার ঠিক আগের মুহূর্তে উঁচু করে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় কি না, সে-চেষ্টা করছিলাম। আচমকা বাতাস এসে উড়িয়ে কোন্‌দিকে নিয়ে গেল, বুঝতে পারিনি।'

ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদটা শুনে অধিক শোকে পাথর হয়ে গেল রানা। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না, বলাবলিতে লাভও হবে না; বদলাবে না পরিস্থিতি। যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যমটা খুইয়েছে ওরা। যে সমস্যাগুলো সামনে অপেক্ষা করছে, তা একলাফে দ্বিগুণ গুরুতর হয়ে উঠল। ফ্রেডারিখ কার্নকে ফাঁকি দিয়ে প্যান্ডোরা গুহায় বসে থাকলেই শুধু চলবে না এখন, লোকটা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবার পর ওদেরকেও আবার দীর্ঘ পথ হেঁটে সভ্যজগতে ফেরার একটা ব্যবস্থাও করতে হবে।

চুপচাপ আবার পথে নামল ওরা। কম্পাস হাতে লিয়া আবার নেভিগেটরের দায়িত্বে ফিরে গেছে, রানা-মুরল্যান্ড আর স্যাম পালা করে পালন করছে গাইডের দায়িত্ব। তাপমাত্রা আজ আরও কমে গেছে, শ্বাস নেয়ার জন্য বাতাস টানতেই মনে হচ্ছে অ্যাসিড ঢুকছে নাক দিয়ে, জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে ফুসফুস। কিছুক্ষণ পর পর নাক দিয়ে রক্ত পড়তে থাকল সবার, ভিতরে কোষগুলো ঠাণ্ডার কারণে জমে যাচ্ছে। বাঁচার জন্য স্কার্ফ জড়িয়েও লাভ হলো না, সেগুলো জমাট বরফের টুকরোতে পরিণত হয়েছে, ফাঁকফোকর নেই যে বাতাস চলাচল করবে। চরম কষ্ট সইতে হলো ওদের। দুপুরে লাঞ্চের সময় গজ গজ করে মুরল্যান্ড বলল, 'সারা বছর পরিবেশবাদীদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং-গ্লোবাল ওয়ার্মিং চিৎকার শুনে কান ঝালাপালা... এখন দরকারের সময় গেল কোথায় জিনিসটা?'

পথের অবস্থা অবশ্য ভাল হয়ে এসেছে, অসুস্থ কো-পাইলটকে

আর টানতে হচ্ছে না বলে চলার গতিও বেড়ে গেল। তবে ঠাণ্ডাটাই সবচেয়ে বেশি অসুবিধে সৃষ্টি করল। কাপড়ের ফাঁকফোকর খুঁজে সিঁদেল চোরের মত প্রায়ই হানা দিচ্ছে, বার বার ঠিক করে নিতে হচ্ছে নিজেদের গিয়ার।

চারটে নাগাদ হিসেব করে রানা জানাল, এয়ার শাফটের আধ মাইল দূরে চলে এসেছে ওরা। শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠল বাকিরা, গন্তব্য এত কাছে এসে গেছে শুনে চলার গতি বেড়ে গেছে তাদের।

একটু থেমে বিনকিউলারে সামনেটা দেখে নিল রানা। পর্বতমালায় বেষ্টন করা একটা খাঁড়ি দেখা যাচ্ছে—একেকটা চূড়ো হাজার ফুট উঁচু, শরীরে অংসখ্য নির্মম দাগ... যুগ-যুগান্তর ধরে গ্লেশিয়াল মুভমেন্টের ক্ষতচিহ্ন ওগুলো। সেবাস্টিয়ান গ্রাবের জার্নালে লোকেশনটার যে বর্ণনা আছে, তার সঙ্গে মিল পাওয়া যাচ্ছে জায়গাটার—পাহাড়গুলোর তলাতেই থাকার কথা গুহাটার, এয়ারশাফটটাও তার মানে সামনেই কোথাও আছে।

সন্তুষ্টচিত্তে পা বাড়াতে গিয়েই থমকে গেল ও, এক মুহূর্ত শুধু অপেক্ষা করল নিশ্চিত হতে, তারপর ডাইভ দিল মাটিতে। 'সবাই শুয়ে পড়ুন, কুইক!'

কেউ কোনও প্রশ্ন করল না, গত কয়েকদিনে নেতার উপর অবিচল আস্থা এসে গেছে দলের প্রতিটা সদস্যের। নির্দেশটা পেতেই যা দেরি, বিনা বাক্যব্যয়ে বরফের উপর শুয়ে পড়ল সবাই। অবশ্য কয়েক সেকেন্ডের ভিতরই কেন কাজটা করতে বলা হয়েছে, তা বোঝা গেল।

মেঘ আবার কেটে গেছে, বিকেলের পরিষ্কার আকাশ ঝলমল করছে মাথার উপরে, আর সেই পটভূমিতে পরিষ্কার দেখা গেল রোটরস্ট্যাটটাকে—উত্তরদিকে যাচ্ছে, টারবাইনের গুমগুম শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ের ঢালে বাড়ি খেয়ে। বেশ বড় দেখাচ্ছে ওটাকে—দূরত্বটা পাঁচ মাইলের বেশি হবে না।

রানা ব্যস্ত তুষার দিয়ে শরীর ঢেকে ফেলতে, বাকিদেরও তা-ই

করার নির্দেশ দিল। শুভ্র পটভূমিতে ওদের কমলা আর্কটিক গিয়ার আর কালচে বোঝাগুলো অনেক দূর থেকে দেখা যাবে। বুক রীতিমত ধুকপুক করছে ওর, শত্রুরা ওদের অস্তিত্ব টের পেয়ে গেছে কি না কে জানে। ইচ্ছে হলো বিনকিউলারটা চোখে লাগিয়ে প্রতিপক্ষ কী করছে দেখে, কিন্তু কাজটা উচিত হবে না। এখনও যদি দলটাকে ওরা না দেখে থাকে, লেন্সে আলোর প্রতিফলন ঘটলে দেখতে দেরি হবে না।

এয়ারশিপটা দৃষ্টিসীমা থেকে মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত বরফের গায়ে ছ'টা অনড় ঢিবি হয়ে পড়ে রইল অভিযাত্রীরা। রোটরের শব্দটাও মিলিয়ে গেল খানিক পরে। সোজা হয়ে উঠে বসল রানা, ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসি। শুধু ধরা না পড়বার আনন্দে নয়, সেই সঙ্গে এটাও বুঝতে পেরে যে, ফ্রেডারিখ কার্ন এয়ারশাফটটার খোঁজ পায়নি। এয়ারশিপটা পর্বতমালা ছাড়িয়ে চলে গেছে আরও সামনে; তার মানে সার্চ এরিয়াটাও ভুল বেছেছে লোকটা।

'ব্যাটারা এখনও ক্যাম্পটা শিফট করে সারতে পারেনি,' এয়ারশিপটা এখনও মালামাল আনা-নেয়া করছে দেখে মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'খারাপ আবহাওয়াটা খালি আমাদের নয়, ওদেরও অসুবিধে করেছে।'

'কতটা সময় পাবো আমরা?' শরীর থেকে তুষার ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করল লিয়া।

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'খুব বেশি পাবো বলে মনে হয় না।'

'কমপক্ষে তিনটে স্নো-ক্যাট আর একটা বিল্ডিং লাগবে ওদের,' বলল মুরল্যান্ড। 'এসো, হিসেব করে ফেলি। চারটে রাউন্ড ট্রিপ... একেকটায় যদি ছ'ঘণ্টা করে লাগে, সাথে লোডিঙের জন্য বাড়তি এক ঘণ্টা... হুঁ, চব্বিশ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় পাবো আমরা।'

'যদি ওরা পিটারাকের আগেই অর্ধেক মালামাল শিফট করে না

থাকে,' শুধরে দিল রানা।

তাড়াটা বুঝতে পারছে সবাই, ওকে আর ভেঙে বলে দিতে হলো না। গন্তব্যের দিকে দ্রুত পা চালাল রানা, দুর্বল-আহত সঙ্গীদের আর দয়া দেখাচ্ছে না। হাঁটু পর্যন্ত তুষার মাড়িয়ে চলতে চলতে পা ব্যথা করতে শুরু করল সবার, কিন্তু গন্তব্যের এত কাছে এসে সেটাকে আর পাত্তা দিল না কেউ। লক্ষ্য—খাঁড়ির সামনে মুক্তোর দানার মত বিছিয়ে থাকা পাহাড়গুলো। চোখ-কান খোলা রাখছে প্রত্যেকে—রোটরস্ট্যাটটা ফিরে আসে কি না।

কাছাকাছি পৌঁছুতেই রানার মুখে হাসি ফুটল। 'লিয়া, ম্যাপটা তোমাকে দিয়েছিলাম না? বের করো ওটা।'

'করেছি।'

'দেখো তো, ক্রস চিহ্নটার উপরে কী আঁকা আছে।'

'একটা মুখের আউটলাইন... লম্বা নাকঅলা।'

আঙুল তুলল রানা। 'ডানের ওই পাহাড়টার মত?'

সেদিকে তাকিয়েই চোয়াল ঝুলে পড়ল লিয়ার। প্রকৃতির অত্যাচারে পাহাড়ের একটা পাশ ভেঙেচুরে সত্যি সত্যি একটা মানুষের মুখের আকৃতি পেয়েছে—ঠোঁটের জায়গাটা যদিও ঠোঁট মনে হয় না, তারপরও নাকটা বিস্ময়করভাবে নিখুঁত... ঠিক ছবিটার মত।

'মাই গড!' ফিসফিসাল ও।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওটাই আমাদের মার্কিং। ম্যাপে ছবিটা দেখে শুরুতে আমি বুঝতে পারিনি। এখন পরিষ্কার—যুদ্ধবন্দি লোকটা কেন ওটা এঁকেছিল।'

'ওখানেই আমাদের এয়ারশাফটটা?'

'খুব শীঘ্রিই জানতে পারব।'

পা বাড়ানোর আগে ব্যাকপ্যাক থেকে গাইগার কাউন্টারটা বের করল রানা। যন্ত্রটা চালু করে তারপর চলতে শুরু করল, তীক্ষ্ণ নজর রাখছে ডিসপ্লের উপর। ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন ছাড়া আর

কোনও কিছুর অস্তিত্ব দেখাচ্ছে না ওটা।

পাহাড়টার খাড়া ঢালের একশো গজে পৌঁছুতেই আচমকা টিক টিক শব্দটা বেড়ে গেল কাউন্টারে। হাত তুলে সবাইকে থামতে ইশারা করল রানা, রীডিংটা কতদূর ওঠে নিশ্চিত হতে চায়। কিছুক্ষণ পরেই একটা লেভেলে গিয়ে স্থির হলো কাঁটা, সেটা সি-নাইন্টি সেভেনে পাওয়া মাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি, তারপরও ঠিক বিপজ্জনক বলা চলে না। এক-দুই সপ্তাহ এটুকু রেডিয়েশনের সামনে উন্মুক্ত থাকা যায়।

সবাইকে কথাটা জানিয়ে আবার পা বাড়াল রানা। মাথায় চিন্তার ঝড়। সবাইকে যতই অভয় দিক, রেডিয়েশনের চিন্তাটা মন থেকে একবারও মুছে যায়নি ওর। ফ্রেডারিখ কার্ন আর তার খুনে বাহিনীর চেয়েও ভয়ঙ্কর শত্রু ওটা। লোকগুলোকে ধরা যায়, ছোঁয়া যায়; লড়াই করে আত্মরক্ষারও একটা সুযোগ থাকে। কিন্তু তেজস্ক্রিয়তার মত একটা অদৃশ্য প্রতিপক্ষের সামনে ওরা সত্যিই অসহায়, ওটাকে ঠেকাবার মত কিছুই নেই ওদের কাছে।

পাহাড়ের গোড়ায় এসে তুষারের পরিমাণ যদিও গোড়ালি পর্যন্ত কমে গেছে, তারপরও সাবধানে হাঁটল ও। জানার উপায় নেই, তিপান্ন সালে সি-নাইন্টি সেভেনের তল্লাশিতে এসে এলমার গুডজনসেন এই জায়গাটার কতটা কাছ দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল। খুব কাছেই হবে, নইলে রেডিয়েশনে এত দ্রুত মারা যেত না সে। তেমন কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না রানা। হতে পারে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু মহাশূন্য থেকে এসে পড়া অচেনা পদার্থটার হাফ-লাইফ বা ডিসিপিটেশন রেট সম্পর্কে কোনও তথ্যই নেই ওদের কাছে। ওটা যে এত বছর পরও মারাত্মক রেডিয়েশন ছড়াচ্ছে না, তার গ্যারান্টি কী? ডিসপ্লের দিকে তাকাতে তাকাতে যেভাবে এগোচ্ছে, রানার হঠাৎ মনে হলো একটা মাইনফিল্ড অতিক্রম করছে ওরা।

টিক। টিক। টিক। টিক। টিক।

গাইগার কাউন্টারের উপর আঠার মত সেঁটে আছে রানার চোখ। পঁচিশ আর.এ.ডি. বা রেডিয়েশন অ্যাবজর্বশন ডোজ পরিমাপ দেখাচ্ছে যন্ত্রটা, রেডিয়েশন পয়েজনিঙের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার চারভাগের এক ভাগ এটা। তবে এর মাত্র আট ভাগ সাধারণ পরিবেশে একটা মানুষ সারা বছরে নিজের শরীরে শোষণ করে। আপাতত মাত্রাটা নিরাপদ যদিও, লম্বা সময় এর সামনে উন্মুক্ত থাকলে ভবিষ্যৎ জীবনে ক্যান্সারের ঝুঁকি আছে।

আর মাত্র দশ গজ দূরে পাহাড়ের শরীর। এখন পর্যন্ত রেডিয়েশনের কোনও উৎস চোখে পড়েনি ওদের, দেখতে পায়নি উল্কাপাতের কোনও চিহ্ন বা শাফট খুঁড়ে তুলে আনা পাথরের স্তূপ বা অন্য কিছু। পায়ের কাছে তুষার কমে এসেছে আরও, রানার মনে পড়ল জুরকিচের কথা—উল্কার খণ্ডগুলো থেকে তাপ বিকিরণ হয়। সে কারণেই কি বরফ গলে গেছে? যদি তা-ই হয়, ওরা তো জায়গামত পৌঁছে গেছে, হতচ্ছাড়া শাফটটা গেল কোথায়?

ঠিক তক্ষুণি ঘটল ঘটনাটা।

কোনও রকম পূর্বসঙ্কেত দেয়া ছাড়াই পায়ের নীচ থেকে সরে গেল বরফ। কিছু বুঝে উঠতে পারল না রানা, ব্যালেন্স হারিয়ে তলিয়ে গেল, সোজা গিয়ে দশ ফুট নীচে আছড়ে পড়ল পিঠ দিয়ে। পতনের ধাক্কায় হুঁক করে বুক থেকে বেরিয়ে গেল সব বাতাস, কয়েক মুহূর্ত নিস্তেজভাবে পড়ে রইল ও।

'রানা! রানা!! লাগেনি তো?' মুরল্যান্ডের উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ভেসে এল উপর থেকে।

নড়ল রানা। গলা উঁচু করে বলল, 'না। একটু।'

'কোথায় গিয়ে পড়লে?'

'জায়গামতই। দাঁড়াও একটু, আগে চারপাশটা দেখে নিই।'

সোজা হয়ে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালল রানা। ছোট্ট একটা গুহায় এসে পড়েছে ও, অ্যান্টিচেম্বারের মত গুহাটা। এয়ারশ্যাফটের আট ফুট উঁচু ঢালু টানেলটা একপাশের দেয়াল থেকে শুরু হয়েছে, এটা

বোধহয় স্টেজিং এরিয়া ছিল। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা, সমতল অ্যান্টিচেম্বারটা না থাকলে সোজা ঢালু টানেলে গিয়ে পড়ত ও, গড়িয়ে সোজা চলে যেত একেবারে এক হাজার ফুট নীচে—হাড়গোড় একটাও আস্ত থাকত না আর। আলোটা ঘোরাল ও, সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল শীতল স্রোত।

একটা লাশ।

বিশ্রীভাবে পচে গেছে ওটা, জমেনি। শরীরে লেগে থাকা বিবর্ণ ইউনিফর্মটা বোঝা যায় এখনও—ছাই রঙের ছিল ওটা, বোতামগুলো পিতলের তৈরি, লাল পাইপিং আর বুকের মেডালগুলো আছে আজও। ইনসিগনিয়াটা চিনতে পারল রানা—জার্মান ক্রেইগস্‌মেরিন বা ইউ-বোট সার্ভিসের একজন নাবিক ছিল লোকটা। জুরকিচ যা বলেছে, তার এরচেয়ে অকাট্য প্রমাণ আর হয় না। তবে রানা চমকে উঠল অন্য একটা জিনিস দেখে।

দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসা মৃতদেহটার পাশে পড়ে আছে দুই ফুট দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতার একটা বর্গাকৃতি বাক্স, সম্পূর্ণ সোনায় তৈরি, উপরে ঈগলের থাবায় স্বস্তিকাসহ থার্ড রাইখের মনোগ্রাম।

'সান অভ আ বিচ!' তিক্ত গলায় বলল রানা, নাৎসিদের রসিকতাটা ধরতে পারছে। প্রজেক্টের নাম প্যান্ডোরা রাখার কারণ ওরা প্যান্ডোরার বাক্সই বানাতে যাচ্ছিল, গ্রীক পুরাণের সেই গল্পটার মত। সোনার তৈরি এই বাক্সগুলোর ভিতর সত্যিই লুকোতে যাচ্ছিল ওরা এমন জিনিস, ডালা খুললে যা ছড়িয়ে দেবে মৃত্যু আর ধ্বংস।

'আসব আমরা?' মুরল্যান্ড জানতে চাইল।

'আর একটু...'

গাইগার কাউন্টারটা বন্ধ হয়ে গেছে হাত থেকে পড়ে, আবার সেটা অন করল রানা। স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করল, এখনও আগের রীডিংই দেখাচ্ছে ওটা। যন্ত্রটা প্রথমে বাক্সটার সামনে ধরল ও,

তারপর লাশটার সামনে—ফলাফলটা হলো অবাক করার মত। রেডিয়েশন ছড়াচ্ছে মৃতদেহ থেকে, বাক্স থেকে নয়। ক্যাম্প ডিকেডের লাশটার চেয়ে অনেক বেশি রেডিয়েশন দেখাচ্ছে এটা, তার মানে শ্রমিকের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার শিকার হয়েছিল নাবিক লোকটা, পঞ্চাশ বছরের কুলিং রেট হিসেবে ধরলে মনে হচ্ছে—তাৎক্ষণিকভাবে মরার মতই একটা মাত্রা ছিল সেটা।

কিছু একটা গোলমাল আছে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে। এলমার গুডজনসেন আর স্ট্র্যাটোফ্রেইটারটার ক্রু'দের মৃত্যু ঠিক মিলছে না এর সঙ্গে। প্রথমজন মরেছিল কয়েক সপ্তাহ পরে, বাকিরা তাৎক্ষণিকভাবে। অল্প সময়ের ব্যবধানে দুই রকম মাত্রার রেডিয়েশন ঘটল কীভাবে?

ভাল করে ভাবল রানা, একটাই সম্ভাবনা মাথায় এল ওর। স্যাটানস্ ফিস্ট ভর্তি বাক্সটার ঢাকনা খুলে ফেলেছিল নাবিক, বিমানটা যখন কাছাকাছি ছিল। তাতেই সে-সহ পাইলট আর ক্রু-রা মারা গেছে। এলমার শিকার হয়েছিল ক্র্যাশ করা সি-নাইন্টি সেভেন বা এই নাবিকের লাশের রেডিডিউয়াল রেডিয়েশনের—পুরো ব্যাপারটার ব্যাখ্যা এটাই।

কিন্তু তারপরও হিসেব মেলে না। বরফের মধ্যে দশ বছর বেঁচে থাকার পর আত্মহত্যা করতে গেল কেন এই নাবিক? পাগলামি ভর করেছিল মাথায়? নাকি অন্য কিছু?

লাশটাকে ঠেলে এক কোণে নিয়ে গেল রানা, চাপ দিয়ে হাড়গোড়গুলো জয়েন্ট থেকে ছাড়িয়ে ছোট একটা কুণ্ডলীর মত করল, সামনে নিয়ে রাখল সোনার বাক্সটা। এবার গাইগার কাউন্টারে আবার রেডিয়েশন মাপল ও—হ্যাঁ, কাজে লেগেছে বুদ্ধিটা। ছোটখাট একটা ড্যাম্পেনিং ফিল্ড তৈরি করা গেছে।

বাক্সটা ধরতেই উত্তাপ অনুভব করেছে ও, এবার আবার চেক করল। হ্যাঁ, সত্যিই গরম। এই উত্তাপই অ্যান্টিচেম্বারের মুখের

কাছে কোনও বরফ জমে থাকতে দিচ্ছে না, ভিতরে যদি পড়েও, সেগুলো গলিয়ে ফেলছে। পঞ্চাশ বছর পার হবার পরেও কেন টানেলটা তুষারে বন্ধ হয়ে যায়নি এটা তারই ব্যাখ্যা। উপরের পাতলা বরফের আবরণটা তাপমাত্রার সূক্ষ্ম একটা ব্যালেন্স রেখে চেম্বারের ছাদ হিসেবে কাজ করছিল, রানার ওজনে ভেঙে পড়েছে। একটু চিন্তিত হলো ও, মুখটা যে ঢেকে দেবে ভেবেছিল, এই বাক্সটার কারণে তো তুষার টিকেই থাকতে পারবে না, গলে যাবে। সঙ্গে আনা থারমাল ব্ল্যাঙ্কেট দিয়ে লাশ আর বাক্সটা ঢেকে দিল রানা, সঙ্গীদের গুলোও লাগবে। তা হলে যদি ঠেকানো যায় উত্তাপটা!

'করছটা কী নীচে?' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যান্ড। 'বেহেশতি বাগান-টাগান খুঁজে পেয়েছ নাকি? এত সময় লাগছে কেন?'

হাসল রানা। 'বেহেশত নাকি জাহান্নাম, এলেই দেখতে পাবে।'

'কেন যেন মনে হচ্ছে, তুমি একটা দুঃসংবাদ দেবে।'

'আগে দড়ি ফেলো একটা, আমাকে উঠতে হবে।'

'জাস্ট আ মিনিট।'

একটু পরেই নেমে এল দড়ির ফাঁস, কাঁধ গলিয়ে বগলের নীচে আটকাতেই রানাকে টেনে তুলল বাকিরা।

'কী দেখলে নীচে?' জানতে চাইল লিয়া।

'একটা অ্যান্টিচেম্বার—টানেলে ঢোকার জন্য।'

'শাফটটা পরিষ্কার আছে?' জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড। 'তুষার-টুষারে বন্ধ হয়ে যায়নি তো?'

'উঁহুঁ, একদম খালি।' বলল রানা। 'খুবই বন্ধুবৎসল পরিবেশ বলতে পারো, আমাদের জন্য এক সদস্যের একটা অভ্যর্থনা কমিটিও আছে, জুয়েলারি বক্সসহ।'

'অ্যাঁ!'

লাশটার কথা খুলে বলল রানা।

'রেডিয়েশনের ভিতর দিয়ে যাওয়া নিরাপদ হবে তো?' সংশয় প্রকাশ করল স্যাম।

'মনে তো হয়,' জানাল রানা, কী করে এসেছে সেটা বলল।

'তা হলে আর উঠে এলে কেন?' প্রশ্ন করল লিয়া। 'আমরা নেমেই যেতাম।'

'প্রবেশপথটা লুকিয়ে ফেলতে হবে, ভুলে গেছ? এভরিওয়ান, আশপাশ থেকে তুষার আনতে শুরু করুন, মুখটার কাছে জড়ো করতে হবে।'

মিনিট বিশেক লাগল কাজটা সারতে। যথেষ্ট পরিমাণ তুষার জোগাড় হলে একখণ্ড কাপড়ে সব রাখল ওরা, একে একে সবাই নেমে গেল চেম্বারে, শেষে রানা ফোকরে শরীর গলিয়ে তুষারসহ কাপড়টা টেনে ঢেকে দিল ছিদ্রটা। বাইরে যে তাপমাত্রা, তাতে শীঘ্রি তুষারগুলো বরফের চাঁইয়ে পরিণত হবে, ফ্রেডারিখ কার্নের জন্য সহজ হবে না মুখটা খুঁজে বের করা। ইতোমধ্যে লাশ আর সোনার বাক্সটা আরও কয়েকটা থারমাল ব্ল্যাঙ্কেটে মুড়ে ফেলা হয়েছে। আশা করা যায় তাপ আটকে রাখবে ওটা, উপরের বরফ গলিয়ে ফেলবে না।

ইতোমধ্যে ফ্ল্যাশলাইট জ্বালানো হয়েছে, টানেলের ভিতর দিয়ে গ্লেসিয়ারের অসীম অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে রশ্মি। মুখটায় দাঁড়িয়ে রানা বলল, 'সবাই রেডি?'

'আমার কেন জানি ভয় ভয় লাগছে,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল স্যাম।

হাসল রানা। 'স্বাভাবিক। নাৎসিদের তৈরি ওভারসাইজ একটা সুয়ারেজ পাইপের ভিতর দিয়ে রেডিয়েশনের আশঙ্কাঅলা পাতালের একটা অজানা-অচেনা-অন্ধকার গুহায় নামতে যাচ্ছি আমরা... এ অবস্থায় কে না ভয় পাবে?'

কাঁধ ঝাঁকাল স্যাম।

রানা বলল, 'দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই। কী আছে

কপালে—সময়ই বলে দেবে।'

অন্ধকার টানেলে পা বাড়াল ওরা।

Scanned by roni060007

এগারো

হ্যামবার্গ, জার্মানি। স্যাকলিচ এজি'র হেডকোয়ার্টার।

ক্লাউস ওবারব্যাচের করা প্রশ্নটার জবাব দেয়ার আগে সামান্য সময় নিল ইয়োহান শ্নাইডার। আঙুলের ভাঁজে আঙুল, টেবিলের উপর দুই কনুই, এতক্ষণ চিবুকটা রাখা ছিল জোড়া মুঠির উপর; এবার আঙুলের ভাঁজ খুলে দু'হাত মেলে দিল ডেস্কের উপর। সামনে ঝুঁকে এসে শান্ত গলায় বলল, 'না!'

বিরক্তি ফুটল চিফ লিগাল কাউন্সেলের চেহারায়। 'না বলতে কী বোঝাচ্ছেন? রিকনসিলিয়েশন কমিশনের দাবি করা দুশো পঁচিশ মিলিয়ন মার্ক দেবেন না, নাকি আগে নেয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে দুশো মিলিয়নের পাল্টা প্রস্তাব দেবেন না, যা চাইছে তা-ই দিয়ে দেবেন?'

'কোনওটাই না,' বলল ইয়োহান, ওবারব্যাচের কপালের পাশে তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে থাকা রগটা দেখতে মজাই লাগছে তার, এক্ষুনি লোকটার ব্রেন স্ট্রোক করার মত অবস্থা হবে। 'ওদেরকে গিয়ে বলুন, অ্যামাউন্টটা একশো পঁচাত্তর মিলিয়ন হলে আমরা প্রস্তাবটা বিবেচনা করতে রাজি আছি।'

ফলাফলটা যেমন আশা করেছিল ঠিক তেমনই হলো, চেয়ার থেকে পড়ে যাবার অবস্থা হলো ওবারব্যাচের। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বলছেন এসব?'

'ঠিকমত শুনতে পাননি? এ-ক-শো পঁ-চা-ত্-ত-র মি-লি-য়-ন!

তার বেশি এক পয়সাও নয়।'

'গড ড্যাম ইট, ইয়োহান!' রাগ লুকানোর কোনও চেষ্টাই করল না ওবারব্যাচ, সম্বোধনও পাল্টে গেছে, রাগের ঠেলায় তার তুলনায় অনেক কম বয়েসী প্রেসিডেন্টকে নাম ধরে ডাকছে, ঠিক যেমন আগে ডাকত। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? বোর্ড মিটিঙে আমরা সবাই বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি—দুশো মিলিয়ন দিয়ে পার পেলে সেটা আমাদের চরম সৌভাগ্য বলতে হবে! কেন শুধু শুধু নেগোসিয়েশনটাকে টেনে টেনে আরও লম্বা করা?'

'শেয়ারহোল্ডারদের কাছে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে,' প্রতিক্রিয়াহীনভাবে বলল ইয়োহান। 'সেটা হলো, যত কম সম্ভব খরচ করা।'

'আর নৈতিক দায় বলে কিছু নেই?' তীক্ষ্ণ গলায় প্রশ্ন করল ক্যাটালিনা সনেনহফ—ওবারব্যাচের ডেপুটি কাউন্সেল, ঠিক পাশেই বসে আছে সে।

'নীতি কপচানোর জন্য ওরা আমাদের কোম্পানিতে টাকা লগ্নি করে না,' গরম গলায় জানাল ইয়োহান, মেয়েটার প্রশ্নটা তার ভাল লাগেনি। 'বিবেক-টিবেকের কথা বলে লাভ নেই, এটা আমার ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত।'

'এই সিদ্ধান্ত আমাদের খরচ কোনও অংশে কমাচ্ছে না, বরং বাড়াচ্ছে,' বলল ক্যাটালিনা। 'মার্কেটিং আর বিজ্ঞাপনে আমরা আজ পর্যন্ত যত বাড়তি টাকা ঢেলেছি, তার কোনও ইতিবাচক ফল এখনও আসেনি। তা ছাড়া গত সপ্তাহেই আমরা দেখেছি, রিকনসিলিয়েশন কমিশনের সঙ্গে একটা মীমাংসায় আসছি না বলে ন্যাটো আমাদের দিকে বাঁকা চোখে তাকাচ্ছে। ইউরোফাইটারের কন্ট্রাক্টটা হাতছাড়া হয়ে যাবার মত অবস্থা দাঁড়িয়েছে।'

ভিতরটা তিক্ততায় ভরে গেল ইয়োহানের, তবে চেহারায় তা প্রকাশ পেতে দিল না। অপ্রত্যাশিতভাবেই এসেছে খবরটা, ব্রাসেলসে ন্যাটো হেডকোয়ার্টারের এক শুভানুধ্যায়ী ফোন করে

জানিয়েছে—ইউরোফাইটারের নেক্সট জেনারেশন কম্পিউটারের কাজটা সম্ভবত স্যাকলিচ পাচ্ছে না। ফ্রেঞ্চরা কলকাঠি নাড়তে শুরু করেছে, বিতর্কিত একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে কোনও অপপ্রচারের শিকার হয় কি না—এই ভয়ে ন্যাটো কাজটা অন্য কাউকে দেবে বলে ঠিক করেছে। অবশ্য স্যাকলিচ যদি নিজেদের ইমেজ ঠিকঠাক করে নেয়, তা হলে অন্য কথা।

ইয়োহান চুপ করে আছে দেখে ক্যাটালিনা আবার মুখ খুলল। 'গুদামের পর গুদাম ভর্তি মাল পড়ে আছে আমাদের, কেনার লোক নেই। মার্কেট শেয়ার দিন দিন কমছে। হেভি কনস্ট্রাকশন সেক্টরে তো বছরের বাকি সময়টায় আমাদের হাতে কোনও কাজই নেই, এমপ্লয়িদের বসিয়ে বসিয়ে বেতন দিতে হবে। আর এই যে...' সামনে থাকা ফাইল ঘেঁটে একটা ভাউচার বের করল সে। 'যেখানে স্রোতের মত টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, সেখানে এই ১১৯৮ নম্বর প্রজেক্ট বলে কী একটায় বিশ মিলিয়ন মার্ক খরচ করা হয়েছে, যেটার অস্তিত্ব আমি কোনও অ্যাকাউন্টেই খুঁজে পেলাম না।'

চমকে উঠল ইয়োহান, ওটার খবর মেয়েটা পেল কী করে? কাগজপত্র কি তা হলে ঠিকমত লুকানো হয়নি? ওটা প্যান্ডোরা গুহা ধ্বংস করে দেয়া সংক্রান্ত খরচ, যেটা ফ্রেডারিখ কার্নের ডিপার্টমেন্টে থাকার কথা। গর্দভটা দেখা যাচ্ছে টাকা খরচের হিসাবও সরাতে জানে না!

অল্পবয়েসী অ্যাটর্নি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে বোর্ড ডিরেক্টরের দিকে। ইয়োহান শান্তগলায় বলল, 'ওটা একটা স্পেশাল রিসার্চ প্রজেক্ট, তোমার জানার বিষয় নয়। তবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো, ১১৯৮ নম্বরের পিছনে আর টাকা খরচ হবে না।'

'আপনিই ভাল বোঝেন।' ঠোঁট উল্টাল ক্যাটালিনা।

'শোনো, এখুনি অস্থির হবার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল ইয়োহান। 'ইউরোফাইটারের কাজটা এখনও হাতছাড়া হয়নি, জরিমানাটা একবার শোধ করে দিলেই ওটা আবার আমাদের হাতে

চলে আসবে। কিন্তু মধ্যবর্তী সময়টা আমি চেষ্টা করে দেখতে চাই। কমিশন পৌনে দুশোয় মানলে তো আমাদেরই লাভ, তাই না? যদি নিতান্তই ওদের রাজি করানো না যায়, তা হলে দুশো মিলিয়ন পুরোটাই দিয়ে ওদের শান্ত করব আমরা।'

'কিন্তু ওই সময়টুকুতে কী রকম হইচই হবে, ভেবে দেখেছেন? মিডিয়াতে কীভাবে অপপ্রচার চলবে?'

'জানি। আমাদের গালাগাল করবে লোকে, অফিসের সামনে এসে বিক্ষোভও করতে পারে। কিন্তু এগুলো সাময়িক সমস্যা। সবকিছু মিটে গেলে কয়েক সপ্তাহ পরে কিচ্ছু মনে রাখবে না কেউ, বুঝতে পেরেছ? এটাই মানুষের স্বভাব।' ইন্টারকম বেজে উঠল। 'ইয়েস, সোনিয়া?'

'সরি, হের শ্লাইডার। আপনি বিরক্ত করতে মানা করেছিলেন, কিন্তু অনেক কষ্টে গ্রিনল্যান্ডের লাইন পাওয়া গেছে, হের কার্ন আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'ঠিক আছে, লাইন দাও।' বলে দুই ভিজিটরের দিকে তাকাল ইয়োহান। 'এক্সকিউজ মি, কলটা কনফিডেনশিয়াল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল ওবারব্যাচ আর ক্যাটালিনা। এবার রিসিভারে হুঙ্কার ছাড়ল সে। 'ফ্রেডারিখ! ঘটছেটা কী ওখানে? রেইক্‌ইয়াভিক থেকে আতঙ্কিত কোল ভলকারের একটার পর একটা ফোন পাচ্ছি আমি... দুদিন হয়ে গেছে, সার্ভেয়ার্স সোসাইটি আর মিটিয়োরোলজিস্টদের ফ্লাইট নাকি এখনও পৌঁছেনি। ওদের পাঠিয়ে দাওনি?'

রেডিওতে নিজোর্ড হয়ে হ্যামবার্গে কথা বলছে কার্ন, সোলার ম্যাক্সের কারণে কথা খুব আস্তে শোনাচ্ছে। সে জানাল, 'শিডিউল অনুসারেই ইভ্যাকুয়েশন কমপ্লিট করা হয়েছে। টিমদুটো আর নন-এসেনশিয়াল স্টাফরা ঠিক সময়ে গ্রিনল্যান্ড ছেড়ে গেছে।' তার কণ্ঠ নির্বিকার।

'তা হলে কোথায় ওরা?' দুশ্চিন্তা গ্রাস করল ইয়োহানকে,

জবাবটা আন্দাজ করতে পারছে।

'আইসল্যান্ডে যাবার পথে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, যাত্রীসহ বিমানটা সাগরে হারিয়ে গেছে।' কার্নের গলায় মেকি ভাব স্পষ্ট।

ইয়োহানের মনে হলো অসুস্থ হয়ে যাবে সে, এ-সব কী বলছে তার স্পেশাল প্রজেক্টস্ ডিরেক্টর! কী ঘটেছে, তা খুব ভালই বুঝতে পারছে ইয়োহান—ফ্রেডারিখ কার্ন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে নিরীহ মানুষগুলোকে! হা ঈশ্বর! এ হতে পারে না। অতীতে বহু বেআইনি কাজ করেছে কার্ন আর সে, কিন্তু কখনও খুন পর্যন্ত গড়ায়নি সেগুলো। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসপিয়োনাজ আর হুমকি-ধামকি এক জিনিস... কিন্তু এটা?

এ কী করেছি আমি? আতঙ্কিত হয়ে ভাবল ইয়োহান। এতদিনে বুঝতে পারছে, কার্ন তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না কখনোই, বরং ইচ্ছে করে নিয়ন্ত্রণে থাকার অভিনয় করেছে। ওর মত লোককে নিজের সঙ্গী করে সে আসলে নিয়ো-নাৎসিদের এমন এক ক্ষমতার জগতে প্রবেশাধিকার করে দিয়েছে, যেটা তাদের কখনোই ছিল না। ঝোপ বুঝে কোপ মারার তালে ছিল নব্য-ফ্যাসিস্টদের পা-চাটা কুকুরটা, প্যান্ডোরা প্রজেক্ট তাকে সেই সুযোগ এনে দিয়েছে।

'সবকিছু ঠিকঠাক মতই এগোচ্ছে,' রিপোর্ট দেয়ার ভঙ্গিতে বলল কার্ন। 'আমরা অপারেশনের বাকি অংশের কাজ শুরু করেছি। আবহাওয়া খারাপ থাকায় নর্দার্ন বেস দাঁড় করাতে একটু দেরি হয়ে গেছে, তবে অসুবিধে হবে না। রোটরস্ট্যাটটার সাহায্য নিচ্ছি আমরা, স্নো-ক্যাট নিয়ে আসছি। কোম্পানির পুরনো রেকর্ড থেকে এয়ারশাফটটা কোন্ এলাকায় আছে—তার একটা ধারণা পাওয়া গেছে। আশা করি কাল-পরশুর মধ্যেই এন্ট্র্যান্সটা খুঁজে বের করতে পারব।'

কী বলছে পিশাচটা? এমন ভাব করছে যেন এক ডজন মানুষ খুন করাটা কোনও ব্যাপারই নয়! রোজ নাওয়া-খাওয়ার মত রুটিন

একটা কাজ। এতবড় একটা কাণ্ডের পর সবকিছু ঠিকঠাক এগোচ্ছে বলার মানেটা কী? ভুল হয়ে গেছে, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। কার্নের মত একটা নরপশু আর শয়তান কোনওদিন বদলাতে পারে না—এটা বোঝা উচিত ছিল। চির-অন্ধকার জগতের বাসিন্দা লোকটা—শুধু মৃত্যু আর ধ্বংসের পুজো করে। কিন্তু ভুলটাকে আর বাড়তে দেয়া যায় না।

কী করবে, ঠিক করে ফেলল ইয়োহান। পাগলা কুকুরকে যেভাবে বশ করতে হয়, সেটাই করতে হবে কার্নের বেলায়। তাকে জার্মানিতে ফেরত পাঠিয়ে নিজে অপারেশনটার দায়িত্ব নিতে হবে, শুরুতেই সেটা করা উচিত ছিল। আর কার্নের ভাগ্য... সেটা ঠিক করতে হবে প্যান্ডোরা অপারেশন শেষ করার পরে।

'ফ্রেডারিখ, তৈরি থাকো। আমি এখুনি রওনা দিচ্ছি গ্রিনল্যান্ডে আসার জন্য।'

'কেন... গুহাটা তো এখনও আমরা খুঁজে পাইনি!'

'গড ড্যাম ইট! বুঝেশুনে কথা বলো! এটা একটা ওপেন চ্যানেল!'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

'রেডি থেকো, আমি আগামীকালের মধ্যে পৌঁছুচ্ছি ওখানে। আমি না আসা পর্যন্ত তুমি আর কিচ্ছু করবে না, ইজ ইট ক্লিয়ার?'

'ইয়োহান,' থমথমে গলায় বলল কার্ন। 'তোমার সত্যিই আসার প্রয়োজন নেই। আমরা সব সামলাচ্ছি এখানে।'

লোকটার একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে ইয়োহান। কী সেটা, আন্দাজ করা কঠিন কিছু নয়। স্যাটানস্ ফিস্ট সে তার ফ্যাসিস্ট মালিকদের হাতে তুলে দিতে চায়, চায় নব্য-নাৎসিবাদের নায়ক হতে। কার্ন কি রাজি হবে ফিরে আসতে? মনে হয় না। বরং এখনই রাগারাগি করলে বুঝে ফেলবে, ইয়োহান কেন আসতে চাইছে গ্রিনল্যান্ডে। সেক্ষেত্রে ওকে ঠেকানোর পাল্টা কোনও কায়দা আগেই বের করে রাখবে সে, হয়তো গন্তব্যে

পৌঁছুতেই দেবে না—সার্ভেয়ার্স সোসাইটি আর আবহাওয়াবিদদের অসহায় দলটার মত। কৌশলে তাকে বিভ্রান্ত করতে হবে'।

'আমি জানি তুমি সব ঠিকমতই চালাচ্ছ, মাই ফ্রেন্ড!' নরম গলায় বলল ইয়োহান। 'কিন্তু তর সইছে না আমার, নিজ চোখে সব দেখতে ইচ্ছে করছে, বুঝলে? রেডি থেকো, কাল দেখা হচ্ছে আমাদের।'

কার্নকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে লাইন কেটে দিল ইয়োহান। সারা শরীর কাঁপছে, বাথরুমে ছুটে গিয়ে বমি করার চেষ্টা করল, যেন তাতেই বারোজন মানুষের মৃত্যুর দায় শরীর থেকে বের হয়ে যাবে। পারল না, বিবেকের দংশন থামানো এত সোজা নয়। মাথা তুলে আয়নায় নিজেকে দেখল ইয়োহান—চেহারা সেই আগের মতই আছে, কিন্তু চোখদুটো... ওখানে কি পাপের ছায়া দেখা যাচ্ছে?

'আমি না...' বিড় বিড় করল সে। 'আমার কোনও দোষ নেই, আমি কাউকে খুন করিনি। ওকেও মানুষ মারতে বলিনি। ওটা সম্পূর্ণই ওর সিদ্ধান্ত ছিল। আমি খুনী নই... আমি খুনী নই...'

এসব বলে লাভ হলো না, প্রবোধ পেল না মন। 'ওহ্ গড, আমি এখন কী করব?' বলে নিজের চুল টানল ইয়োহান। তারপর হঠাৎই শান্ত হয়ে গেল, বুঝতে পেরেছে কী করতে হবে, কী করলে পাপের বোঝা হালকা করতে পারবে। চোখমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে নিজের ডেস্কে ফিরে এল সে। ইন্টারকমে সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করল, 'সোনিয়া?'

'ইয়েস, স্যর?'

'ক্লাউস ওবারব্যাচ কি আছে এখনও?'

'জী, ভিতরে পাঠাব?'

'না, ওকে বলো এক্ষুনি কমিশন যা চায়, তা দিয়ে দিতে। অ্যামাউন্টটা সম্ভবত সোয়া দুশো মিলিয়ন... যত তাড়াতাড়ি পারে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলে যেন।'

'ইয়েস, হের শ্নাইডার। আমি বলে দিচ্ছি।'

'আর পাইলটদের খবর দাও, কোম্পানি জেটটা যেন টেকঅফের জন্য রেডি থাকে। আমি একটা ইমার্জেন্সি কাজে আইসল্যান্ডে যাবো।'

'ঠিক আছে, স্যর।'

'গাড়িটাও বিল্ডিঙের সামনে আনাও, আমি এখুনি বেরুব।'

নির্দেশ দেয়া শেষ করে ফোনের রিসিভার তুলে নিল ইয়োহান, বাভারিয়ায় তার সামার লজের নাম্বারে ডায়াল করল। কল রিসিভ করল তার এগারো বছরের ছেলে মিক।

'হ্যালো, পাপা! কেমন আছ তুমি?'

চোখে পানি চলে এল ইয়োহানের, মিকের পাশাপাশি চার বছরের কন্যাসন্তানের চেহারা চোখে ভাসছে—আর কি কখনও দেখতে পাবে ওদের? 'ভাল ডিয়ার, তোমাদের খুব মিস করছি। মাম্মি কোথায়?'

'পাশের বাড়ির ফ্রাউ ওয়ালের সঙ্গে মার্কেটে গেছে। আমি আর টুসি বাড়িতে একা! কার্টুন দেখছি।'

'ফাতিমা নেই?' টার্কিশ বেবিসিটারের কথা জানতে চাইল ইয়োহান।

'আছে, আমাদের জন্য প্যানকেক বানাচ্ছে। তুমি কবে আসবে, পাপা?'

'ঠিক বলতে পারছি না, মিক। মাম্মিকে বোলো, আমাকে খুব জরুরি একটা কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে।'

'তুমি উইকএন্ডে আসবে না?' আহত গলায় জানতে চাইল ছোট্ট ছেলেটা। 'তুমি কিন্তু প্রমিজ করেছিলে।'

'সরি, সান। আমাকে যেতেই হবে।'

'তা হলে কবে আসবে?'

জবাব দেয়ার আগে বুকটা হু হু করে উঠল ইয়োহানের, ভাল করেই জানে—তার ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। উদ্গত

আবেগটাকে কোনমতে চাপা দিয়ে সে বলল, 'আমার কোনও ঠিক নেই, বাবা। যদি খুব বেশি দেরিও হয়...' ঈশ্বর, কী কষ্ট কথাগুলো বলতে! '...জেনো, আমি তোমাদের খুব ভালবাসি! আম্মুকেও বোলো এ-কথা।'

'কী হয়েছে তোমার, পাপা?'

'কিছু না রে, বেটা, কিছু না। রাখি, কেমন?'

রিসিভার নামিয়ে রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ বসে রইল ইয়োহান, আবেগটাকে সামলাচ্ছে। শেষে নিজেকে শান্ত করল স্যাকলিচ এজি-র প্রেসিডেন্ট, কঠিন করণীয়টার কথা ভাবল, ড্রয়ার খুলে বের করে আনল নিজের পিস্তলটা। মনে দৃঢ় সংকল্প।

কার্ল, জীবন দিয়ে হলেও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব আমি।

বারো

প্যান্ডোরা গুহা, গ্রিনল্যান্ড।

শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সামনের পঁচিশ-ত্রিশ গজ জায়গা আলোকিত হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এরপরই রশ্মিটাকে গিলে খাচ্ছে নিকষ কালো অন্ধকার। প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এই টানেলটার ভিতরে আর কোনও আলোর উৎস নেই, পুরোটা যেন আঁধারের দখলে। ফলে ফ্ল্যাশলাইটের সামান্য আলোটাকে মনে হচ্ছে যেন কালোর মাঝে ছোট্ট একটা বুদ্বুদ—অভিযাত্রীদের ঘিরে রেখেছে শুধু।

সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে ছ'জন মানুষ, রানা রয়েছে গাইডের ভূমিকায়। এয়ারশাফটটাকে সত্যিকার অর্থেই একটা

অ্যাকসেস টানেলের মত ডিজাইন করেছে সেবাস্টিয়ান গ্রাব—ঢালু মেঝেটা খসখসে, যাতে পা হড়কে না যায়। মাঝে মাঝেই আবার সারফেসের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে এগোচ্ছে, যাতে কেউ দুর্ঘটনাবশত পিছলে পড়ে গেলেও সমতল অংশে এসে থামতে পারে। এখানে হিমেল বায়ুপ্রবাহ নেই, ফলে বত্রিশ ডিগ্রীর একটা আরামদায়ক তাপমাত্রা বিরাজ করছে ভিতরে, এই প্রথম পরনের পারকার চেন খুলে ফেলার সাহস দিয়েছে সবাইকে। অবশ্য ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া শরীর এখনও পুরোপুরি গরম হয়ে ওঠেনি। কাঁপুনিটা দূর হয়ে যাবার অপেক্ষায় রয়েছে সবাই, কথা বলছে না। এমনকী গাইগার কাউন্টারটাও টানেলে ঢোকার পর থেকে একদম নিশ্চুপ। পায়ের তলায় বুটের ভারি আওয়াজ ছাড়া গোটা টানেলে আর কোনও শব্দ নেই। নিঃশব্দে গ্লেসিয়ারের পাথর, মাটি আর বরফের একটার পর একটা ভূ-গর্ভস্থ স্তর পেরিয়ে নীচে যাচ্ছে ওরা।

আধঘণ্টা পর থামল রানা, এতক্ষণ ধরে টানেলের দেয়ালে প্রতিফলিত হয়ে আলোটা একটা খোলসের মত মুড়ে রাখছিল ওদের—সেটা এখন অদৃশ্য হয়েছে। চারপাশ একদম খোলা, টানেলের অন্যপাশটা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ওরা। হিসেব করল ও, পর্বতমালার অন্তত দু'মাইল ভিতরে এবং এক হাজার ফুট গভীরে পৌঁছেছে।

'এসে গেছি,' সবার উদ্দেশে বলল রানা।

আলোটা চারপাশে ঘোরাল-ফেরাল ও, চোখে পড়ল বিশাল একটা গ্যালারির মত জায়গা, মনুষ্য-নির্মিত—এককালে হয়তো প্রাকৃতিকই ছিল, কিন্তু শাবল-গাঁইতি ব্যবহার করে আকার বাড়ানো হয়েছে। মেঝেটা একদম মসৃণ, ছাদটা এত উঁচুতে যে চোখেই পড়ে না প্রায়; ফ্ল্যাশলাইটের দুর্বল হয়ে আসা আলোয় শুধু ঝুলতে থাকা চোখা চোখা বরফ আর পাথরের সরু অংশ দেখা গেল।

ব্যাটারি বাঁচানোর জন্য এতক্ষণ শুধু একটা ফ্ল্যাশলাইট জ্বলছিল, এবার বাকিগুলো জ্বালতেই সবকিছু আরও পরিষ্কারভাবে

ভেসে উঠল চোখের সামনে। গ্যালারিটা গম্বুজ আকৃতির, ডায়ামিটার পাঁচশো গজের মত। মেঝেটা সামনের দিকে এগিয়ে মিশে গেছে কালচে পানির সঙ্গে, ছোট একটা লেগুন ওটা, খাঁড়ির একটা অংশ, আন্ডারওয়াটার টানেলটা এটার তলাতেই আছে। ছোট একটা কংক্রিটের পিয়ার তৈরি করা হয়েছে সাবমেরিন ভেড়ার জন্য। আঙুল ভিজিয়ে পানিটা জিভে পরখ করল রানা—নোনা স্বাদ পেল।

'আন্ডারওয়াটার টানেলটা খোলা আছে, বন্ধ হয়নি,' পাশে দাঁড়ানো মুরল্যান্ডকে বলল ও।

'কীভাবে বুঝলে?'

'পানিটা নোনা, সমুদ্র থেকে সরাসরি আসছে। বন্ধ জায়গার পানি হলে এত বছরে বরফ গলা পানির সঙ্গে মিশে মিষ্টি হয়ে যেত।'

'হুঁ,' লেগুনের কিনারায় আলো ফেলল মুরল্যান্ড। 'জোয়ার-ভাটার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। ইশ্‌শ্‌, একটা সাবমেরিন থাকলে কী সুন্দর বেরিয়ে যেতে পারতাম! কার্নের বাচ্চা টেরও পেত না।'

'যাও,' হেসে উঠল রানা। 'করে দিলাম তোমার ইচ্ছেপূরণ!'

'মানে!' বোকা বোকা কণ্ঠে বলল মুরল্যান্ড।

কথা বলল না রানা, আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল পিয়ারের শেষ মাথাটা, আলো ধরেছে ওদিকে। বিরাট একটা টিউবের মত আকৃতি দেখা যাচ্ছে ওখানটায়, পিঠের উপর উঁচু একটা অংশ—কোনিং টাওয়ার! ছুটে গেল ওরা ওদিকে, বাকিদের ডাকল।

পিয়ারের পাশে বাঁধা অবস্থায় পানিতে রাজহাঁসের মত ভাসছে একটা জার্মান ইউ-বোট, দেখে মনেই হয় না এটার বয়স ষাট বছরের বেশি। শরীরের পেইন্ট এখনও চকচকে, মরচেও ধরেছে খুব কম—গ্রীনল্যান্ডের চরম শীতল তাপমাত্রার কারণে। আপার ডেকের চারপাশে স্টিলের রেলিং আছে কোনিং টাওয়ারটা বারো

ফুট উঁচু—গায়ে সাদা রঙে লেখা ডেজিগনিশন নাম্বার: ইউ-১০৬২।

'ডেক গান নেই দেখছি,' পিয়ার বরাবর হেঁটে সাবমেরিনটার পুরোটা দেখে মন্তব্য করল মুরল্যান্ড।

'কী?' জানতে চাইল রানা।

'এটা একটা টাইপ সেভেন ইউ-বোট, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই মডেলটাই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে জার্মানরা,' সাবমেরিন সংক্রান্ত জ্ঞান উগরাতে শুরু করেছে মুরল্যান্ড, জলযানটা দেখে তার ভিতরের সাবমেরিনার সত্তা জেগে উঠেছে। 'যদি ভুল করে না থাকি... প্রায় সাত হাজার টাইপ-সেভেন বানানো হয়েছিল। ফরোয়ার্ড ডেকে একটা এইটি-এইটি মিলিমিটার কামান থাকার কথা, এটাতে নেই। তার মানে এটা কমব্যাট সাব ছিল না, হয়তো টর্পেডো রিসাপ্লাই শিপ হিসেবে ব্যবহার হতো। কার্গো নেয়ার জন্য ভিতরটা রি-ডিজাইন করা, স্যাটানস্ ফিস্ট নিয়ে যেতেই আনা হয়েছিল বোধহয়। কোনিং টাওয়ারের গায়ে রাবারের মত আবরণটা দেখতে পাচ্ছ? ওটা *টার্নম্যাট*—এক ধরনের অ্যান্টি-রেডার কোটিং। আমাদের এই ১০৬২ রেডারের চোখ ফাঁকি দিতে পারত।'

'ভাগ্যিস, হান গ্লেশিয়ার থেকে ক্যাম্প ডিকেডে রওনা হবার সময় সেদিন তোমার সঙ্গে সাবমেরিনের উপর ট্রিভিয়া প্রতিযোগিতায় নামিনি!' সকৌতুকে বলল রানা।

'তোমাকে আসলে ফুসলে-ফাসলে নামানো উচিত ছিল,' মুরল্যান্ড গম্ভীর। 'এখন তা হলে পকেট ভারি থাকত আমার।'

হাসল রানা। 'চলো, আগে গুহাটা ঘুরে-ফিরে দেখে নিই, তারপর ঢুকব এটার ভিতরে।'

'কোনও প্ল্যান এঁটেছ মনে হয়?'

'সারাক্ষণই তো আঁটছি!'

'আশা করি পায়ে হেঁটে পিটারাককে ভরা ঠাণ্ডা দোজখ পাড়ি দেয়ার চেয়ে ভাল হবে এটা।'

'আশাই করা যাক! পিটারাক তো আর বলে-কয়ে আসে না।'

পরের একটা ঘণ্টা লাগিয়ে চারপাশটা ভাল করে দেখল অভিযাত্রীরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সারা হলো কাজটা। মূল গুহাটার বিভিন্ন পাশের দেয়ালে মোট ছ'টা মুখ আবিষ্কার করল ওরা—একটা তো এয়ার ভেন্ট, সেটার ঠিক পাশে গুহার মেঝের সমান্তরালে এগিয়ে যাওয়া আরেকটা টানেল রয়েছে, এটাই সম্ভবত মাইনিং শাফট ছিল। আশি গজ এগোনোর পরই সেটা থেমে গেছে, মনে হলো ছাদ ধসে পড়েছিল। বাকি চারটা মুখও প্রাকৃতিক নয়, পাথর খুঁড়ে নতুন গুহা তৈরি করা হয়েছে। প্রথমে যেটাতে ওরা ঢুকল, সেটা একটা মেশিন ওঅর্কশপ—মাইনিঙের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, যেমন জেনারেটর, পাওয়ার ড্রিল, লাইট, ইউটিলিটি লোডার... এসব মেরামতের জন্য স্থাপন করা। মুরল্যান্ড পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রপাতি ভালই বোঝে, ওকে ওখানেই থেকে কাজের জিনিস কিছু পাওয়া যায় কি না দেখতে বলল রানা।

এর পরের মুখের অন্যপাশটা সাইডচেম্বারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়, আকারে মূল গ্যালারির প্রায় অর্ধেক—ওটা শ্রমিকদের অ্যাকোমোডেশন ছিল। সারি বাঁধা চারধাপের অসংখ্য বাঙ্ক বেড চোখে পড়ল, একসঙ্গে অন্তত পাঁচশো লোক থাকতে পারে। প্যান্ডোরা প্রজেক্টে এক হাজার শ্রমিক ছিল, মনে পড়ল রানার, তা হলে বাকিরা থাকত কোথায়? পরমুহূর্তেই বুঝতে পারল, একসঙ্গে ঘুমুতে দেয়া হতো না সব শ্রমিককে, পালা করে অর্ধেক লোক চব্বিশ ঘণ্টাই কাজ করত। বিছানাগুলো এখনও আগের মতই আছে, বালিশ-চাদর কুঁচকানো, যেন কেউ শুয়ে ছিল, এইমাত্র উঠে গেছে। গা শিরশির করে উঠল রানার, গেল কোথায় মানুষগুলো? এভাবে সব ফেলে যাবার মানেটা কী?

এর পরের গুহাটা কয়েকটা পার্টিশান দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। এটা অনেক বেশি গোছানো, আবাসগুলো উন্নত মানের, কয়েক রকম অফিসও পাওয়া গেল। বোঝা গেল, জার্মান সুপারভাইজাররা এখানেই থাকত। গুহাটা ঘুরে ঘুরে দেখার সময় রানার কেন যেন

মনে হলো একটা মিউজিয়ামের মধ্যে আছে। সবখানে নাৎসিদের চিহ্ন রয়েছে নিখুঁত অবস্থায়: ডরমিটরির ক্লজিটে নিভাঁজ ইউনিফর্ম, অফিসগুলোয় নাৎসি প্রতীক, ফাইলপত্র সবখানে স্বস্তিকা চিহ্ন... যেন জাদুঘরে ডিসপ্লে করে রাখা হয়েছে সব। শ্রমিকদের অ্যাকোমোডেশনের তুলনায় গোছানো হলেও বেশ কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ল ওর। ডাইনিং হলের একটা টেবিলে ফেলে রাখা এক সেট তাস... চার ভাগ হয়ে চারটে চেয়ারের সামনে পড়ে আছে, যেন খেলা বন্ধ করে এইমাত্র উঠে গেছে খেলোয়াড়রা। রিক্রিয়েশন রুমে পাতা উল্টানো বেশ কিছু বই... যেন এইমাত্র পড়ছিল কেউ ওগুলো। কিচেনের সিঙ্কে বেশ কিছু ডিশ... আধা পরিষ্কার, যেন ধুতে ধুতে কোনও কাজে গিয়েছে মানুষটা। তা ছাড়া শ্রমিকদের মত এখানেও বেশ কিছু বিছানা এলোমেলো।

'কী হয়েছিল এখানে?' বিস্মিত গলায় প্রশ্ন করল স্যাম। 'সবকিছু এভাবে ফেলে মানুষগুলো গেল কোথায়?'

'বুঝতে পারছি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু তেমন কোনও চিহ্ন দেখছি না।' গাইগার কাউন্টারটা হাতে রেখেছে ও, সবকিছু পরীক্ষা করে দেখছে, এখন পর্যন্ত রেডিয়েশনের কোনও আভাস পায়নি।

'দুর্ঘটনা... আপনি কি ভাবছেন এখানে রেডিয়েশন লিক ঘটেছিল?' স্যামের চেহারায় ভয়।

'হয়তো,' বলল রানা। 'তবে রেসিডিউয়াল রেডিয়েশন মিলিয়ে গেছে বহু আগেই, এখন তার চিহ্নও পাচ্ছি না।'

'যদি তা-ই হবে, লাশগুলো গেল কোথায়? এক হাজার লোক ছিল এখানে, যা-তা কথা নয়।'

'ভাল প্রশ্ন করেছেন, জবাবটা আমিও জানতে চাই।'

'রানা! দেখে যান!' জুরকিচের ডাক শোনা গেল।

পানির ধারে দাঁড়িয়ে আছে আবহাওয়াবিদ, মেইন গ্যালারির একটা পাশে। চল্লিশ-গ্যালন সাইজের অনেকগুলো ফুয়েল ড্রাম

সাজিয়ে রাখা ওখানে, সঙ্গে আরও কিছু কার্গো ক্রেট আছে। রানা আর স্যাম কাছে যেতেই একটা বড় তেরপল তুলে ধরল সে, আলো ফেলতেই সোনালি প্রতিফলন চোখ ধাঁধিয়ে দিল সবার।

প্যান্ডোরার বাক্স... নিখাদ সোনায় তৈরি।

অনেকগুলো রয়েছে ওখানে, সব গোনা সম্ভব হলো না, আন্দাজ করল রানা—ত্রিশটার মত আছে। অ্যাকসেস টানেলের অ্যান্টিচেম্বারে যেটা দেখেছিল, সেটার চেয়ে বড় এগুলো। পাশগুলো পাঁচফুট করে, উচ্চতা তিন ফুট। গাইগার কাউন্টারটা বাক্সগুলোর উপর দিয়ে নিয়ে গেল ও, রেডিয়েশন ধরা পড়ল না। জার্মানরা নিখুঁতভাবে সিল করেছে প্রতিটা বাক্স।

এক পাশে একটা খালি বাক্স দেখে ওগুলোর অভ্যন্তরের গঠন জানা গেল—সোনার কয়েকটা স্তর দিয়ে তৈরি করা হয়েছে বাক্সগুলো, প্রত্যেক স্তরের মাঝখানে ফাঁকা আছে, যেন বড় একটা বাক্সের ভিতর ভরে রাখা হয়েছে ছোট ছোট অনেকগুলো বাক্স। এটা একটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, তাপমাত্রা কমানোর জন্য। স্যাটানস্ ফিস্টের তাপে যেন বাক্সগুলোর আউটার সারফেস খুব বেশি গরম হয়ে না যায়—সেটা নিশ্চিত করার জন্যই এভাবে তৈরি করা হয়েছে ওগুলো, নইলে বাক্সগুলো ধরতে অসুবিধে হতো। অবশ্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করায় সোনার পরিমাণও কম লেগেছে একেকটা কন্টেইনার বানাতে।

কী যেন বলতে যাচ্ছিল স্যাম, কিন্তু তীক্ষ্ণ একটা চিৎকারে থমকে গেল সে। সবশেষ গুহামুখটার কাছ থেকে ভেসে এসেছে চিৎকারটা, ওখানে লিয়া আর সিলভিয়া গেছে।

এক দৌড়ে ওখানে ছুটে গেল রানা, স্যাম আর জুরকিচ। লিয়াকে দেখা গেল সিলভিয়াকে ধরে বাইরে নিয়ে আসছে, মোটাসোটা রাঁধুনির চেহারায় আতঙ্ক, থর থর করে কাঁপছে।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

ব্যাখ্যা করল না লিয়া, শুধু আঙুল তুলে ভিতরটা দেখাল।

'ওখানে।'

ভুরু কুঁচকে গুহাটার অভ্যন্তরে ঢুকল রানারা। এটা সম্ভবত স্টোরেজের কাজে ব্যবহার হতো, নানা রকম কাঠের ক্রেট আর খাবারের টিন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে। এসব দেখে ভয় পাবার কী আছে? বিস্মিত বোধ করল রানা। ঠিক তক্ষুনি চোখে পড়ল ফাটলটা।

একপাশের দেয়ালে ওটা, বেশ বড় একটা ফাঁকা, মানুষ ঢুকতে পারে। সেটা ধরে দশ গজের মত এগোতেই একটা কার্নিশে বেরিয়ে এল ও, ঠিক নীচেই প্রাকৃতিক একটা গহ্বর। ভিতরটায় আলো ফেলতেই চমকে উঠল, বুঝতে পারল কেন সিলভিয়া ভয় পেয়েছে।

গর্তের তলাটা ভরে আছে নানা রকম আবর্জনা আর খালি টিনে, আর সেগুলোর ফাঁক দিয়ে উঁকি দিচ্ছে সাদা সাদা অগণিত হাড়!

'গুড গড!' ঢোক গিলে নার্ভাসনেসটা কাটাল রানা, কিনারায় উপুড় হয়ে শুয়ে কাঁধ পর্যন্ত বের করে দিল শূন্যে, আলো ফেলে হাড়গুলো ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। খানিক পরেই স্বস্তি ফুটল ওর চেহারায়, সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল, বেরিয়ে এল ফাটল থেকে।

মেইন গ্যালারিতে অপেক্ষা করতে থাকা সঙ্গীদের জানাল, 'ওটা একটা গার্বেজ ডাম্প, আবর্জনা ফেলা হয়। হাড়গোড়ও আছে বেশ কিছু, সিলভিয়া ভেবেছে মানুষের। আসলে তা নয়, ওগুলো সিল মাছের কঙ্কাল।'

'সিল!' জুরকিচের চেহারায় বিস্ময়।

'হুঁ,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'মনে হচ্ছে আমাদের দুই জার্মান সার্ভাইভার টিনের খাবারের পাশাপাশি সিলও শিকার করে খেত।'

'সিল পাবে কোথায়?'

'এ ধরনের আন্ডারগ্রাউন্ড গুহা সিল মাছের জন্যে চমৎকার আশ্রয়। নিশ্চয়ই সাবমেরিন ঢোকার ওই ডুবোপথটা দিয়ে

প্রাণীগুলো প্রায়ই চলে আসে এখানে।'

মুরল্যান্ড বেরিয়ে এসেছে ওঅর্কশপ থেকে। 'জটলা কীসের?' জানতে চাইল সে, ময়লা এক টুকরো কাপড় দিয়ে হাতে লেগে থাকা গ্রিজ পরিষ্কার করছে।

গার্বেজ ডাম্প আর সিলের কথা তাকে খুলে বলল স্যাম।

'আমারও মনে হচ্ছিল এরা কিছু শিকার-টিকার করত,' বলল মুরল্যান্ড। 'প্রজেক্টে আর কতটুকু খাবারই বা থাকবে? দশ-দশটা বছর কাটানো কি চাট্টিখানি কথা?'

'এটা ভুল বললে,' রানা বলল। 'এক হাজার শ্রমিক ছিল এখানে, যদি তাদের দেড়-দু'মাসের খাবার স্টক করা থাকে, সেটা দিয়ে দুজন মানুষ সহজেই দশ বছর কাটাতে পারে... বিশেষ করে তারা যদি মাঝে মধ্যে একটা-দুটো সিল শিকার করে। মনে রেখো, এই ঠাণ্ডায় সাধারণ খাবারই সহজে নষ্ট হয় না, টিনের খাবার তো আরও বেশি টিকবে।'

'এবার বুঝতে পারছি, ক্যাম্প ডিকেডের লাশটার দাঁতের অমন খারাপ অবস্থা ছিল কেন।' লিয়া বলল। 'তাজা মাংস খাক আর না-ই খাক, টানা দশ বছর ফলমূল আর শাকসবজি না খেলে স্কার্ভি রোগ তো হবেই।'

'ওই হাড়গুলো যদি উচ্ছিষ্ট খাবারই হয়ে থাকে,' স্যামের কণ্ঠে অস্বস্তি, 'তা হলে এখানকার সমস্ত মানুষ গেল কোথায়?'

'দুর্ঘটনা যে ঘটেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' রানা জানাল। 'রেডিয়েশন লিকের যে ভয়টা পাচ্ছিলাম, সেটাই হয়তো ঘটেছিল। কেউ বাঁচেনি, ওই শ্রমিক আর নাবিক লোকটা ছাড়া।'

'তেমন কোনও আলামত পেয়েছ?' গাইগার কাউন্টারটার দিকে ইশারা করল লিয়া।

'উঁহুঁ। বরফ, পাথর বা মাটি খুব দ্রুত রেডিয়েশন শুষে নিতে পারে, সে কারণেই হয়তো পাচ্ছি না কিছু। আফটার অল, সময় তো কম পার হয়নি সেই তেতাল্লিশ সালের পর থেকে।'

'কিন্তু লাশগুলো?'

'দুই সার্ভাইভার মিলে সরিয়ে থাকতে পারে। গুহার দেয়াল রেডিয়েশন শুষে নেবে বটে, কিন্তু লাশগুলো সহজে ঠাণ্ডা হবার কথা নয়, ক্যাম্প ডিকেড আর অ্যান্টি চেম্বারে তার প্রমাণ দেখেছি আমরা। ওগুলো এখানে পড়ে থাকলে রেডিয়েশন পয়েজনিঙে ওরাও মরত। সেজন্যই হয়তো দূরে কোথাও সরিয়ে ফেলেছে। কোথায়—এটা বুঝতে পারছি না।'

'ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছে না এখনও,' বলল স্যাম। 'সবাই মরলে এরা দুজন বেঁচে গেল কীভাবে? রেডিয়েশন লিকের কথা বলছেন, কিন্তু যে ক'টা বাক্স আমরা দেখলাম, তার প্রত্যেকটাই এয়ারটাইট সিল করা। তা হলে কোথায় লিকটা? গাইগার কাউন্টারে ধরা পড়েনি কিছু। যদি পরে লিকটা বন্ধ করা হয়েও থাকে, কে করল... কীভাবে করল? যে রেডিয়েশনে এক হাজার লোক মরে গেল, সেটা সামাল দিয়ে কীভাবে লিকটা বন্ধ করা সম্ভব? শুধু তা-ই নয়, এক হাজার রেডিয়েটেড ডেডবডি সরাতে গিয়ে সার্ভাইভার দুজন মরে গেল না কেন? দশ বছর টিকে গেল কী করে? সাবমেরিনটাই বা এখানে পড়ে আছে কেন?'

'জানি, অনেক প্রশ্নেরই জবাব পাওয়া যাচ্ছে না,' স্বীকার করল রানা। 'আমিও আপনার মত বিভ্রান্তিতে আছি। আপাতত এসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, পরবর্তী করণীয় ঠিক করতে হবে আমাদের। চলুন, সোনার বাক্সগুলোর কাছে গিয়ে বসি, ওখানে কিছুটা তাপ আছে। আরামে বসে আলাপ করা যাবে, তা ছাড়া সবার জন্য একটা সারপ্রাইজও আছে।'

'তোমরা যাও,' বলল মুরল্যান্ড। 'আমি এক্ষুণি আসছি।' ওঅর্কশপে ফিরে গেল সে।

কম্বল বিছিয়ে স্যাটানস্ ফিস্টের কন্টেইনারগুলোর পাশে বসল অভিযাত্রীরা, রানা নিজের ব্যাকপ্যাক খুলে একটা আনকোরা ব্র্যান্ডির বোতল বের করল।

'এসব কী?' আহত গলায় বলল স্যাম। 'আমাকে বাবার জন্য তৈরি করা ভিডিওটেপটা পর্যন্ত আনতে দেননি, আর আপনি কি না মদের বোতল নিয়ে ঘুরছেন?'

'কী বলেছিলাম, মনে আছে?' রানা বোতলের মুখ খুলছে। 'একান্ত দরকারি জিনিস ছাড়া অন্য কিছু না নিতে। এই ঠাণ্ডায় শরীর গরম রাখতে অ্যালকোহল কেমন কার্যকর একটা জিনিস, ভেবে দেখুন; ভিডিওটেপ পারবে সেটা?'

কাঁধ ঝাকাল স্যাম, যুক্তিটা অকাট্য।

ঠিক তক্ষুণি একটা গুমগুম শব্দে ভরে গেল গোটা ভূ-গর্ভ। ওঅর্কশপে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠেই বিকট আওয়াজ হলো—কাঁচ ভেঙেছে যেন। শব্দ থেমে গিয়ে আবার অন্ধকার গ্রাস করল জায়গাটাকে। মুরল্যান্ডের চাপা গালাগাল কানে এল একটু। কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার শুরু হলো গুরুগম্ভীর আওয়াজটা, একটু পরই মিটমিটে আলোয় ভরে গেল গোটা মেইন গ্যালারি, চারপাশের দেয়ালে লাগানো পুরনো ইলেকট্রিক বালবগুলো জ্বলে উঠেছে। আলো শুধু এখানেই নয়, সব গুহার ভিতরেই জ্বলছে।

মুরল্যান্ডকে দেখা গেল ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে আসতে, মুখে আকর্ণবিস্তৃত হাসি। কাছাকাছি হতেই বিস্মিত গলায় জুরকিচ জানতে চাইল, 'জেনারেটর চালিয়েছেন, না? জাদুটা দেখালেন কীভাবে আপনি, জানতে পারি?'

'জাদু-টাদু কিছু না,' মুরল্যান্ড জানাল। 'ইঞ্জিনিয়ারদের সনাতন ধর্ম সবাই পালন করে কি না, তা-ই পরীক্ষা করলাম। দেখা যাচ্ছে—করে।'

'মানে!'

'অ্যান্টিচেম্বারের লোকটা... সে ক্রেইগস্‌মেরিনের একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিল, ইনসিগনিয়া-টা দেখেছি আমি,' ব্যাখ্যা করল মুরল্যান্ড। 'সম্ভবত ইউ-বোটটার চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছিল সে। আর আমাদের ইঞ্জিনিয়ারদের স্বভাব কী, জানেন? অচল যন্ত্রপাতি

দুচোখে দেখতে পারি না আমরা, পারি না চোখের সামনে যন্ত্রপাতি পড়ে পড়ে নষ্ট হতে দিতেও। তাই ভাবলাম, লোকটা নিশ্চয়ই দশটা বছর এখানে বসে বসে মাছি মারেনি। সবকিছু ঠিকঠাক করে রাখার কথা, আসলেও তা-ই করেছে।'

'সেটা তো তিপান্ন সাল পর্যন্ত। এতদিনে মরচে পড়ে যায়নি সবকিছুতে?'

'উঁহুঁ। আর্কটিক এলাকায় বাতাসে আর্দ্রতা নেই, সহজে মরচে ধরে না লোহায়। সমস্যা ছিল শুধু ফুয়েলটা নিয়ে। কপাল ভাল বলতে হবে, সাব-জিরো টেম্পারেচারে ব্যবহারের জন্য ওরা বিশেষ ডিজেল এনেছিল। সেটা সহজ একটা কায়দায় ফিল্টার করে নিতে পেরেছি। লুব্রিকেশন নিয়ে একটু অসুবিধে আছে এখনও, তবে চলতে চলতে তেলটা সবখানে পৌঁছে যাবার পর সেটাও আর থাকবে না।'

'বলেন কী?' স্যামও অবাক। 'শীতকালে আমার গাড়িটা তো এক রাত বসে থাকলেই পরদিন আর স্টার্ট নিতে চায় না।'

'সেটা ব্যাটারির দোষ,' বলল মুরল্যান্ড। 'লো-টেম্পারেচার গাড়ির ব্যাটারির পাওয়ার শুষে নেয়, স্টার্ট নিতে চায় না সেজন্যই। ভালমত তেল-টেল দিয়ে আপনি যদি একটা ইঞ্জিনের মরচে পড়া ঠেকিয়ে রাখতে পারেন, তা হলে একশো বছর পরও সেটা চালু করা সম্ভব। জেনারেটরে তো আর ব্যাটারি লাগে না, আমাকে শুধু পুল কর্ড ধরে ত্রিশ-চল্লিশবার টান দিতে হয়েছে, বাকিটা তো নিজেরাই দেখছেন। তবে হ্যাঁ, কোনও কোনও বালবের সিল নষ্ট হয়ে গেছে বয়সের ভারে, প্রথমটা জ্বলে গিয়েছিল সেজন্যই। এখন জেনারেটরের পাওয়ার আউটপুট একটু কমিয়ে রেখেছি, যাতে বাকিগুলো বেশি গরম হয়ে না যায়।'

'দ্যাটস্ নাইস!' স্বীকার করল স্যাম।

'খুব ভাল একটা খবর দিলে হে, ববি,' খুশি খুশি গলায় বলল রানা। 'ইঞ্জিনিয়ার লোকটা যদি জেনারেটরটা ঠিক রাখে, তা হলে

সাবমেরিনটাও রেখেছে। ওটাকে কাজে লাগাব আমরা।'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও!' হাত তুলল মুরল্যান্ড। 'কী মতলব ভাঁজছ, সেটা খুলে বলো আগে। কী ধরনের কাজে লাগাতে চাইছ ওটা?'

'এস্কেপ ভেহিকেলের কাজে,' রানা উত্তর দিল। 'স্যামের স্যাট-ফোনটা না থাকায় ফাঁদে পড়ে গেছি আমরা। বরফের উপর দিয়ে আরেকবার পায়ে হেঁটে যাবার ঝুঁকি নিতে চাই না। সাবমেরিনটা যদি চালু করা যায়, তা হলে চমৎকার একটা সাগরভ্রমণ করে আমাসালিকে ফিরে যেতে পারি আমরা।'

'এক সিলিন্ডারের একটা জেনারেটর চালু করতে পেরেছি বলে মান্ধাতা আমলের একটা ইউ-বোটও চালু করতে পারব, এমনটা ভাবা ঠিক হচ্ছে না,' গোমড়া মুখে বলল মুরল্যান্ড।

'পারলে তুমিই পারবে,' ওকে উৎসাহ দিল রানা। 'সাবমেরিন নিয়ে এত পড়াশোনা আমাদের মধ্যে আর কারও নেই। তা ছাড়া নেভি আর নুমার সাব-সারফেস উইঙে কাজ করার ব্যাকগ্রাউন্ড আছে তোমার, এটাই সুযোগ সে বিদ্যে প্রয়োগের। আর সাহায্য করার জন্য আমরা বাকিরা তো আছিই।'

কাঁধ ঝাঁকাল মুরল্যান্ড। 'ঠিক আছে, দেখি চেষ্টা করে।'

'এক মিনিট,' বলল লিয়া। 'সাবমেরিনটা খালি ঠিক করলেই তো চলবে না। ওটা চালাতে পারব আমরা? আপনাদের কেউ জানেন, কীভাবে একটা ইউ-বোট অপারেট করতে হয়?'

'ওটা কঠিন কিছু না,' জানাল মুরল্যান্ড। 'বেসিক নিয়ম-কানুন সব সাবমেরিনের ক্ষেত্রেই এক। আজকাল সব ধরনের মেশিনারি অটোমেটিক হয়ে গেছে, এ-ই যা পার্থক্য। পুরনোটার ক্ষেত্রে হয়তো ম্যানুয়ালি বেশি খাটতে হবে, আর কিছু না।'

'ঠিক বলেছে ও,' রানা একমত হলো। 'তা ছাড়া আর কিছু না হোক, কার্ন যদি কোনওক্রমে এখানে এসে পড়ে, ওটায় করে ডুব দিয়ে থাকতে পারব আমরা, লোকটার চোখ এড়িয়ে।'

'ডুব দিতে বলছেন... কিন্তু ফের ভেসে উঠতে পারব তো?'

জুরকিচের কণ্ঠে সংশয়। 'ইউ-বোটটা যদি মেরামতের অযোগ্য হয়ে থাকে?'

'ঠিক না হলেও অসুবিধে নেই, হ্যাচ খুলে সাঁতার কেটে বেরিয়ে আসা যাবে,' বলল মুরল্যান্ড। 'পানিটা এখানে খুব বেশি গভীর হবে বলে মনে হয় না।'

'প্ল্যানটা ভালই লাগছে শুনতে,' লিয়ার গলায় সন্তোষ।

'কাজেও হবে,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'ঠিক আছে, আমাদের পরবর্তী করণীয় ঠিক করে ফেলা যাক তা হলে। লিয়া... তুমি আর জুরকিচ জার্মান ভাষা ভাল পড়তে পারবে, তাই তোমাদের দায়িত্ব দিচ্ছি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসগুলো তল্লাশি চালানোর। এখানে যন্ত্রপাতির গায়ে স্যাকলিচ এজি-র নাম দেখলাম অনেকখানে, এখন দরকার লিখিত প্রমাণ। ফাইলপত্র যা পাবে, সব ঘেঁটে দেখো—আমাদের এমন কিছু ডকুমেন্ট দরকার, যেগুলো দিয়ে আমরা বাকি দুনিয়ার সামনে কোম্পানিটার কাপড় খুলে দিতে পারি।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল লিয়া।

'ববির সঙ্গে। দেখি, দুজনে মিলে সাবমেরিনটা ঠিক করা যায় কি না। সিলভিয়া আর স্যাম আমাদের সাহায্য করবে।'

'ঠিক আছে বাছারা,' হাত তালি দিল মুরল্যান্ড। 'চলো কাজে নামা যাক।'

তেরো

জার্মান সুপারভাইজারদের গুহায় লিয়া আর জুরকিচ চলে যেতেই বাকিদের কাজ ধরিয়ে দিল মুরল্যান্ড। কংক্রিটের পিয়ারটার পাশে

গ্যালারির মেঝেতে স্টক করে রাখা হয়েছে প্রায় একশোর মত ফুয়েল ড্রাম, সেগুলো সাবমেরিনের ভিতরে নিয়ে যাবার জন্য রানা, স্যাম আর সিলভিয়াকে বলে দিল সে, নিজে চলে গেল ইউ-বোটের ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে, ভিতরেই ফুয়েল পরিশোধনের একটা ব্যবস্থাও করবে।

ড্রামগুলো একেকটা সাড়ে তিনশো পাউন্ড ওজনের, দেখেই দমে গেল রানার মন—কাজটা সহজ হবে না। ওঅর্কশপ থেকে একটা ট্রলি জোগাড় করল ওরা, ইউ-বোটের হ্যাচের উপর বসাল চেইন-পুলি সিস্টেম। এগুলোর সাহায্যে একটার পর একটা ড্রাম নামিয়ে চলল। অর্ধেকের মত ফুয়েল ড্রাম শিফট করা হলে ছোট্ট একটা বিরতি দিল রানা, আর সম্ভব নয় কাজ চালিয়ে যাওয়া, পরিশ্রমে দরদর করে ঘামছে ওরা তিনজনেই, সারা শরীরের পেশি টনটন করছে ব্যথায়। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল ও—রাত বারোটা বাজে। ভূ-গর্ভের এই পরিবর্তনহীন পরিবেশে থাকায় বোঝাই যায়নি এত সময় পেরিয়ে গেছে। সকালের যাত্রাশুরু থেকে ধরলে টানা বিশ ঘণ্টা জেগে আছে দলের প্রতিটা সদস্য, এখন একটু বিশ্রাম না নিলেই নয়।

হ্যাচ গলে উঁকি দিল মুরল্যান্ড, সারা মুখ আর শরীরে তেল-কালি লেগে আছে। রানা জানতে চাইল, 'কেমন দেখলে অবস্থা?'

'চিফ ইঞ্জিনিয়ারকে পুরস্কার দেয়া দরকার,' হাসিমুখে বলল মুরল্যান্ড। 'নিজের কাজ খুব ভালই জানত লোকটা, গ্রিজ মাখিয়ে এত চমৎকারভাবে ইঞ্জিনটা সংরক্ষণ করেছে যে কী বলব!'

'তার মানে চালানো যাবে ওটা?' রানা উত্তেজিত।

'নিঃসন্দেহে। আমি শুধু ভয় পাচ্ছিলাম রাবারের তৈরি হোস আর গ্যাসকেটগুলো নিয়ে... এতদিনে নষ্টই হয়ে গিয়েছে কি না! কিন্তু দেখলাম সেগুলোও এক ধরনের কেমিক্যালের প্রলেপে ঢাকা, তেমন কোনও ক্ষতিই হয়নি। পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে বটে,

তবে একবার চালু হয়ে গেলে টিকে থাকারই কথা। তারপরও ভাবছি একটা করে ইঞ্জিন চালাব, যদি কোনও কারণে সেটার হোস ফেটে যায়, অন্যটারগুলো স্পেয়ার হিসেবে হাতে থাকবে।'

'ইঞ্জিন ঠিক আছে—বুঝলাম,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'কিন্তু ব্যাটারি?'

'এমনি এমনি কি আর লোকটাকে পুরস্কার দিতে চাইছি?' হাসল মুরল্যান্ড। 'ব্যাটারি থেকে সমস্ত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বের করে কাঁচের বোতলে ভরে রেখে গেছে সে—যাতে সীসার পাতগুলো ক্ষয়ে না যায়। আমাদের যা করতে হবে, তা হলো—অ্যাসিডগুলো আবার রিফিল করে চার্জ দেয়া। অলরেডি তিনটে ব্যাটারিতে অ্যাসিড ভরতে শুরুও করে দিয়েছি আমি। ঠিকমত চার্জ দেয়া গেলে আন্ডারওয়াটার টানেলটা পেরিয়ে খোলা সাগরে সারফেস হবার মত যথেষ্ট পাওয়ার থাকবে আমাদের হাতে।'

'আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে ডুব দিতে পারার ব্যবস্থা করা, যাতে কার্নের চোখ ফাঁকি দিতে পারি,' বলল রানা। 'টানেল দিয়ে বের হবার চিন্তা পরে করা যাবে।'

'সেক্ষেত্রে মেইন ট্যাঙ্কে লিক-টিক আছে কি না দেখে ডিজেল লোড করে ফেলি গিয়ে। কম্প্রেসরগুলোর চেকিংও হয়ে যাবে এক সঙ্গে—সারফেসে ওঠার জন্য ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কে বাতাস ভরতে লাগবে ওগুলো।

'একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও,' বলল রানা। 'ছোটখাট একটা ঘুম দরকার সবারই। ক'টা বাজে সে খেয়াল আছে?'

হাসল মুরল্যান্ড। 'একটু আগে সত্যিই ভাবছিলাম ঘুমানোর কথা, তুমি আবার আমাকে কুম্ভকর্ণ ভাবো কি না—সেই ভয়ে কিছু বলিনি।'

'ওটা এমনিতেই ভাবি,' রানাও হাসল। 'যে লোক ডিসি-থ্রী'র একটা গর্জনেও নাক ডাকায়, তাকে আর অন্য কিছু ভাবা যায়?'

'সুন্দর কিছু ভাবতে পারো না? ... এই ধরো, স্লিপিং বিউটি!'

'স্লিপিং বিস্ট বললেই মানাবে বেশি, কখনও সম্ভব হলে ছবি তুলে দেখাব তোমাকে।'

অনাবিল হাসি ছড়িয়ে পড়ল দুই বন্ধুর মুখে। ডকের দিকে তাকাল রানা, ওখানে স্যাম আর সিলভিয়া বসে বসে জিরোচ্ছে। বলল, 'আপনারা গিয়ে শুয়ে পড়ুন। বাকি কাজ পরে করা যাবে।'

'খাওয়াদাওয়া করতে হবে না?' মনে করিয়ে দিল সিলভিয়া। রানা জিভ কামড়াচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'থাক, থাক, ওটা আমার ডিপার্টমেন্ট। আমাদের সঙ্গে টিনের খাবার আর এখানে কিচেন আছে, কিছু রান্না করি গে। আপনারা সবাইকে নিয়ে আসুন।'

'এখন আবার রান্না করবে? তারচেয়ে প্রোটিন বার দিয়েই নাহয়...'

রানার কথা শেষ হলো না, সিলভিয়া গরম গলায় বলল, 'আপনাদের কাজ নিয়ে আমাকে কখনও প্রশ্ন করতে দেখেছেন? যান, যা বলছি... সবাইকে নিয়ে আসুন।'

রানার কাঁধে টোকা দিল মুরল্যান্ড, ফিসফিসাল, 'সাবধান! আপার-কাট!!'

হেসে ফেলল রানা। সিলভিয়াকে বলল, 'আপনার কথাই সই। গরম খাবার খেতে আপত্তি করার তো প্রশ্নই ওঠে না।'

'গুড।' বলে চলে গেল বিশালদেহী রাঁধুনি।

'লিয়া আর জুরকিচ কোথায় গেল?' বলে উঠল স্যাম।

'মনে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কিছু পেয়েছে, নইলে এত দেরি করত না,' বলল রানা। 'আপনারা মেইন গ্যালারিতে গিয়ে বসুন, আমি ওদের ডেকে নিয়ে আসছি।'

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফিসের সবচেয়ে বড় ঘরটায় পাওয়া গেল লিয়াকে, ডেস্কের উপর মাথা রেখে ঘুমাচ্ছে, কোনও রকম সাজগোজ ছাড়াও খুব সুন্দর লাগছে ঘুমন্ত মুখটাকে। জুরকিচ

কাছাকাছি আরেকটা টেবিলে বসা, তারও একই অবস্থা। কাছে গিয়ে লিয়ার মাথায় আস্তে করে হাত বোলাল রানা, সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল সে।

'এ মা! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বুঝি?' তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে চোখ রগড়াল ডাক্তার। 'ছি ছি, একটু রেস্ট নেব ভেবেছিলাম...' হাতঘড়ি দেখল ও, 'তাই বলে আড়াই ঘণ্টা?'

'কিচ্ছু হয়নি,' স্মিত হেসে বলল রানা। 'যা ধকল গেছে সারাটা দিন, ঘুম তো আসবেই।'

'তাও খুব লজ্জা লাগছে। তোমরা নিশ্চয়ই খাটতে খাটতে কাহিল হয়ে গেছ, আর আমরা কি না... দেজান! অ্যাই দেজান! উঠুন তাড়াতাড়ি।'

ধড়মড় করে উঠে বসল আবহাওয়াবিদ। 'ক্... কী হয়েছে!'

'কিছু না, ডিনার টাইম। সিলভিয়া রান্না করতে গেছে,' তাকে আশ্বস্ত করল রানা, তাকাল লিয়ার দিকে। 'তোমরা পেয়েছ কিছু?'

'হুঁ,' লিয়া মাথা ঝাঁকাল। 'যা চাও, সব। নাম-ধাম, তারিখ, অর্ডার, প্রসিডিওর... মানে একটা প্রজেক্টের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের কাগজপত্র। এগুলো দিয়ে স্যাকলিচকে কমপক্ষে তিনবার ধ্বংস করা যাবে।'

'আর ওই যে দুই সার্ভাইভার... তাদের কোনও ডায়েরি-টায়েরি পাওনি? নিঃসঙ্গ মানুষ সাধারণত দিনলিপি লিখে সময় কাটায়।'

'তা-ও পেয়েছি—একটা জার্নাল। দেজান পড়ছিল ওটা।'

জুরকিচের দিকে ফিরল রানা। 'কী কী জানতে পারলেন?'

চোখে চশমা পরল আবহাওয়াবিদ। বলল, 'আমাদের ধারণাগুলোর সঙ্গে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মিল পেয়েছি জার্নালের বর্ণনায়। ওদের একজন ছিল এক ইহুদি যুদ্ধবন্দি শ্রমিক, লোকটার নাম আইজাক বেন ইয়োসেফ, ডায়েরিটা তারই লেখা। নিয়মিত লেখালেখি করার অভ্যেস ছিল লোকটার, প্যান্ডোরা প্রজেক্টের শুরু থেকেই এই জার্নালটা লিখছিল।'

'জার্মান লোকটা কে ছিল?'

'হেলমুট ফিঙ্ক, ইউ-১০৬২-র চিফ ইঞ্জিনিয়ার। জলপথই ছিল নাৎসিদের চলাচলের একমাত্র মাধ্যম, তাই সবসময় একটা ইউ-বোট রাখা হতো এখানটায়। আপনি যা আন্দাজ করেছেন, তা-ই ঠিক, মি. রানা—দুর্ঘটনাই ঘটেছে প্রজেক্টটাতে। ক্রেন থেকে ছুটে মাটিতে পড়ে একটা স্যাটানস্ ফিস্টের বাক্সে ফাটল ধরেছিল, সেটার রেডিয়েশনেই মারা গেছে ভিতরের সব লোক। খুব দ্রুত ফাটলটা বন্ধ করা হয়েছিল বটে, বাক্সটা অন্যান্য বাক্সের সঙ্গে স্টোরেজ এরিয়াতেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তবে তার আগেই যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে, মাত্র এক ঘণ্টা টিকেছে গুহার মানুষগুলো। ফিঙ্ক আর ইয়োসেফ তখন কী কাজে যেন সারফেসে গিয়েছিল, রেডিওতে দুঃসংবাদটা পায়। পুরো দু'সপ্তাহ বরফের মধ্যে কাটায় ওরা, রেডিয়েশন কমে এলে অ্যান্টিচেম্বারে রাখা প্রটেকটিভ সুট পরে নীচে নেমে আসে। ও হ্যাঁ, প্রজেক্টে কোনও সোনার তৈরি প্রটেকটিভ সুট ছিল না, সাধারণ সীসার সুটই ব্যবহার করত ওরা। রেডিয়েশন কমে গিয়েছিল, সাধারণ সুট দিয়েই নিজেদের বাঁচাতে পেরেছে দুজনে। যা-ই হোক, এখানে এসে সব লাশ মাইনিং শাফটে ঢোকায় ওরা, বিস্ফোরক দিয়ে ছাদ ধসিয়ে বন্ধ করে দেয় ওটা।'

'বোঝা গেল, মাইনিং শাফটটা কেন মাত্র আশি গজ লম্বা,' বলল রানা।

'তো যা বলছিলাম, দুর্ঘটনাটার কারণে আটকা পড়ে গেল ফিঙ্ক আর ইয়োসেফ,' খেই ধরল জুরকিচ। 'মরার আগে সম্ভবত দেশেও খবর পাঠাতে পেরেছিল সুপারভাইজাররা। রেডিয়েশনের ভয়ে কোনও রকম রেসকিউ পার্টি এল না ওদের জন্য। কমিউনিকেটর নয় কেউই, সিকিউরিটি কোড জানা না থাকায় ওরা নিজেরাও সাহায্য চাইতে পারেনি। সাবমেরিনটা ছিল যদিও, কিন্তু মাত্র দুজনের পক্ষে ওটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হওয়ায়

এখানেই রয়ে যেতে বাধ্য হলো ওরা। বিপদে পড়ে পরস্পরের বন্ধু হয়ে উঠল এক ইহুদি বন্দি আর এক নাৎসি নাবিক, প্রজেক্টের ফুড সাপ্লাই খেয়ে আর মাঝেমধ্যে সিল মাছ মেরে জীবন কাটাতে লাগল দুজনে। গ্রিনল্যান্ডের এদিকে জার্মানদের আনাগোনা নেই, কাজেই শুরুতে কিছুদিন মিত্রবাহিনীর টহল বিমানগুলোকে সঙ্কেত দেয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে গেছে ওরা, লাভ হয়নি। কয়েক বছর পর ওই বিমান টহলও বন্ধ হয়ে যেতে দেখে আন্দাজ করল দুজনে—যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।'

'আহা রে!' হতভাগ্য মানুষদুটোর জন্য মায়া লাগছে লিয়ার, উত্তর মেরুর ভয়ঙ্কর পরিবেশে রবিনসন ক্রুসো আর ফ্রাইডে-র মত অবস্থা হয়েছিল বেচারাদের।

'ইয়োসেফের জার্নালটা দৈনন্দিন জীবনযাপনের বর্ণনায় ভর্তি,' বলল জুরকিচ। 'তা থেকে যা বুঝলাম, ফিঙ্কের প্রতি লোকটার বেশ সহানুভূতিই ছিল। ব্যাপারটা অদ্ভুতই বলতে হবে—তার দুর্দশার জন্য যারা সরাসরিভাবে দায়ী, তাদের একজনকে বেকায়দায় হাতে পেয়েও সে যে পাল্টা প্রতিশোধ নেয়নি, সেটাই আশ্চর্য। অবশ্য ফিঙ্ক লোকটা বেশ ভালমানুষই ছিল, তারপরেও... বিশেষ করে এই প্যান্ডোরা অপারেশনেই যে সব নারকীয় অভিজ্ঞতা হয়েছে ইয়োসেফের, সেগুলোর পর নাৎসি জাতের উপর মায়া-মমতা উঠে যাবার কথা, আমি হলে কুকুরের মত গুলি করে মারতাম পিশাচগুলোকে, তাতে চিরদিনের মত এই ভয়াল গুহায় একা হয়ে যাই বা না-ই যাই।'

'এতই খারাপ অবস্থা?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, দু-একটা ঘটনা পরে শোনাব আপনাদের, আপাতত ওদের গল্পটা শেষ করি। টানা অনেকদিন কোনও বিমানের মনোযোগ আকর্ষণ না করতে পেরে ওরা ঠিক করল, উদ্ধার পেতে চাইলে একটাই উপায় আছে ওদের হাতে—একটা বিমানকে ক্র্যাশ করাতে হবে, যাতে রেসকিউ পার্টি এলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা

যায়। কিন্তু সমস্যা হলো, অস্ত্র বলতে ওদের কাছে প্রজেক্টের গার্ড আর সাবমেরিনের নাবিকদের অল্প কিছু স্মল আর্মস ছাড়া আর কিছু নেই। ওগুলো দিয়ে একটা বিমানকে শুট-ডাউন করা সম্ভব নয়। বিকল্প অস্ত্র হলো স্যাটানস্ ফিস্ট, সেটার রেডিয়েশন দিয়ে বিমানের ক্রু-দের মেরে সেটাকে ক্র্যাশ করানো যাবে। তবে এ-কাজ করতে গেলে ওদের একজনকেও মরতে হবে, কারণ সোনার বাক্সগুলোর ডালা একজনকে না একজনকে তো খুলতে হবেই, তাই না? এখানেই লোকদুটোর মহান হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতোমধ্যে বেশ কয়েক বছর কেটে গিয়েছিল; দুজনের ভিতর বিরাট পরিবর্তন এসেছে—হয়তো নির্জনবাসে থাকার ফলেই। সারা দুনিয়ার ভালমন্দ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল ওরা। উদ্ধার পেয়ে পরিবারের কাছে ফিরে যাবার চেয়ে তাদের কাছে বড় গুরুত্ব পাচ্ছিল স্যাটানস্ ফিস্টের বিধ্বংসী ক্ষমতা এবং প্যান্ডোরা গুহায় ঘটে যাওয়া নারকীয় ঘটনাগুলোর কথা বাকি পৃথিবীকে জানানোর ব্যাপারটা। এজন্য ওরা ঠিক করল, একজন মরলে ক্ষতি নেই, অপরজন গিয়ে সব প্রকাশ করে দেবে। কে মরবে-কে বাঁচবে এটা নিয়ে কিচ্ছু আলোচনা করল না তারা, সবচেয়ে ছোট যে বাক্সটা পেল, সেটা নিয়ে অ্যান্টিচেম্বারে গিয়ে পালা করে পাহারা দিতে শুরু করল—দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা, প্লেন পাওয়া গেলে যে ওখানটায় থাকবে, সে-ই আত্মত্যাগ করবে। জার্নালে যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে, জীবন দেয়ার ব্যাপারে কারও চেয়ে কারও আগ্রহ কম ছিল না। অদ্ভুত, তাই না?

'যা-ই হোক, টানা আট বছর ঝড়-ঝঞ্ঝা আর শীতকে পরোয়া না করে পাহারা চালিয়ে গেল ওরা, শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল সুযোগ—অ্যান্টিচেম্বারের খুব কাছ দিয়ে উড়ে এল আমাদের সেই সি-নাইন্টি সেভেনটা। কীভাবে কী ঘটেছিল, তা ইয়োসেফ ঠিক বলতে পারবে না, কারণ তখন পাহারায় ছিল ফিঙ্ক। তবে এটুকু অনুমান করা যেতে পারে যে, প্ল্যান অনুসারে স্যাটানস্ ফিস্টের

বাক্সের ঢাকনাটা খুলে ফেলে সে এবং নিজে আত্মাহুতি দিয়ে বিমানটাকে ক্র্যাশ করাতে সমর্থ হয়।'

'তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' রানা একমত হলো। 'বাক্সটার ভিতরে নিশ্চয়ই পদার্থটার হাফ-লাইফবিহীন খাঁটি স্যাম্পল ছিল। পাইলটদের যে অবস্থা দেখেছি, তাতে মনে হলো এক্সপোজারের পর একটুও সময় পায়নি ওরা।'

'এরপর কী ঘটল?' জানতে চাইল লিয়া।

'ক্র্যাশের সঙ্গে সঙ্গে বেরুতে পারেনি ইয়োসেফ। অ্যান্টিচেম্বারটা রেডিয়েটেড হয়ে গিয়েছিল, ফলে সেটা ঠাণ্ডা হবার জন্য আবারও প্রায় দু'সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হয়েছে তাকে, পরে যখন প্রোটেকটিভ সুট পরে বেরুতে পারল, তখন বিমানটার আর চিহ্ন খুঁজে পায়নি। টানা দশদিন ঘোরাঘুরি করে গুহায় আবার ফিরে আসে সে। প্লেনটা খুঁজে পাওয়ার ব্যর্থতা, সেই সঙ্গে একমাত্র সঙ্গীকে হারাবার শোকে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল বেচারা। এদিকে ফলমূল আর শাকসবজির অভাবে স্কার্ভি রোগেও আক্রান্ত হয়ে পড়েছে সে। চিন্তাভাবনা করে দেখল—আয়ু আর বেশিদিন নেই, এখানে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে শেষ একটা চেষ্টা করে মরা ভাল। সাতদিন চলার মত খাবার-দাবার একটা পোঁটলায় বেঁধে বেরিয়ে পড়ল ইয়োসেফ চিরদিনের জন্য—জার্নালটারও শেষ ওখানেই। শেষ পাতায় সুইসাইড নোট টাইপের কিছু কথাবার্তা আছে, সেটা দারুণ মর্মস্পর্শী।'

'এর পর কী ঘটল, সেটা বোধহয় আন্দাজ করতে পারি আমরা,' বলল রানা। 'দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সি-নাইন্টি সেভেনটা খুঁজে পায় সে, ভিতরে গিয়ে কাগজপত্র থেকে ক্যাম্প ডিকেডের কথাও জানতে পারে। পাইলটের জ্যাকেটটা সম্ভবত নিয়েছিল আর্মি বেসটায় দেখানোর জন্য; যত কিছুই হোক, অজানা-অচেনা একটা লোককে একটা সামরিক স্থাপনায় কারণ ছাড়া ঢুকতে দেবে না কেউই। ইয়োসেফের আইডিয়া ঠিকই ছিল, বিমানটার খোঁজ পেতে

পাগল হয়ে রয়েছিল অ্যামেরিকানরা, জ্যাকেটটা দেখলে ওকে রীতিমত আপ্যায়ন করে ঢুকতে দিত। সে জানত, ধ্বংসাবশেষটার খোঁজ চাইবে ক্যাম্প ডিকেডের লোকজন, ম্যাপটা এঁকে রেখেছিল সেজন্যই।'

'মনে হচ্ছে যেন তুমিই ছিলে লোকটার জায়গায়,' প্রশংসা ঝরল লিয়ার গলায়।

'আর যা-ই হোক, আইজাক বেন-ইয়োসেফ হতে চাই না আমি,' ভয় পাবার ভান করল রানা। 'তার কপালটাই দেখো, প্ল্যান-বুদ্ধি... সবই নিখুঁত ছিল, যা চেয়েছে তা-ই হয়েছে... কিন্তু বেচারার কাজে লাগেনি কোনওটাই। বিমান ক্র্যাশ করিয়েছে, সার্চ পার্টিও এসেছে, কিন্তু তার খোঁজ পেয়েছে কি? রেসকিউ টিমের এলমার গুডজনসেনের কথা বলছি... সে নিশ্চয়ই এয়ারশ্যাফটের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল, নইলে ফিঙ্কের শরীর থেকে ছড়ানো রেডিয়েশনে আক্রান্ত হতো না। অথচ তখন ইয়োসেফ কোথায়? রেডিয়েশনের ভয়ে নিশ্চয়ই নীচে বসে ছিল, তাই না? নিয়তিই বলতে পারো, যে-রেডিয়েশনের হাত থেকে বাঁচার জন্য উপরে এলো না, পরেরবার সি-নাইন্টি সেভেনের ভিতর ঢুকে কিন্তু ঠিক সেই রেডিয়েশনেই আক্রান্ত হলো। তারপরও অনেক কষ্ট করে তিন-তিনশো কিলোমিটার হেঁটে হাজির হলো ক্যাম্প ডিকেডে... অথচ?'

'ওটা পরিত্যক্ত হয়ে গেছে,' জবাবটা দিল লিয়া। 'নাহ্, ঠিকই বলেছ। এমন ঊনকপালে লোক সত্যিই খুব কম দেখা যায়।'

'স্রষ্টা মাঝে মাঝে এমন নির্দয় হয়ে ওঠেন কিছু মানুষের প্রতি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল জুরকিচ। 'ইয়োসেফ লোকটা যে সব পৈশাচিকতা দেখার পরও ঈশ্বরের উপর আস্থা হারায়নি, তার দিকে অন্তত আরেকটু সুদৃষ্টি দেয়া উচিত ছিল।'

'কী রকম?' জানতে চাইল লিয়া।

'মাইনিঙের সময় রেডিয়েশনে গণহারে শ্রমিকদের বীভৎস মৃত্যু

তো আছেই... তা ছাড়া এই যে, এখানে একটা ঘটনার বর্ণনা আছে। নাৎসিদের ধর্ষণের শিকার একটা মেয়ে প্রেগন্যান্ট হয়ে গিয়েছিল, তাকে ন'টা মাস কিচ্ছু বলেনি গার্ডরা। কিন্তু প্রসবের পর পরই কী করল, জানেন? কাঁদতে থাকা বাচ্চাটাকে জলাশয়ের মাঝখানে নিয়ে পানিতে ডুবিয়ে মারল, এরপর মেয়েটাকে শুরু করল নতুন করে ধর্ষণ। স্যাকলিচ কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট অটো শ্লাইডার সেদিন ভিজিটের জন্য হাজির ছিল এখানে। ওকে তার জন্য একটা সোফা দেয়া হয়েছিল, সেটায় বসে শয়তানটা হাত তালি দিতে দিতে দুধের বাচ্চাটাকে ডোবানোর দৃশ্য দেখেছে। চিন্তা করতে পারেন?'

'মাই গড!' লিয়ার চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হয়ে গেছে। 'এটা কীভাবে সম্ভব? লোকগুলো মানুষ ছিল, না পিশাচ?'

রানার ভিতরটাও কেঁপে গেছে এই নৃশংস দৃশ্যটা কল্পনা করে। শীতল গলায় ও বলল, 'এসব স্যাকলিচ কর্পোরেশনের কীর্তি, তাই না? ওদেরকে এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

কণ্ঠটায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পাশাপাশি এমন কিছু রয়েছে যে ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল লিয়া। অবাক হয়ে গেল ও—এ কোন্ রানা? শান্ত, ভদ্র, মায়াময় মানুষটার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে যেন আরেক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর রূপ! এবার বুঝতে পারছে লিয়া, কেন রানাকে শত্রুরা এত ভয় পায়—এই কঠিন-নির্মম মানুষটা মন্দ লোকদের দয়া দেখাতে জানে না... চেহারাটাই বলে দিচ্ছে তা।

মুরল্যান্ড হঠাৎ উদয় হলো এ সময়। 'তোমরা কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? কখন থেকে বসে আছি আমরা, জানো?'

'হ্যাঁ, চলো,' চেহারা স্বাভাবিক করে বলল রানা। 'খেয়েদেয়ে বিশ্রাম নিয়ে আবার কাজে নামতে হবে। সবকিছু ঠিকঠাক না হওয়া পর্যন্ত খুব খাটতে হবে আমাদের।'

আরামদায়ক একটা পরিবেশ পেয়ে সে রাতে বেশ ভালই ঘুম হলো

অভিযাত্রীদের। পরদিন সকালে ঝরঝরে শরীর নিয়ে পুরোদমে কাজে নেমে পড়ল সবাই। সাবমেরিনটা মেরামত করাটা সবচেয়ে জরুরি, কাজেই সেটার উপরই নজর দেয়া হলো।

মুরল্যান্ড ব্যস্ত থাকল ডিজেল ইঞ্জিন এবং ইলেকট্রিক মোটরগুলোকে অপারেশনাল করার কাজে, দুই নারী সদস্য দায়িত্ব পেল গ্রীজ দিয়ে সমস্ত মুভেবল ইকুপইমেন্ট লুব্রিকেট করার, বাকি পুরুষেরা খাটল ফুয়েল ড্রাম লোডিং এবং পরিশোধন করতে।

দুপুরে এক ফাঁকে অ্যান্টিচেম্বারে গিয়ে টানেলের এন্ট্র্যান্সে একটা দলা পাকানো সীসার বল রেখে এল রানা—সেটা এমনভাবে বসাল যেন কেউ ঢুকতে গেলেই লাথি খায়, আর গড়াতে গড়াতে একেবারে নীচ পর্যন্ত চলে আসে। একজিটের কাছে একটা লোহার পাতও রাখল ও, যাতে বলটা এসে বাড়ি খেলে বিকট আওয়াজ হয়... ওরা বুঝতে পারে যে, কেউ আসছে টানেল ধরে। মোটামুটি একটা হিসেব করে রেখেছে ও—বলটা নীচে পৌঁছানোর অন্তত দশ মিনিটের মধ্যে কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় টানেলটা পাড়ি দেয়া; দৌড়ে এলেও পারবে না। সময়টা সাবমেরিন নিয়ে ডুব দেয়ার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য পুরো ব্যবস্থাটা এমনভাবে সাজানো হলো যাতে হঠাৎ করে চোখে পড়লেও তেমন গুরুত্ব পাবে না কারও চোখে। দেখে মনেই হবে না গুহায় লুকিয়ে থাকা কেউ আর্লি ওয়ার্নিং হিসেবে ব্যবহার করছে বলটা।

টানা আঠারো ঘণ্টা সবাইকে খাটাল রানা, খাবার সময়টা বাদে। ঢিল দিল না একটুও। সন্ধ্যার দিকে অ্যান্টিচেম্বার থেকে ফিঙ্কের লাশটা নিয়ে এসে গার্বেজ ডাম্পে লুকিয়ে ফেলল ওরা, ছোট আকারের প্যান্ডোরা বক্সটাও নীচে এনে রেখে দিল অন্যান্য কন্টেইনারগুলোর সঙ্গে; পারলে বাক্সগুলো পানিতেই ফেলে দিত, কিন্তু সেগুলো নিরেট সোনায় গড়া হওয়ায় এত ভারী যে, পরিকল্পনাটা বাদ দিতে হলো। এর মধ্যে অ্যান্টিচেম্বারের ছাদের ফুটোয় বরফ জমাট বাঁধার জন্য ব্যবহার করা কাপড়ের খণ্ডটাও

নিয়ে আসা হয়েছে, ফুটো বন্ধ হয়ে গেছে অনেক আগেই, কাপড়ের আর দরকার নেই।

টানেল এন্ট্র্যান্সটা পরিষ্কার করার পর এবার গুহার ভিতরে নজর দিল ওরা—সব লাগেজ আর প্রভিশন ইউ-বোটে এনে তুলল। সবগুলো চেম্বার আর মেইন গ্যালারি চিরুণীর মত তল্লাশি চালিয়ে ওদের উপস্থিতির যত প্রমাণ আছে, সব সরিয়ে ফেলল। এমনকী মেঝেতে খাবারের কণাও পড়ে থাকতে দিল না রানা। ওঅর্কশপের জেনারেটরটাও বন্ধ করে ঘষে-মেজে শুকিয়ে ফেলতে হলো। বরাবরের মত নিকষ অন্ধকারে ডুবে গেল প্যান্ডোরা গুহা। কাজ দেখে সন্তুষ্ট হবার পর সবাইকে রেহাই দিল রানা।

রাতটা কন্টেইনারগুলোর পাশে কাটিয়ে তৃতীয় দিন সকালে আবার কাজ শুরু করল ওরা। প্রথমেই মেইন গ্যালারি সাফ করা হলো রাত কাটানোর সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলতে। তারপর সাবমেরিনে গিয়ে ঢুকল সবাই।

দিনের বড় একটা অংশ কাটল ফুয়েল পরিশোধনে, এরপর মন দিতে হলো ব্যাটারির দিকে—পুরো সাবমেরিনে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ওগুলোরই। হেলমুট ফিঙ্ক যদিও অ্যাসিড সরিয়ে ভিতরের পাতগুলো বাঁচানোর ব্যবস্থা করেছে, তারপরও কালের প্রবাহে কন্টেইনারগুলো ফেটে-ফুটে গেছে। খুঁজে-পেতে যে ক'টা ব্যবহারযোগ্য পাওয়া গেল, সেগুলোও পুরোপুরি অক্ষত নয়, ছোটখাট লিক আছেই। অ্যাসিড ভরলেই চুইয়ে চুইয়ে পড়ছে, গড়িয়ে চলে যাচ্ছে ইনার হালের তলাতে, সেখানে জমে থাকা সি-ওয়াটারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তৈরি করছে বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস, আস্তে আস্তে হোল্ড ভরিয়ে ফেলছে। সিলিং ইকুইপমেন্ট না থাকায় ছিদ্রগুলো ঠিকমত বন্ধ করা গেল না। অবশ্য ইঞ্জিন আর জেনারেটর না চালালে ব্যাটারি লাগে না, এটাই যা সান্ত্বনা। রানা আর মুরল্যান্ড মিলে ঠিক করল, সাবমেরিনটা নিয়ে যখন রওনা হবে, তার আগে ব্যাটারিগুলোতে অ্যাসিড ভরবে না। সারফেসে

যতক্ষণ ভেসে ভেসে চলবে, ততক্ষণ বিষাক্ত গ্যাসটা ভেন্ট দিয়ে বের করে দেবে। তবে ডুব দেয়ার পর বিশাল একটা সমস্যা হয়ে দেখা দেবে ব্যাপারটা। বিশেষ করে ওরা যখন ডুবন্ত সাবমেরিনটা চালিয়ে আন্ডারওয়াটার টানেল দিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করবে, আসল ঝামেলাটা দেখা দেবে তখনই। এ নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মাথা গরম করল না ওরা, যখনকারটা তখন দেখা যাবে। সব সমস্যারই সমাধান থাকে, যথাসময়ে বের করে নেয়া যাবে তা।

টানা দুদিনের খাটুনিতে কাহিল হয়ে পড়েছে দলটা, সন্ধ্যা ছ'টায় রাতের খাবার সেরে ওদের ছুটি দিয়ে দিল রানা। সবাই ঘুমানোর তোড়জোড় করছে, কিন্তু ও রওনা হলো এয়ারশাফট ধরে সারফেসের দিকে, উপরের অবস্থা দেখতে। দু'মাইল পথ হেঁটে এক হাজার ফুটের একটা ঢালু রাস্তায় ওঠা তেমন কঠিন কিছু না, তবে ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে ওর—সারা দিনে মুরল্যান্ড আর ও-ই খেটেছে সবচেয়ে বেশি... কী যেন বলে ওটাকে... হ্যাঁ, গাধার খাটুনি! উপরে যাবার উৎসাহ পাচ্ছিল না একটুও, কিন্তু দায়িত্বটা এড়াবার কোনও উপায় নেই।

শ্রান্ত পায়ে অর্ধেকের মত পথ পেরিয়েছে, এমন সময় সচকিত হলো রানা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় সীসার বলটাকে গড়িয়ে নামতে দেখে এক লাফে হৃৎপিণ্ডটা উঠে এল গলার কাছে। তাড়াতাড়ি আলো নিভিয়ে উল্টো ঘুরে ছুটতে শুরু করল ও, কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অন্ধকারে পা বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝেয়, নাক-মুখ ঠুকে গেছে—ব্যথায় অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

কোনওমতে উঠে দাঁড়াল রানা, ছুটতে শুরু করল নীচের দিকে। বাকিদের নিয়ে চিন্তা নেই, মুরল্যান্ড আছে নীচে, লোহার পাতে বলটার শব্দ শুনেই সবাইকে নিয়ে সাবমেরিনে গিয়ে ঢুকবে। ভয়টা নিজেকে নিয়ে, তাড়াতাড়ি না পৌঁছুলে ইউ-বোটটা নিয়ে ডাইভ দিতে পারবে না সময়মত। নিজেকে গালাগাল দিল রানা, কোন্ কুক্ষণে যে উপরে রওনা দিয়েছিল! আইজাক

বেন-ইয়োসেফের দুর্ভাগ্য তাড়া করছে নাকি? নিখুঁত পরিকল্পনা আর প্রস্তুতি থাকার পরও কপাল বিশ্বাসঘাতকতা করবে? না, তা হতে দেয়া যায় না। পড়ে যাবার কারণে ব্যথা করে ওঠা মাথা আর ক্লান্তিকে অগ্রাহ্য করে ছুটতে থাকল ও।

মেইন গ্যালারিতে পৌঁছে ফ্ল্যাশলাইটটা অল্প সময়ের জন্য জ্বালল রানা, স্বস্তি পেল। মুরল্যান্ডের কাজে কোনও খুঁত নেই, সবাইকে নিয়ে ঠিকমত চলে গেছে সাবমেরিনে, যাবার সময় শোয়ার জায়গাগুলোও পরিষ্কার করে নিয়ে গেছে, দেখে বোঝার উপায় নেই কেউ ছিল এখানে।

লিয়া দাঁড়িয়ে ছিল ইউ-বোটের কোনিং টাওয়ারের হ্যাচ খুলে, ওকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, 'রানা! আমরা এখানে!'

আলো নিভিয়ে দৌড়ে ডকটা পেরুল রানা, টাওয়ারের গায়ে লাগানো মই বেয়ে উঠে এল উপরে। শেষবারের মত তাকাল চারপাশে। ফুয়েল ট্যাঙ্কে তেল ভরার পর খালি ড্রামগুলো লেগুনে ফেলে দিয়েছে ওরা, ভাসছে ওগুলো। শুধু একটার গায়ে ফুটো করে সাবমেরিনের পেরিস্কোপে আটকে রাখা হয়েছে। ডুব দেয়ার পর ওরা যখন পেরিস্কোপটা তুলবে, তখন বাকি সব ভাসমান ড্রামের মতই দেখাবে ওটাকে, মাঝখান থেকে ফুটোর ভিতর দিয়ে শত্রুদের অজান্তে এখানে কী ঘটছে না ঘটছে তলা থেকে দেখতে পাবে ওরা। ব্যবস্থাটায় কোনও খুঁত নেই—নিশ্চিত হয়ে অ্যাকোমোডেশন ল্যাডার বেয়ে জলযানটার পেটের ভিতর এসে নামল রানা, হ্যাচ বন্ধ করে দিয়ে এসেছে, লিয়া নেমেছে আরও আগেই।

'সবাই রেডি?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' রিপোর্ট দিল লিয়া। 'তোমার ওই আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেমের সঙ্কেত পাবার পর দশ মিনিট পেয়েছি আমরা। কোনও অসুবিধে হয়নি।'

'তা হলে রবিকে ডাইভ দিতে বলো।'

'মি. মুরল্যান্ড!' কন্ট্রোল রুমের দিকে এগিয়ে চেঁচাল লিয়া। 'এখন!'

হিস্‌স্‌স্‌ জাতীয় একটা শব্দে ভরে গেল গোটা ইউ-বোটের অভ্যন্তর, মুরল্যান্ড সি-ভালভগুলো খুলে দিয়েছে। আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে ওদের ডুবোজাহাজ। গভীরতা মাপার যন্ত্রে আগেই চেক করে রেখেছিল মুরল্যান্ড, লেগুনের তলা ষাট ফুট নীচে। সারফেসে যাতে আলোড়ন না ওঠে, সেটা লক্ষ রেখে ডুব দেয়ার গতি ঠিক করেছে সে, আশা করা যায় একটা পালকের মতই আলতোভাবে সি-বেডে নামিয়ে রাখতে পারবে ১০৬২-কে।

বাল্কহেড ধরে কন্ট্রোল রুমে চলে এল রানা। মাঝখানে পেরিস্কোপের নীচটা রয়েছে এখানে, সেটা পেরিয়ে সামনে ডাইভ কন্ট্রোল, মুরল্যান্ড সেখানে গজ দেখে ভালভ অপারেট করছে, একপাশে প্লেইনসম্যানের সিটে বসে তার নির্দেশ অনুসারে হুইল ঘোরাচ্ছে স্যাম।

'সব ঠিক আছে তো?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল মুরল্যান্ড। 'ট্যাঙ্কে পানি ভরে ডুব দিচ্ছি শুধু, এতে অসুবিধে হবার কথা না। এখন পর্যন্ত হালে কোনও রকম লিক দেখিনি।' বন্ধুর দিকে তাকাল ও। 'কার্ন লোকটা এয়ারশ্যাফটের খোঁজ পেয়েই গেল, তাই না?'

'হুঁ, কপাল ভাল ওর, আর আমাদেরটা মন্দ। কী আর করা যাবে, বলো? চেষ্টা তো কম করিনি। যাক গে, বাতাসের কী অবস্থা?'

'স্নরকেল দিয়ে বাতাস ঢোকাব নীচে পৌঁছানোর পর। তবে ইঞ্জিন-টিঞ্জিন চালাতে বোলো না, ব্যাটারির কারণে তৈরি হওয়া গ্যাসটা নিষ্কাষণের কোনও ব্যবস্থা করতে পারিনি এখনও।'

'বলব না। বাকিদের কোথায় রেখেছ... কাউকে দেখছি না যে?'

'সবাই ফরোয়ার্ড টর্পেডো রুমে—ওজন ব্যালেন্স করার জন্য

পাঠিয়েছি।'

একটু পরেই পানির তলার নরম মাটিতে নামল ইউ-বোট। পনেরো মিনিট লাগিয়ে পেরিস্কোপ আর স্নরকেলসহ বিভিন্ন রকম অ্যাডজাস্টমেন্ট সারল মুরল্যান্ড, তারপর ডাইভ কমপ্লিট হবার রিপোর্ট দিল। ওর কাজের প্রশংসা করতে বাধ্য হলো রানা, বন্ধুর পুরনো সাবমেরিন সংক্রান্ত পাগলামিটা এভাবে কাজে লাগবে, কখনও কল্পনাও করেনি।

'এবার কী?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'অপেক্ষা,' জানাল রানা। 'দেখা যাক, আমাদের জার্মান বন্ধুরা কী করে উপরে। পালা করে পেরিস্কোপে নজর রাখতে হবে সবাইকে।'

'ভেবো না প্রথম পালাটা তুমি নেবে!' বলল লিয়া। জুরকিচ আর সিলভিয়াকে নিয়ে কন্ট্রোল রুমে এসে ঢুকেছে। 'এক্ষুনি তুমি আমার সঙ্গে এসো, বিশ্রাম নেবে।'

'না... না... ক্লান্ত নই আমি...' প্রতিবাদ করতে গেল রানা।

'উঁহুঁ, মিথ্যে বলে পার পাবে না,' শাসনের ভঙ্গিতে বলল লিয়া। 'চেহারা-সুরত দেখেছ নিজের? এসো বলছি!'

'কিন্তু উপরে খেয়াল রাখা দরকার...'

'কানা নই আমরা কেউ। ইম্পরট্যান্ট কিছু দেখলে তোমাকে খবরও দিতে পারব,' হাত ধরে টেনে রানাকে কন্ট্রোল রুম থেকে বের করে আনল মেয়েটা, সোজা নিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের কেবিনে। বিছানা দেখিয়ে বলল, 'শুয়ে পড়ো।'

'এখানে?' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'এত ভাল একটা কেবিন... এটা তো তোমার আর সিলভিয়ার হওয়া দরকার...'

'জী না,' বেরসিকের মত বলল লিয়া। 'তোমার অনুপস্থিতিতে ভোটাভুটি হয়ে গেছে। কেবিনটা তোমাকেই দেয়ার মত দিয়েছে সবাই।' পানি এনে রানাকে কয়েকটা পেইনকিলার খাওয়াল ও। আদর করে শুইয়ে দিল।

চোখ প্রায় মুদে এসেছে রানার, ওর ঠোঁটে গাঢ় একটা চুমু খেল লিয়া। 'সুইট ড্রিমস্, মাই হিরো!'

রানা কোনও জবাব দিল না, চুমুটাতে বুঝি কোনও মাদক ছিল... অতল ঘুমে তলিয়ে গেছে ও।

চোদ্দো

জিয়ো-রিসার্চ নর্দার্ন ক্যাম্প।

'কী বললে... আবার বলো।' কমিউনিকেশন সেটের গায়ে কান প্রায় লাগিয়ে রেখেছে ফ্রেডারিখ কার্ন, সোলার ম্যাক্সের কারণে সিগনালটা খুব দুর্বল, সারাক্ষণ খসখসে আওয়াজ হচ্ছে।

'এয়ারশাফটটা আমরা লোকেট করতে পেরেছি,' স্পিকারের শব্দজটের মাঝ থেকে খুব আস্তে শোনা গেল নুয়েনডর্ফের গলা। সাতসকালে স্নো-ক্যাট নিয়ে বেরিয়েছিল সে। 'অ্যাডভান্স টিম ঢুকেছে ভিতরে... ওরা কনফার্ম করেছে।'

সিধে হয়ে থেলমার দিকে তাকিয়ে সাফল্যের আনন্দে হাসল কার্ন, মেয়েটার মুখেও সংক্রামিত হয়েছে তা। ইয়োহান শ্নাইডার দাঁড়িয়ে আছে ঠিক পিছনে, নির্বিকার। খানিক আগে এসে পৌঁছেছে সে, খারাপ আবহাওয়ার জন্য যাত্রাপথে দেরি হয়েছে।

মাউথপিসটা মুখের কাছে নিয়ে কার্ন বলল, 'একসেলেন্ট জব, নুয়েনডর্ফ। স্নো-ক্যাটের ট্র্যাকিং ডিভাইস থেকে তোমাদের লোকেশন দেখতে পাচ্ছি আমরা। অন্যান্য সমস্ত টিমকে ওখানে পাঠিয়ে দিচ্ছি এখুনি।'

ইন্টারফেয়ারেন্স বেড়ে যাওয়ায় নুয়েনডর্ফের জবাবটা শোনা

গেল না, রেডিও লিঙ্কটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বসের দিকে তাকাল কার্ন, 'দেখলে তো, ইয়োহান? আমি তো বলেছিলামই, এটা আমি হ্যান্ডেল করতে পারব।'

'পারবে না—এ কথা আমিও বলিনি,' শান্ত গলায় বলল স্যাকলিচ এজি-র প্রেসিডেন্ট। 'তোমার দক্ষতা নিয়ে আমার মনে কখনও সন্দেহ ছিল না, সমস্যা হলো কাজের পন্থা নিয়ে। থেলমা, আমাদের একটু প্রাইভেসি দেবে?'

আহত চোখে কার্নের দিকে তাকাল থেলমা, কেউ তাকে বাইরের লোকের মত সরিয়ে দিক—এটা একদমই পছন্দ করে না। কিন্তু বয়ফ্রেন্ডকে একই রকম ইশারা দিতে দেখে কিছু করার রইল না তার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেল নিজের রুমের দিকে।

একটা মাত্র প্রি-ফ্যাব্রিকেটেড বিল্ডিং আনা হয়েছে নর্দার্ন ক্যাম্পে, পাশাপাশি দুটো রুমের পার্টিশান খুলে বানানো হয়েছে কমিউনিকেশন সেন্টার আর কন্ট্রোল রুম—সেখানেই এ মুহূর্তে আছে ইয়োহান আর কার্ন—বাকিগুলো অ্যাকোমোডেশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

থেলমা বেরিয়ে যেতেই একটা চেয়ার টেনে স্পেশাল প্রজেক্টস্ ডিরেক্টরের সামনে বসল ইয়োহান। চোখে চোখ রেখে কঠিন গলায় বলল, 'এবার তোমাকে বলতে হবে, ফ্রেডারিখ, কেন একটা গ্লেনভর্তি নিরীহ লোকজন মেরে ফেলার প্রয়োজন বোধ করেছ তুমি।'

'জবাবদিহি যদি করতেই হয়, তা হলে শুধু একটা বিষয়েই করব কেন?' উদ্ধত ভঙ্গিতে বলল কার্ন। 'এটা জানতে চাও না, কেন জার্মানিতে আমি সেবাস্টিয়ান গ্রাব নামে এক লোককে মেরে ফেলেছি? কেনই বা ম্যাক্সিম বোরোশিন নামে এক রাশান বিজ্ঞানীকে ক্যাম্প ডিকেডের ভিতরে খুন করেছে থেলমা?'

চোয়াল ঝুলে পড়ল ইয়োহানের। 'কী বলছ তুমি?'

'যা সত্যি, তা-ই,' গম্ভীর হয়ে গেল কার্ন। 'তোমার ধারণাও

নেই, গোটা অপারেশনটা বানচাল হয়ে যাবার কতটা কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।'

'কীভাবে?'

'স্যাকলিচ আর্কাইভে পাওয়া লিওনিদ কুলিকের ইন্টারোগেশনের ট্রান্সক্রিপ্ট নিশ্চয়ই পড়েছ তুমি। লোকটা ব্রাদারহুড অভ স্যাটানস্ ফিস্ট বলে একটা গুপ্তসংঘের সদস্য ছিল, মনে আছে? সংগঠনটা আজও টিকে আছে। কীভাবে, জানতে চেয়ো না, তবে আমি খবর পেয়েছি—তারা অস্ট্রিয়ার এক নাৎসি হান্টারের সাহায্যে প্যান্ডোরা প্রজেক্টের খবর ফাঁস করে দিতে চাইছে। ওই লোকের অফিসে আড়ি পেতে আমরা সেবাস্টিয়ান গ্রাবের খবর পাই, সে-সময় লোকটা এখানে মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছিল। তার মুখ বন্ধ করতে গিয়েছিলাম আমি, তখনই ডা. লিয়া নোভাক সেখানে হাজির হয়—এই ডাক্তার অস্ট্রিয়ান সেই নাৎসি হান্টারের নাতনি। দুজনকেই আমরা আটক করি, কিন্তু কোথেকে যেন এক স্নাইপার আমাদের উপর হামলা চালিয়ে ওদের ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। গ্রাব মারা যায়, কিন্তু লিয়া আমাদের হাত গলে পালায়, তাকে পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বের করতে পারিনি আমরা।

'হঠাৎ করেই দেখলাম, লিয়া এই গ্রিনল্যান্ডে এসে হাজির হয়েছে... আমাদের এই এক্সপিডিশনের মধ্যে, ব্যাপারটা চিন্তা করতে পারো? কীভাবে সে জিয়ো-রিসার্চ আর স্যাকলিচের মধ্যে কানেকশনটা বের করেছে, জানি না। শুধু তা-ই নয়, মাসুদ রানা আর ববি মুরল্যান্ডের সাহায্য নিয়ে আমাদের অপারেশনটার বারোটা বাজাতে যাচ্ছিল মেয়েটা। ওদের চিরতরে সরিয়ে না দিলে তোমার সাধের কর্পোরেশনের আর চিহ্নও থাকত না।'

'তাই বলে পুরো একটা প্লেনকে গায়েব করে দেবে?' বিস্মিত গলায় বলল ইয়োহান। 'আর ওই যে এক বিজ্ঞানীর কথা বললে... তার ব্যাপারটা কী?'

'সে আর তার পুরো টিম আসলে ব্রাদারহুডের লোক ছিল। তোমার কথামত ক্যাম্প ডিকেডে পাইলটের লাশটা পরীক্ষা করতে গিয়ে থেলমা তাকে দেখতে পায়—সবার চোখ এড়িয়ে বোরোশিনও ওখানে ঢুকে লাশটা পরীক্ষা করছিল। তখনই থেলমা বুঝে ফেলে লোকটার পরিচয়। জ্যাক-হ্যান্ডেল দিয়ে বাড়ি মেরে তাকে খুন করে ও, লাশটা এমনভাবে ফেলে রাখে, যাতে ব্যাপারটা দুর্ঘটনার মত দেখায়। কিন্তু রানা আর লিয়াকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয়নি, ওরা ঘটনাটা বুঝে ফেলে বেসের ভিতর প্রমাণ সংগ্রহ করতে যায়। উপায়ান্তর না দেখে আগুন লাগিয়ে দুজনকেই মেরে ফেলার চেষ্টা করে থেলমা, কিন্তু কপালজোরে বেঁচে যায় ওরা। এই পর্যায়ে এসে অপারেশনটা প্রায় শেষই হয়ে যাচ্ছিল, কারণ শুধু রানা, মুরল্যান্ড আর লিয়া নয়, বোরোশিনের টিমের বাকি তিন সদস্য রয়ে গেছে... তারা সবাই আমাদের উদ্দেশ্য জানে। এই অবস্থায় ইভ্যাকুয়েশনটা একটা সুবর্ণ সুযোগ হয়ে দাঁড়াল... সেই সঙ্গে শেষ পন্থা। ওদের সবাই একসঙ্গে একটা বিমানে উঠবে—এই চান্সটা কীভাবে হাতছাড়া করা যায়, বলো?'

'অন্য কোনও একটা পথ বের করতে!' বলল ইয়োহান, সবকিছু শোনার পরও ব্যাপারটা মেনে নিতে পারছে না। 'বিমানে ওরা ছাড়া নিরীহ আরও কিছু মানুষ ছিল!'

'যে কোনও লড়াইয়ে নিরীহ কিছু মানুষ মরেই—ওরা ছিল কোল্যাটারাল ড্যামেজ,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল কার্ন। 'ওদের জন্য মায়াকান্না করে লাভ নেই, কারণ বিমানটা ধ্বংস করে দেয়াই ছিল পুরো সমস্যাটার সহজ এবং একমাত্র সমাধান। আমার দিকে এভাবে তাকিয়ো না, ইয়োহান। সমস্যাটা আমার সৃষ্টি করা নয়। আমি শুধু বিগড়ে যাওয়া একটা পরিস্থিতিকে আয়ত্তে আনার জন্য যা যা প্রয়োজন, তা-ই করেছি। জেনে রাখো, দরকার না হলে একটা মানুষকেও মারতাম না আমি।'

কথাটা একটুও বিশ্বাস করল না ইয়োহান, কার্নের দৃষ্টিই বলে

দিচ্ছে—মানুষগুলোকে খুন করতে একটুও হাত কাঁপেনি তার। কে জানে, এক ডজন লোকের জীবন নিয়ে সে হয়তো আনন্দই পেয়েছে। সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার হলো, কাজটাকে অপরাধই ভাবছে না সে, বরং পৈশাচিক কাজটাকে হালাল করার জন্য চমৎকার যুক্তি বের করে ফেলেছে। আর সন্দেহ নেই ইয়োহানের মনে—কার্ন পুরোপুরিই তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, লোক দেখানো আনুগত্য এত বছর যেটুকু ছিল, সেটাও উবে যেতে বেশি দেরি নেই। একটাই উপায় সামনে—কার্নের কাজে সায় দিয়ে যাওয়া, যাতে চরম মুহূর্তটা এলে শয়তানটা ঠিক হাতের নাগালে থাকে... তাকে বাধা দেয়া যায়।

'ঠিক আছে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ইয়োহান। 'বুঝলাম, কোম্পানিটাকে বাঁচাতেই এতকিছু করছ তুমি। যাক গে, এখন কী?'

'প্যান্ডোরা গুহায় ঢুকব আমরা,' জানাল কার্ন। 'ভিতরে যত রকম কাগজপত্র আছে, সব পুড়িয়ে ফেলব। তারপর বিস্ফোরক বসিয়ে চিরতরে গ্লেসিয়ারের তলায় চাপা দেব ওটা।'

'আর উল্কাপিণ্ডের বাক্সগুলো?'

'সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে আসব, রোটরস্ট্যাটে করে নিয়ে ফেলে দেব মাঝসাগরে। ডোন্ট ওয়ারি, ইয়োহান। সব প্ল্যান করা আছে। খুব শীঘ্রি প্যান্ডোরা প্রজেক্টের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যাচ্ছে স্যাকলিচ। ওটার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেবাস্টিয়ান গ্রাবের মত দু-চারজন বুড়ো-হাবড়া যদি বেঁচেও থাকে, কিচ্ছু প্রমাণ করতে পারবে না। রিকনসিলিয়েশন কমিশনকে নামমাত্র জরিমানা দিয়ে সমস্ত অতীত মুছে ফেলতে পারবে তুমি, স্যাকলিচকে ধোয়া তুলসীপাতা বানিয়ে ফেলতে পারবে। সুসংবাদ, তাই না?'

'কতটা সময় লাগবে তোমার?' প্রশ্ন করল ইয়োহান।

'কাল... বড়জোর পরশু পর্যন্ত,' কার্ন বলল। 'তারপরই নর্দার্ন ক্যাম্পের সবকিছু আমরা অরিজিনাল সাইটে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। মাঝখানের ক'টা দিনে কী করেছি আমরা, তা কেউ জানতে পারবে

না।'

'ঠিক আছে,' বলে উঠে দাঁড়াল ইয়োহান। আর কিছু না বলে বেরিয়ে গেল কমিউনিকেশন সেন্টার থেকে।

দরজায় উদয় হলো থেলমা, মুখটা হাসি হাসি। জিজ্ঞেস করল, 'কী... তোমার সব কথা বিশ্বাস করেছে ও?'

'না করলেও কিছু এসে-যায় না,' হালকা গলায় বলল কার্ন। 'ইয়োহান আমাদের জন্য বিপজ্জনক কেউ নয়। কোম্পানিটাকে বাঁচানোর জন্য নিজের স্বার্থেই মুখ বন্ধ রাখবে ও।'

'কিন্তু সবার বেলায় কথাটা খাটে না।' থেলমা মনে করিয়ে দিল, 'জেন্সের কথা বলছি। স্যাকলিচের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই, তা ছাড়া গোটা অপারেশনে আমাদের বিশ্বস্ত লোকজনের বাইরে একমাত্র ও-ই সবকিছু জানে।'

কুটিল হাসি ফুটল কার্নের মুখে। 'চিন্তা কোরো না। মুয়েলারের ওর একটা *"অ্যাকসিডেন্ট"* আয়োজন করে রাখা হয়েছে।'

'কাজটা আমাকে করতে দাও!' বায়না ধরল থেলমা।

টান দিয়ে তাকে কোলে বসাল কার্ন। 'বোরোশিনকে খুন করে খুব আনন্দ পেয়েছ, না? সত্যি করে বলো তো, সেক্সুয়্যালি কোনও উত্তেজনা বোধ করেছিলে?'

'হুঁ, পরে শাওয়ার করার সময়।'

হেসে উঠল কার্ন। 'ইউ আর আ সিক বিচ!'

'সেজন্যেই তো তুমি আমাকে ভালবাসো!'

'কে বলল আমি তোমাকে ভালবাসি?'

'বাসো না?' ভারি নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে থেলমা, প্রাক্তন প্রেমিককে খুন করার কথা শুনে শরীরটা উত্তেজিত হয়ে উঠছে বিকৃত রুচির মেয়েটার। 'অন্তত বিছানায় শোও তো? চলো এখন, সেটাই করো!'

প্রেমিকাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল কার্ন, রওনা হলো রুমের দিকে।

পনেরো

ইউ-১০৬২-র লুকআউট পজিশনে বসে পাহারায় আছে দেজান জুরকিচ, চোখদুটো আইপিসে সাঁটা। সাবমেরিনে ঢোকার পর থেকেই ক্লস্ট্রোফোবিয়ায় আবার আক্রান্ত হয়েছিল সে, তার ওপর লুকআউট পজিশনটা আরও ছোট—আঁটোসাটো আকারের ছোট্ট একটা টিউবের মত... শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল তার। কিন্তু পিটারাকের সময় মুরল্যান্ড তার গলা টিপে ধরে যেভাবে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, সেটা আরও ভয়ঙ্কর। দুই আতঙ্কের মধ্যে প্রথমটাকেই বেছে নিয়েছে সে মোকাবেলা করার জন্য, মুরল্যান্ডের মত মানব-ভালুকের মুখোমুখি হবার সাহস নেই। গতকাল থেকে ক্লস্ট্রোফোবিয়াটাকে দমিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বেচারা, এই নিয়ে দ্বিতীয়বার চলছে তার পাহারার পালা।

'কী অবস্থা উপরের?' গলার স্বর শুনে ঘাড় ফেরাতেই মেঝের হ্যাচ বেয়ে রানাকে কন্ট্রোল রুম থেকে উঠে আসতে দেখল জুরকিচ।

'গতকালকের মতই,' জবাব দিল সে। 'একটানা কাজ করে যাচ্ছে ওরা—পালা করে খাওয়াদাওয়া করছে বটে, কিন্তু ঘুমাচ্ছে না কেউই।'

'আমি একটু দেখব?'

'নিশ্চয়ই।' স্টিলের তৈরি সিটটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জুরকিচ।

আইপিসে চোখ লাগিয়ে মেইন গ্যালারির দিকে তাকাল রানা। স্যাকলিচের লোকজন দেয়ালে বড় বড় সার্চলাইট লাগিয়েছে,

উজ্জ্বল আলোয় ভেসে যাচ্ছে উপরটা, পেরিস্কোপ দিয়ে দেখতে একটুও অসুবিধে হচ্ছে না। ইতোমধ্যে বেশিরভাগ প্যান্ডোরা বক্স সরিয়ে ফেলা হয়েছে গুহা থেকে, দু-একটা যা আছে, সেগুলোও নিয়ে যাওয়া হয়েছে এয়ারশ্যাফটের মুখটার কাছে। পুরো টানেলটা জুড়ে ইলেকট্রিক উইঞ্চ বসিয়েছে ফ্রেডারিখ কার্ন, বাক্সগুলো ভাল করে বেঁধে টেনে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এ ছাড়া প্যান্ডোরা গুহার ভিতরে নির্বিচারে চলছে ভাঙচুর আর অগ্নিসংযোগ। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসের গুহাটা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছিল সবার আগে, এখন মন দেয়া হয়েছে অন্যগুলোর দিকে। লেন্সের ভিতর দিয়ে শ্রমিকদের গুহাটার মুখের কাছে আলো নাচতে দেখল রানা—এ মুহূর্তে ওটাই জ্বলছে। সব ধরনের যন্ত্রপাতির শরীর থেকে ব্লো-টর্চের মাধ্যমে তুলে ফেলা হচ্ছে স্যাকলিচের নাম, তারপর ভেঙে টুকরো টুকরো করে আগুনে ফেলে দেয়া হচ্ছে। বড় আকারের যেগুলো ভাঙা সম্ভব হচ্ছে না, সেগুলো নিক্ষেপ করা হচ্ছে লেগুনে। সাবমেরিনটা বেশ কিছুটা দূরে থাকায় ওদের গায়ে এসে পড়েনি ওগুলোর একটাও।

প্যান্ডোরা প্রজেক্টের নাম-নিশানাও রাখছে না এই লোকগুলো। মনে মনে স্বস্তি বোধ করল রানা, আগেই কিছু কাগজপত্র সরিয়ে রেখেছিল ওরা, নইলে স্যাকলিচ কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণই থাকত না। ভাল হতো প্রতিপক্ষের হাতে পড়ার আগে প্যান্ডোরা বক্সগুলো সরিয়ে ফেলতে পারলে। কিন্তু ভারি কন্টেইনারগুলো নড়ানোই কঠিন ছিল ওদের জন্য, সাবমেরিনে এনে ঢোকানো তো আরও পরের কথা। সবচেয়ে বড় সমস্যাটা হলো, ওগুলো পাওয়া না গেলে কার্ন বুঝে ফেলত, কেউ তার আগেই পৌঁছে গেছে গুহায়।

বাক্সগুলো এখন নিয়ে যাচ্ছে লোকটা। কেন? নষ্ট করতে, নাকি অসৎ কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে—তা জানার উপায় নেই। তবে রানা ঠিক করে রেখেছে, একবার এই নরক থেকে মুক্তি

পেলেই হয়, বিসিআই-এর সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে ওগুলো আবার খুঁজে বের করবে ও।

সাবধানে স্কোপটা ঘোরাল রানা, যাতে ডগায় বাঁধা ড্রামটার নড়াচড়াটা দৃষ্টিগোচর হবার মত বেশি না হয়। গ্যালারির একপ্রান্তে কার্ন আর থেলমাকে দেখতে পেল, আরেকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কে এই লোক, আগে দেখেছে বলে মনে পড়ল না। লিভার টেনে ম্যাগনিফিকেশন বাড়াল রানা, এবার পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মুখটা। খুব বেশি বয়স হবে না লোকটার, পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশের মত। চেহারা এবং হাবভাবে আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছে, যেন কার্ন এবং জিয়ো-রিসার্চের লোকজনের চেয়ে কয়েক স্তর উপরের মানুষ সে।

'দেজান, কার্নের সঙ্গে নতুন একজনকে দেখতে পাচ্ছি। লোকটা কে, জানেন?'

'হ্যাঁ। স্যাকলিচ এজি-র বর্তমান প্রেসিডেন্ট—ইয়োহান শ্নাইডার।'

'শ্নাইডার? তার মানে...'

'হ্যাঁ। অটো শ্নাইডারের ছেলে।'

'বুড়োটা আছে এখনও?'

'না, অনেক বছর আগেই মারা গেছে। ইয়োহান কোম্পানিটার দায়িত্ব নিয়েছে বছর দেড়েক হলো।'

'হুঁ, তা হলে এই লোকই কার্নের বস!' চেহারাটা মনের পর্দায় গেঁথে নিল রানা। তারপর উঠে দাঁড়াল। 'থ্যাংকস্, দেজান। থাকুন আপনি। আমি নীচে যাচ্ছি।'

কন্ট্রোল রুমে নেমে এল রানা, জায়গাটা সবার উপস্থিতিতে ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে। শত্রুপক্ষ চলে যাওয়া পর্যন্ত সবাইকে বেকার বসিয়ে রাখতে রাজি ছিল না ও, তা ছাড়া টানেল ধরে বেরুনোর সময় সাবমেরিনটা চালাতে ক্রু লাগবে—এজন্য মুরল্যান্ডের উপর দায়িত্ব দিয়েছে ও, সবাইকে কাজ চালানোর মত ট্রেনিং দিতে। এ

মুহূর্তে প্লেইনসম্যানের স্টেশনে বসিয়ে স্যাম আর সিলভিয়াকে যন্ত্রপাতি আর হুইল অপারেট করতে শেখাচ্ছে সে, লিয়া রয়েছে চার্ট টেবিলে—ওকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ক্যাপ্টেনের লগবই পড়ে আন্ডারওয়াটার টানেলটায় কী ধরনের আঁক-বাঁক আছে, সেটা বের করতে।

'কী চলছে ওপরে?' রানাকে নামতে দেখে জিজ্ঞেস করল মুরল্যান্ড।

'বেশিরভাগ বাক্স ওপরে নিয়ে গেছে ওরা,' রানা বলল। 'বাকিগুলোও নিচ্ছে। গুহাতে বাকি যা কিছু ছিল, সব ধ্বংস করে ফেলছে। যেভাবে খাটছে, তাতে মনে হচ্ছে না খুব বেশি সময় লাগবে কাজ শেষ হতে।'

'হুঁ, আমাদের ট্রেনিংও তা হলে তাড়াতাড়ি সারতে হবে। ওরা যাবার সঙ্গে সঙ্গে তো আমাদেরও বেরুতে হবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। যত তাড়াতাড়ি সভ্যজগতে ফিরব, তত তাড়াতাড়ি ওদের কাছ থেকে বাক্সগুলো ছিনিয়ে নিতে পারব আমরা।'

'দেজানের কী অবস্থা?' জানতে চাইল লিয়া।

'পেরিস্কোপে যতক্ষণ বাইরের দুনিয়া দেখতে পাচ্ছে, চিন্তা নেই।'

'ওকে নিয়ে ভেবো না,' আশ্বাস দিল মুরল্যান্ড। 'কেবিনে আমার উপরের বাঙ্কটাই দিয়েছি তাকে। পাগলামি করলে আবার গলায় টিপ খাওয়ার ভয় আছে না!'

কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটল, তারপরই উপর থেকে জুরকিচের ডাক শোনা গেল। 'রানা! ওরা গুলি করতে যাচ্ছে!'

'কী!'

'তিনজন লোক... অটোমেটিক রাইফেল নিয়ে পানির কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। কার্ন সম্ভবত ওদের দায়িত্ব দিয়েছে ভাসতে থাকা ফুয়েল ড্রামগুলো ডুবিয়ে দিতে।'

'ব্যাটার দেখি সবদিকেই কড়া নজর!' তিক্ত গলায় বলল রানা।

‘দেজান, পেরিস্কোপটা নামিয়ে ফেলতে হবে আপনাকে।’

‘ক্... কেন?’ জুরকিচের গলা ভেঙে যাচ্ছে।

‘ডগায় লাগানো ড্রামটার জন্য। গুলি করার পরও যদি ওটা না ডোবে, ওরা বুঝে ফেলবে আমাদের কারিগরি।’

‘আমি পারব না!’ জুরকিচের গলায় আতঙ্ক। ‘বাইরেটা না দেখলে আমার দম আটকে আসে।’

‘গড ড্যাম ইট, দেজান!’ ক্রুদ্ধ গলায় ধমক দিল রানা। ‘পেরিস্কোপটা যদি না নামান, তা হলে ক্লস্ট্রোফোবিয়া আপনার শেষ সমস্যা হতে যাচ্ছে!’

‘ওহ্ গড! ওরা গুলি করছে!’

‘স্ট্যান্ডবাই থাকুন। স্কোপের ড্রামে গুলি লাগলেই নামিয়ে আনবেন ওটা।’

‘আমি সাহায্য করব?’ ল্যাডারের দিকে পা বাড়াল লিয়া।

খপ করে হাত টেনে ধরে ওকে থামাল রানা। ‘না, কাজটা ওকেই করতে দাও। এই সাবমেরিনেই আমাদের বাকিটা সময় কাটবে, দেজান যদি ভয়টা সামলানোর কায়দা শিখতে না পারে, ওকে নিয়ে পদে পদে বিপদে পড়ব আমরা।’

‘কাম অন, দেজান!’ নীচ থেকে বলল সিলভিয়া। ‘মন শক্ত রাখুন। আপনি পারবেন!’

‘আমার দিকে নিশানা করছে ওরা! আমার দিকে নিশানা করছে!!’ জুরকিচ চেঁচাল।

‘গেট রেডি!’ নির্দেশ দিল রানা।

উপরে আবছাভাবে ঠং ঠং আওয়াজ শুনল সবাই, ড্রামটার গায়ে গুলিবৃষ্টি হচ্ছে।

‘এখন, দেজান! এইবার!’ চিৎকার করে বলল মুরল্যান্ড।

হাইড্রোলিক মোটরের হিস্স্ আওয়াজ হলো, নেমে আসছে পেরিস্কোপটা। একটু পরই কাঁপতে কাঁপতে লুকআউট থেকে নেমে এল জুরকিচ, বাথরুমে ছুটল বমি করতে। লিয়া এবারও তাকে

সাহায্য করতে যাচ্ছিল, কিন্তু রানা দিল না।

'কিচ্ছু কোরো না,' নিষ্ঠুরের মত বলল ও। 'ভয়টা ওর, ওকে নিজের ভিতর থেকে ওটা দূর করতে হবে।'

মুরল্যান্ড একটা গজের গায়ে চাপড় দিচ্ছে লক্ষ করে স্যাম জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

'বিরাট বিপদ,' হাসিখুশি মুরল্যান্ডের গলায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখে অবাক হয়ে গেল সবাই। 'আমাদের এয়ার সাপ্লাইয়ের স্নরকেলটা লাগানো ছিল পেরিস্কোপের সঙ্গে, ওটাতে গুলি লেগেছে... গুঁড়িয়ে গেছে একেবারে।'

'মানে!'

'মানে হচ্ছে, আমরা আর কোনও ফ্রেশ এয়ার পাচ্ছি না,' কাষ্ঠ হাসি হাসল মুরল্যান্ড। 'মেশিনারি চালিয়ে এয়ার ফিল্টার করতে পারব না, কারণ সেক্ষেত্রে ব্যাটারি লাগবে... আর ক্লোরিন গ্যাসটা ফিলট্রেশনের কোনও কায়দা নেই এখানে। সারফেস না হলে নতুন বাতাস পাবো না, খোলের মধ্যে আটকে থাকা বাতাসটুকুই আমাদের সম্বল। ওটা যখন শেষ হবে, তখনও যদি স্যাকলিচের লোকজন গুহার ভিতরে থাকে...' বাক্যটা আর শেষ করল না ও।

'হায়, যিশু!' বলে উঠল লিয়া। 'কার্ন যেন তাড়াতাড়ি করে!'

ইউ-বোটের ভিতর দিন-রাত বলে কিছু নেই। শুধু অভ্যাসের বশে ঘড়ি দেখে রাতে ঘুমাতে গেল সবাই; অবশ্য এমনিতে যেত না, রানাই জোর করে পাঠাল। সবাইকে দুশ্চিন্তা করতে মানা করে দিয়েছে ও, হিসেব করে দেখিয়েছে—খোলের ভিতরে যা বাতাস আছে, তাতে প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দিতে পারবে ওরা। ঘুমাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত কাউকে আজেবাজে চিন্তায় মুষড়ে পড়তে না দিয়ে সবাইকে মুরল্যান্ডের অধীনে ট্রেনিঙে লাগিয়েছিল ও, নিজেও ছিল ওদের সঙ্গে। রাত বাড়তেই খাওয়াদাওয়া শেষে সবাই ঘুমাতে গেল। পেরিস্কোপটা ব্যবহার

করা যাচ্ছে না, কাজেই কারও পাহারায় থাকারও প্রয়োজন নেই।

নিজেদের কেবিনে দোতলা বাঙ্কে শুয়ে আছে লিয়া আর সিলভিয়া বার্ক... উপর-নীচে। বিশালদেহী রাঁধুনির কোনও সাড়াশব্দ নেই, বোধহয় ঘুমিয়েই গেছে, কিন্তু লিয়ার চোখে ঘুম নেই। অন্ধকারে চোখ মেলে নির্নিমেষ তাকিয়ে ও ডুবে গেছে ভাবনার সাগরে। রোমন্থন করছে গত কয়েকটা দিনের দম বন্ধ করা টেনশন আর আতঙ্ককর মুহূর্তগুলোর স্মৃতি। ভয়াল যে সময়টা ওরা পার করে এসেছে, তাতে দলটার সব সদস্যই কোনও না কোনও একটা পর্যায়ে ভেঙে পড়েছে, এমনকী মুরল্যান্ডকেও সাবমেরিনটার বিভিন্ন দুর্বলতা দেখে চিন্তিত হয়ে পড়তে লক্ষ করা গেছে। ব্যতিক্রম শুধু এক মাসুদ রানা। অটল তার ধৈর্য আর সহ্যশক্তি, সবকিছুই পাথরের মত শক্ত নার্ভ নিয়ে মোকাবেলা করে যাচ্ছে মানুষটা। শুধুমাত্র ওর কারণে এখনও বেঁচে আছে সবাই, এমনকী এরকম একটা দুঃস্বপ্নের কবল থেকে মুক্তি পাবারও আশা করতে পারছে। কিন্তু রক্তমাংসের একটা মানুষ কী করে পারছে এতকিছু করতে?

লিয়া জানে, যে কোনও পরিস্থিতির সঙ্গে মানুষ মানিয়ে নেয়ার ক্ষমতা পায় পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে। নিজের কথাই ধরা যাক। হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে যোগ দেয়ার পর প্রথম প্রথম দুর্ঘটনাকবলিত রক্তাক্ত রোগীদের ক্ষতগুলো দেখে অজ্ঞান হয়ে যাবার মত অবস্থা হতো ওর। কিন্তু যত সময় গেছে, ধীরে ধীরে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে ওর মন, শিখেছে কীভাবে ওই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়, কীভাবে বীভৎস দৃশ্যগুলো দেখার পরও মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যেতে হয়। কিন্তু রানার ব্যাপারটা কী? একজন মানুষ কী ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এলে আগুন, বোমা বিস্ফোরণ, প্লেন-ক্র্যাশ, তুষারঝড় আর ফ্রেডারিখ কার্নের মত এমন ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নির্বিকার থাকতে পারে? হঠাৎ করেই অকুতোভয় বাঙালি যুবকটার অতীত জানতে খুব ইচ্ছে

হলো লিয়ার। কেমন ছিল সেটা? এর আগে কতবার এভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে রানা? কীভাবেই বা বেঁচেছে? আর ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো... ও কি বিয়ে করেছে? না করে থাকলে গার্লফ্রেন্ড আছে কোনও? তা-ও যদি না থাকে, নেই কেন?

মনে মনে পুলক বোধ করল লিয়া, রানাকে কাছে পেতে ইচ্ছে হলো। দুষ্টু কিশোরীর মত চঞ্চল হয়ে উঠল মন, ধীরে ধীরে কম্বলটা সরিয়ে চুপিসারে বিছানা থেকে নেমে পড়ল ও। কোথাও কোনও শব্দ নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, মুরল্যান্ডের নাক ডাকার শব্দ আসছে পাশের কেবিন থেকে। পা টিপে টিপে দরজা গলে করিডরে বেরিয়ে এল লিয়া। ডানদিকে একটা লাল রঙের লো-পাওয়ারের বালব জ্বলছে দূরে, সেই আলোয় পর্দায় ঢাকা রানার কেবিনের দরজাটার দিকে তাকাল।

রানা কি ওকে ফিরিয়ে দেবে? পারবে নারীত্বের অবমাননা করতে? নিশ্চয়ই না। তবে মানুষটাকে যদ্দূর চিনতে পেরেছে, তাতে মনে হয় না সুন্দরী একটা মেয়েকে রাতের গভীরে বিছানায় পেয়েই খুশিতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। এমন লোকই নয় রানা, মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নেয় না। কো-পাইলট আরসেন মারা গেল যেদিন, সেদিন রাতে ওর বাহুডোরে যখন শুয়েছিল, চাইলে অনেককিছুই করতে পারত রানা, ও-ও বাধা দিত না। কিন্তু না, খাঁটি ভদ্রলোকের মত থেকেছে বোকাটা। আজও হয়তো তেমনই আচরণ করবে—হয়তো পরিস্থিতির দোহাই দেবে, হয়তো বোঝানোর চেষ্টা করবে... কিন্তু কোনও বাধা মানবে না ও। বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে, উত্তেজিত লিয়া সামনে পা বাড়াতে গেল।

'যাচ্ছ কোথাও?'

সিলভিয়ার ডাক শুনে চমকে উঠল লিয়া, হার্ট অ্যাটাক করবে যেন। কোনওমতে নিজেকে সামলে বলল, 'হ্যাঁ, বাথরুমে।'

'ওটা বামদিকে,' নিরাসক্ত গলায় বলল সিলভিয়া।

ধরা পড়ে গেছে! উত্তেজনাটা মরে গেল নিমেষেই. বাথরুমে

একটা চক্কর দিয়ে কেবিনে ফিরে এল লিয়া। বিছানায় উঠে পড়ল।

'ভাল লাগছে এখন?' নীচ থেকে সকৌতুকে জানতে চাইল জার্মান রাঁধুনি।

'না,' একটু রাগের সুরেই বলল লিয়া, মাথার উপর টেনে দিল কম্বলটা।

পরদিন সকাল সাতটায় শোনা গেল প্রথম বিস্ফোরণের শব্দ।

রানা তখন ইউ-বোটের কন্ট্রোল রুমে, চার্ট-টেবিলের উপর রেখে ক্যাপ্টেনের কেবিনে পাওয়া তিনটে পুরনো আমলের অস্ত্র তেল দিয়ে পরিষ্কার করছে। অস্ত্রগুলোর মধ্যে দুটো হচ্ছে এমপি-৪০ স্মাইযার মেশিনপিস্তল আর অন্যটা মাউযার—এটাও পিস্তল, তবে অটোমেটিক নয়। সবই আদ্দিকালের জিনিস, তবে নেড়েচেড়ে মনে হয়েছে, জং-টং পরিষ্কার করে নিলে গুলি করা যাবে ওগুলো দিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা, কেবিনে ওগুলোর অ্যামুনিশন আছে, নষ্ট হয়নি একটা বুলেটও। গত কয়েকদিনে হাতে কোনও অস্ত্র না থাকায় নিজেকে খুব অসহায় লাগছিল, এখন এগুলো খুঁজে পেয়ে ভাল লাগছে। হোক পুরনো, তাও অস্ত্র তো! ফ্রেডারিখ কার্নের সঙ্গে যদি মুখোমুখি হতে যায়, তা হলে কাজে লাগবে ওগুলো।

বিস্ফোরণের আওয়াজে হাতের কাজ থামিয়ে উপরে তাকাল রানা, যেন সাবমেরিনের খোল ভেদ করে বাইরে তাকানোর চেষ্টা করছে। চুপচাপ একটার পর একটা আওয়াজ শুনতে থাকল ও, আর মনে মনে ধারণা করার চেষ্টা করল, কোথায় ফাটানো হচ্ছে বোমাগুলো।

'স্টোরেজ স্পেস... স্লেভ এরিয়া... মাইনিং শাফট...' বিড় বিড় করতে থাকল ও।

মোট সাতটা বিস্ফোরণ ঘটল—ডকেরটা সহ, শেষটা হলো সবচেয়ে প্রলম্বিত। পাথর ভেঙে পড়ার চাপা শব্দ আর ধরিত্রীর

কাঁপুনি অনুভব করা গেল পানির তলাতেও। ওটা সম্ভবত অ্যাকসেস টানেল ধসে পড়ার আওয়াজ, অনুমান করল রানা।

মুরল্যান্ড উদয় হলো দরজায়, এতক্ষণ রেডিও শ্যাকে বসে কমিউনিকেশন সেট আর সোনার ইকুইপমেন্ট মেরামতের ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছিল সে।

'কীসের আওয়াজ?'

'বোমার,' জানাল রানা। 'যাবার সময় এক্সপ্লোসিভ বসিয়ে অ্যাকসেস টানেল আর সবগুলো গুহা ধসিয়ে দিচ্ছে ওরা।'

'পানির নীচেরটা?'

'ওটায় কিছু করেনি বোধহয়। বোমা বসাতে এলে অনেক আগেই দেখে ফেলত আমাদের।'

'এদিকটায় ছাড় দিল কেন?' বিস্মিত গলায় বলল মুরল্যান্ড।

'তেমন গুরুত্ব নেই তো! পানির নীচ দিয়ে কেউ ঢুকলে এখন পাথরের স্তূপ ছাড়া আর কী-ই বা দেখতে পাবে?'

'তা অবশ্য ঠিক। এখন কি তা হলে উঠতে পারি আমরা?'

'উঁহুঁ, আরও পরে। কার্নের দলবল চলে গেছে বটে, কিন্তু বিস্ফোরণের কারণে উপরটা ধুলোবালিতে ভরে থাকবে, এক-আধটা নড়বড়ে পাথরও খসে পড়তে পারে মাথায়। সবকিছু শান্ত হোক, তারপর উঠব।'

'ঠিক আছে।' বলে চলে গেল মুরল্যান্ড।

দু'ঘণ্টা পর পানিতে একরাশ বুদ্‌বুদ্ তুলে ভেসে উঠল প্রাচীন ইউ-১০৬২। আউটার হাল থেকে পানি গড়ানো শেষ হলো না, তার আগেই কোনিং টাওয়ারের ল্যাডার বেয়ে ছুটে গেল জুরকিচ, তাড়াতাড়ি হ্যাচ খুলে মাথা বের করল, ফুসফুস ভরে টেনে নিল মুক্ত বাতাস।

'কেমন লাগছে?'

'স্বর্গের মত,' আবহাওয়াবিদের কণ্ঠে স্বস্তির সুর। 'আসুন না, আপনারাও চলে আসুন।'

সবার সঙ্গে আপার ডেকে বেরিয়ে এল রানাও, সবগুলো ফ্ল্যাশলাইট জ্বেলে তাক করল প্যান্ডোরা গুহার দিকে। যা ভেবেছিল তা-ই, ওদের অতি-চেনা মেইন গ্যালারি বা ছোট চেম্বারগুলোর চিহ্নও নেই। হাজার হাজার টন পাথর আর মাটি এসে ছেয়ে ফেলেছে পুরো জায়গাটা, প্রায় পানি পর্যন্ত এসে পড়েছে সেগুলো। কংক্রিটের পিয়ারটাও নেই, সেখানে থই থই করছে লেগুনের কালচে পানি। চারপাশটা দেখে বোঝারই উপায় নেই, এখানে কোনওকালে মানুষের তৈরি কিছু ছিল।

'চমৎকার কাজ,' স্বীকার করতে বাধ্য হলো রানা, একটুও ফাঁকফোকর নেই কোথাও। সাবমেরিনটা না থাকলে ওদের আর বেরুতে হতো না এই অন্ধগুহা থেকে।

খানিক পর ইউ-বোটের ভিতর ফিরে এল সবাই। স্যাকলিচের রক্তপিপাসু খুনেদের চোখ ফাঁকি দেয়া গেছে, কিন্তু আসল কাজটাই বাকি এখনও—আদিমযুগের এই জলযানটা নিয়ে আঁকাবাঁকা নিমজ্জিত সুড়ঙ্গটা অতিক্রম করা, আর তারপর পাড়ি দেয়া কয়েকশ' মাইল জলপথ। তা হলে যদি পৌঁছানো যায় সভ্যজগতে! অভিজ্ঞতা থেকে জানে রানা—কাজটা সহজ হবে না মোটেও।

•

ষোলো

ইউ-বোটের সংকীর্ণ ব্যাটারি রুমে টানা একটা ঘণ্টা হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর মুরল্যান্ড দিল দুঃসংবাদটা।

'সরি রানা, খারাপ খবর আছে।'

ধোঁয়ায় টকটকে লাল হয়ে যাওয়া চোখ মুছে রানা হালকা

গলায় বলল, 'এ আর নতুন কী? দুঃসংবাদ জিনিসটা তো আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরই অংশ হয়ে গেছে।'

রসিকতার মূডে নেই মুরল্যান্ড। বলল, 'আমি সিরিয়াস। সমস্যাটা গুরুতর।'

'কী হয়েছে, বলে ফেলো।'

'ব্যাটারিগুলোর অবস্থা যা ভেবেছিলাম, তার চেয়েও খারাপ। খুঁজে-পেতে যে ক'টা আমরা চার্জ দেয়ার জন্য আলাদা করেছিলাম, সেগুলোর টেম্পোরারি সিলগুলো থাকছে না একটুও। যে হারে অ্যাসিড ঝরছে, তাতে হিসেব করা রেটের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে ক্লোরিন গ্যাস তৈরি হচ্ছে। দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে, স্নরকেলটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় গ্যাসটা ভেন্ট করে বের করে দেয়ার কোনও উপায় নেই। হ্যাচ বন্ধ করলেই আমরা সবাই বিষক্রিয়ায় মারা যাব।'

চিন্তিত হয়ে পড়ল রানা। 'কতক্ষণ টেকা যাবে বলে মনে করো?'

'যার যার শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা। তবে নিশ্চিত থাকতে পারো, এক ঘণ্টা পর সাবমেরিনটা স্রেফ একটা কফিনে পরিণত হবে।'

'ব্রিদিং অ্যাপারেটাসের ব্যবস্থা করা যায় না? কোনও ধরনের ফিল্টার?'

'হয়তো বানিয়ে নিতে পারব। কিন্তু সেটারও তো একটা সময়সীমা থাকবে। আমাদের মূল সমস্যাটা আরও বড়। যেভাবে লিক হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যাটারি, তাতে বোটের ইলেকট্রিক মোটর পাওয়ার হারাবে খুব দ্রুত। সারাক্ষণ বসে বসে অ্যাসিড ভরতে হবে। গ্যাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে আদৌ কি সেটা করা যাবে বলে মনে করো?'

'ভালই বিপদ দেখছি!' রানা ভুরু কোঁচকাল। 'সমাধান কী তার?'

'যত দ্রুত সম্ভব সারফেসে পৌঁছুতে হবে,' জবাব দিল মুরল্যান্ড। 'হ্যাচ খুলে গ্যাসটা বের করতে পারলে আর অসুবিধে নেই, তখন ইচ্ছেমত ব্যাটারি রিফিল করতে পারব। আচ্ছা, আন্ডারওয়াটার টানেলটা পেরুতে কতক্ষণ লাগবে, বলতে পারো?'

'ক্যাপ্টেনের লগ বলছে দেড় ঘণ্টা।'

'যে কপাল নিয়ে জন্মেছি, তাতে এমনই তো হবে!' খেদোক্তি করল মুরল্যান্ড। 'পাক্কা আধঘণ্টা বেশি! আমি টেনে-টুনে বড় জোর সোয়া একঘণ্টা বিনা রিফিলে চালাতে পারব ব্যাটারিগুলো।'

'এখনই হতাশ হয়ো না,' রানা সাহস জোগাবার চেষ্টা করল। 'স্পিড বাড়িয়ে সময়টা কমপেনসেট করে নেব আমরা। ক্যাপ্টেনের প্লট করা কোর্স আর চার্ট আছে নেভিগেশন রুমে। হিসেব করে বাড়তি স্পিডে টার্নিং পয়েন্টগুলোর নতুন টাইমিং বের করে ফেলতে পারব।'

থিয়োরিটাতে ফাঁক লক্ষ করে মুরল্যান্ড বলল, 'তুমি ভুলে যাচ্ছ—ওই ব্যাটা যখন ক্যালকুলেশন করেছিল, তখন এই বোট প্রজেক্টের বিভিন্ন মালামাল আর পঞ্চাশ জন ক্রু-সহ পুরোপুরি লোডেড ছিল। আমরা এখন মাত্র ছয়জন, তাতে কমপক্ষে একশো টন ওজন কমে গেছে সাবমেরিনটার... ওটা এমনিতেই দ্রুত ছুটবে। তারপরও আর.পি.এম. বাড়াতে পারি আমি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে দ্বিগুণ স্পিড ওঠালেই তুমি দেড় ঘণ্টার রাস্তা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পার হতে পারবে। আঁকাবাঁকা রাস্তায় শুধু গতি বাড়ালে কাজ হয় না, ওভারস্পিডে থাকলে বরং বাঁক ঘোরার সময় অ্যাকসিডেন্ট হয়। আমাদের যেটা করতে হবে, তা হলো—ম্যাক্সিমাম কতটুকু স্পিড নিয়ে বাঁকগুলো পেরুনো যায়, সেটা আন্দাজ করে কোর্স আর টাইমিং প্লট করা। যদি বাঁক নেয়ার সময়টুকু কমাতে পারো, তা হলে আপনাআপনিই ওভারঅল সময়সীমা কমে আসবে।'

'তা হলে কতটা স্পিড বাড়াতে বলছ?'

একটু ভাবল মুরল্যান্ড। 'ওজনের কারণে তো এমনিতেই জোরে যাবো, তারপরেও... ক্যাপ্টেনের হিসেবের চেয়ে হাফ নট বেশি ধরো।'

'হিসেবটা সহজ হবে না,' রানা মাথা নাড়ল।

'তা হলে আমিও আসি,' উঠে দাঁড়াল মুরল্যান্ড। 'নইলে পরে ঘাপলা হলে যাত্রীদের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাওয়াটা বড্ড বিব্রতকর।'

'কীসের ক্ষমা?' রানা অবাক।

'ওই যে... সাবমেরিনটা যখন টানেলের গায়ে গিয়ে বর্শার মত গেঁথে যাবে, তখন আমি বলতে পারব না—*সরি, আমরা একটা টার্ন মিস করেছি!*'

ক্যালকুলেশন করতে দু'ঘণ্টা লাগল, ভুল-ক্রটি আছে কি না, তা চেক করতে আরও ত্রিশ মিনিট। শেষে আড়াই ঘণ্টার মাথায় ডিজেল ইঞ্জিন চালু করল মুরল্যান্ড, লেগুনের ভিতর বৃত্তাকার একটা পথে ঘুরে আন্ডারওয়াটার টানেলের মুখ বরাবর অ্যালাইন করা হলো ইউ-১০৬২-কে। কন্ট্রোল রুমে যার যার পজিশন নিয়ে নিয়েছে সবাই—লিয়া আর সিলভিয়া প্লেইনস্ কন্ট্রোলে, স্যাম পেয়েছে রাডার অপারেটরের পোস্ট, মুরল্যান্ড থাকছে ব্যালাস্ট আর ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রণে, জুরকিচ ক্রু-লুকআউটে আর রানা নিয়েছে ক্যাপ্টেনের জায়গা।

উপর থেকে পেরিস্কোপের রেঞ্জ ফাইন্ডারের রীডিং দেখে পজিশনে আসার রিপোর্ট দিল জুরকিচ, তাকে নেমে আসতে বলল রানা। চার্ট আর ডিভাইডার নিয়ে প্লটিং টেবিলে আছে ও, চোখ বোলাচ্ছে সামনে থাকা জাইরো-কম্পাসে। চার্টে আঁকা কোর্সটার দিকে আরেকবার তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল, ছবিতে নানা রকম আঁক-বাঁক আর বাধা-বিপত্তিতে ভরা টানেলটা দেখা যাচ্ছে। স্বাভাবিক অবস্থায় এটা পেরুনোর কথা ভাবলেই বুক শুকিয়ে যায়, অথচ ওরা যে পদ্ধতি ঠিক করেছে, সেটা স্রেফ পাগলামির সামিল

নিয়তির পরিহাস এটাই যে, জেনে-শুনে পাগলামিটাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হচ্ছে ওদের।

পেরিস্কোপটা সিকিউর করে লুকআউট থেকে নেমে এল জুব্লকিচ, হাবভাবে ক্লস্ট্রোফোবিয়ার ছাপ আছে যদিও, তারপরও সেটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত।

মুরল্যান্ড বলল, 'আমরা রেডি, রানা। গ্যাসটা কিন্তু তৈরি হতে শুরু করেছে, প্রতিটা সেকেন্ড মূল্যবান। তাড়াতাড়ি অর্ডার দিতে শুরু করো।'

'হ্যাঁ,' চার্ট দেখল রানা, সি ফ্লোর ঝপ করে নেমে গেছে টানেলের মুখের কাছে। 'ববি, ষাট মিটার ডেপথ ফিক্স করো। হেলম স্টেডি, প্লেইনস্ নিউট্রাল!' নিজেকে ওর পুরনো আমলের ওঅর মুভির অভিনেতার মত লাগছে অর্ডার দিতে গিয়ে।

ক্রু-রা ঠিকমতই আদেশটা পালন করল অবশ্য। ধীরে ধীরে ডুবতে শুরু করেছে ইউ-বোট, খোলের বাইরে পানির আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল সবাই।

'থামুন, ববি!' ফ্যাদোমিটার দেখে একটু পরই চেঁচিয়ে বলল লিয়া। 'আমরা পৌঁছে গেছি।'

'আরও আগে বলবেন,' বিরক্ত গলায় বলল মুরল্যান্ড। 'থামতে সময় লাগে, এটা জানেন তো?'

'আই, আই, স্যর!' নাবিকদের ভাষায় ইতিবাচক সাড়া দিল লিয়া, তারপর রিপোর্ট দিল, 'ডেপথ সিক্সটি মিটারস্, ক্যাপ্টেন!'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'আমি বলামাত্র নব্বুই আর.পি.এম. দেবে... দশ মিনিটের জন্য।' হাতঘড়ির সময়টা দেখে নিল ও। 'এখন!'

ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল, কচ্ছপের মত আগে বাড়ল প্রাচীন ইউ-বোট। রানা বলে রাখল, 'পাঁচ মিনিট পর দু'ডিগ্রী প্লেইনসের অর্ডার দেব আমি, তোমরা তৈরি থাকো।'

'ইয়েস, স্যর!' সমস্বরে বলে উঠল লিয়া আর সিলভিয়া। বেশ

মজাই পাচ্ছে তারা, বিপদ-আপদের কথা ভুলে নিজেদের সত্যিকার সাবমেরিনার হিসেবে কল্পনা করছে।

মুরল্যান্ডের দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। 'কংগ্রাচুলেশন্স, ববি। কামাল করে দিয়েছ একেবারে। বুড়িটা দেখি সত্যি সত্যি চলছে!'

'ধন্যবাদ দিতে হলে হেলমুট ফিঙ্ককে দাও,' মুরল্যান্ড বলল। 'লোকটা রীতিমত জিনিয়াস ছিল। ওর মত আর দু-চারটে লোক থাকলে জার্মানরা শুধু মেইনটেন্যান্সের জোরেই যুদ্ধ জিতে যেত।'

কিছুক্ষণ পর রানা বো-প্লেন সোজা করে ডেপথ কমাবার নির্দেশ দিল। মুরল্যান্ড জানতে চাইল ট্যাঙ্ক থেকে পানি ভেন্ট করে দেবে কি না, কিন্তু ক্যাপ্টেনের লগ বলছে পুরো ম্যানুভারটা শুধু প্লেনসের সাহায্যে করতে হবে। পাঁচ মিনিট পর টানেলের প্রথম বাঁকে পৌঁছে গেল সাবমেরিন।

'স্যাম, দশ ডিগ্রী ডানে স্টিয়ার করুন,' রানা অর্ডার দিল। 'কখন থামবেন, আমি বলব।'

বাঁকটা তেমন তীক্ষ্ণ নয়, তা ছাড়া চার্ট বলছে এটা প্যাসেজের সবচেয়ে চওড়া জায়গা, তাই বিশেষ ভাবনা-চিন্তা করল না রানা। এখানে কোনও রকম সংঘর্ষের ভয় নেই, বিপজ্জনক অংশগুলো একটু পরে আসবে। কম্পাস দেখে হেডিং আর ঘড়িতে সময় মেলাল ও, তারপর বলল, 'ওকে, এবার সিধে করুন রাডার... আরেকটু... হ্যাঁ।' দম ফেলার জন্য বিরতি নিল না, দ্রুত পরের নির্দেশটাও দিয়ে দিল। 'ববি, আর.পি.এম. বাড়াও—একশো ত্রিশ। দু'মিনিটের মধ্যে একটা কঠিন বাঁক আসছে, সবাই তৈরি থাকো।'

টানেলের ভিতরে বেশ ভালমতই ঢুকে গেছে এখন ওদের ইউ-বোটটা, উল্টো ঘোরার মত প্রশস্ত জায়গা আর নেই, ফলে ফেরার পথ রুদ্ধ। যা-ই ঘটুক, যত সমস্যাই আসুক, অপর প্রান্ত দিয়ে বের হবার চেষ্টা করতে হবে। দেখতে না পেলেও সবাই জানে—খোলের চারপাশে ধীরে ধীরে চেপে আসছে পাথর আর বরফের তৈরি দেয়াল, টানেলের আয়তন কমে আসছে, সংকীর্ণ

জায়গাটার ভিতর দিয়ে কোনও রকম ভুলচুক ছাড়া জলযানটা নিয়ে যেতে হবে ওদের... গতি না কমিয়ে, কারণ ক্লোরিন গ্যাসে ভরে যাচ্ছে ইউ-বোটের ভিতরটা। শ্বাসরুদ্ধকর একটা পরিস্থিতি, টেনশন কুরে কুরে খেতে শুরু করে দিয়েছে অভিযাত্রী দলের প্রতিটি সদস্যকে। কন্ট্রোল রুমে নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে, যন্ত্রপাতির আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, আসলে কথা বলার মত অবস্থায় নেই কেউ।

'স্যাম, সামনে একটা নব্বুই ডিগ্রী কোণ আসছে,' নির্দিষ্ট সময়ে নীরবতা ভেঙে ঘোষণা দিল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি পারেন, আমাদের পোর্টে ঘোরান। কুইক! লিয়া, প্লেনসে দশ ডিগ্রী, আশি মিটার গভীরতায় নিয়ে চলো আমাদের।'

'তার মানে আড়াইশো ফুট,' বলল লিয়া। 'পানির এত চাপ পুরনো খোলটা সইতে পারবে?'

'দেখাই যাক। কথা বাড়িয়ো না। ডু ইট, কুইক!'

স্যাম পাগলের মত বনবন করে হুইল ঘোরাচ্ছে, পোর্ট সাইডে কাত হয়ে গেল সাবমেরিন, একই সঙ্গে নাক ডোবাতে শুরু করল নীচ দিকে—লিয়া আর সিলভিয়া মিলে আশি মিটারে নিয়ে যাচ্ছে ওটাকে। দাঁড়ানো অবস্থা থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল রানা আর জুরকিচ, কোনওমতে চার্ট টেবিল আঁকড়ে ধরে তাল সামলাল। গভীরতা বাড়তে শুরু করতেই সারা দেহ তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল ইউ-বোটের, যেন টাইফুনের কবলে পড়েছে পুরনো আমলের কোনও কাঠের তৈরি পালতোলা জাহাজ। আওয়াজটা শুনে কিলার ওয়েইলের গানের কথা মনে পড়ল রানার—দুটোয় বিস্ময়কর মিল আছে।

'আশি মিটার!' রিপোর্ট দিল সিলভিয়া।

'হোল্ড ইট!' বলল রানা। 'প্লেইনস্ নিউট্রাল।'

'নিউট্রাল!' নির্দেশটা পালন করল লিয়া।

'এই ডেপথ আর হেডিং ধরে রাখো; সোজা একটা প্যাসেজ

পাবো বেশ কিছুক্ষণ। স্যাম, ড্রিফট যেন না হয়...'

কথা শেষ হলো না, তার আগেই কেঁপে উঠল গোটা সাবমেরিন। টানেলের দেয়ালে লেগে গেছে খোলের একটা পাশ, পাথরে লোহা ঘষা খাওয়ার কর্কশ শব্দ শুরু হলো।

'হায়, হায়!' আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করল জুরকিচ. 'হচ্ছেটা কী?'

'স্যাম, স্টারবোর্ডে দু'পয়েন্ট সরিয়ে আনুন আমাদের,' দ্রুত আদেশ দিল রানা। 'ম্যাগনেটিকে আট ডিগ্রীতে হেডিং রাখুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হুইল ঘোরাতে শুরু করল স্যাম। ঘষার শব্দটা কমে এল সঙ্গে সঙ্গে, মিনিটখানেকের মধ্যে আবার নীরবতা ফিরে এল। আটকে রাখা দমটা ছেড়ে একটু ধাতস্থ হলো সবাই।

'এভাবে যাবার চেষ্টা করলে আমরা সবাই মরব, মি. রানা,' ভয়ার্ত গলায় বলল জুরকিচ, ক্লস্ট্রোফোবিয়া আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে তার ভিতরে। 'মা মেরির দোহাই, স্পিড কমান।'

'স্পিড কমালে নির্ঘাত মৃত্যু,' কঠিন গলায় বলল রানা। 'বরং এভাবে গেলে একটা সুযোগ আছে।'

'কীসের সুযোগ? ব্লাইন্ড পাইলটিং করে যেতে হচ্ছে আমাদের, অথচ আপনার ক্যালকুলেশনের ভিত্তি হলো চৌষট্টি বছর আগের একটা লগ। এর মধ্যে কত পরিবর্তন হয়েছে, কে জানে? ম্যাগনেটিক নর্থ সরে গেছে, সাগরের স্রোতের গতি বদলে গেছে...'

'সবগুলো ফ্যাক্টরই মাথায় রেখেছি ববি আর আমি,' রানা বলল। 'প্লীজ দেজান, দয়া করে নিজেকে একটু শক্ত করুন। এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে বিতর্কে নামার অবস্থায় নেই আমি।'

'মরব... আজ নির্ঘাত মরব...' বলতে বলতে মেঝেতে বসে পড়ল জুরকিচ।

সরলরেখার মত প্যাসেজটা ধরে টানা বিশ মিনিট এগোল ইউ-১০৬২। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়ের হিসেব রাখছিল রানা, হঠাৎ কানে ভেসে এল জুরকিচের খক খক কাশি। মাথা তুলতেই

কন্ট্রোল রুমের দরজার কাছে সবুজ ধোঁয়ার একটা হালকা মেঘ চোখে পড়ল—ক্লোরিন গ্যাস। জুরকিচ সম্ভবত বাথরুম থেকে ফিরছিল, দরজা পেরুবার সময় তাকে নাগালে পেয়ে গেছে বিষাক্ত বাষ্প, রানার মনে হলো ভয়ঙ্কর একটা সরীসৃপের মত আবহাওয়াবিদের ছোটখাট গড়নের দেহটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে মেঘটা।

মুরল্যান্ডও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। গলা তুলে বলল, 'দেজান, যতক্ষণ পারেন সহ্য করুন। তারপর ব্রিদিং গিয়ার দেব।' রওনা হবার আগেই মাস্কসহ ছ'টা এয়ার বটল তৈরি করেছে ও। উপযুক্ত ইকুইপমেন্টের অভাবে সেগুলোর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ কম্প্রেসড্ এয়ার ভরা যায়নি, ফলে ব্রিদারগুলোর আয়ুষ্কাল খুব বেশি হবে না, তাই যত দেরিতে ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। ইতোমধ্যে বাকিরাও ক্লোরিনের ঝাঁঝাল গন্ধ পেতে শুরু করেছে, চোখ বাঁচানোর জন্য সবাইকে গগলস পরে নিতে বলল মুরল্যান্ড। ঘড়ি দেখল রানা, আরও পঞ্চাশ মিনিটের মত লাগবে খোলা সাগরে বেরুতে—যদি পারে আরকী। তারপরও টাইমিংটা হবে একেবারে কানের পাশ দিয়ে গুলি যাবার মত, গ্যাসটা খুব দ্রুত বাড়ছে।

'টানেলের ফ্লোর উঠে আসছে দ্রুত,' সবাইকে জানাল ও। 'মেইন ব্যালাস্ট কমিয়ে পঞ্চান্ন মিটারে ওঠো, ববি। একশো ত্রিশ আর.পি.এম.। লিয়া-সিলভিয়া, প্লেইনস্ দশ ডিগ্রী। স্যাম, পর পর কয়েকটা বাঁক আসছে—পোর্ট, স্টারবোর্ড, পোর্ট। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে টার্ন নিতে থাকবেন।'

ইংরেজি 'এস' আকৃতির একটা অংশ সামনেটা, প্রস্থ খুবই কম—তবে কাউকে সেটা বলল না রানা। শুধুমাত্র মনের জোরে ঠিক আছে সবাই, পথের বর্ণনা দিয়ে তাদের নার্ভাস করে ফেলার মানে হয় না।

এসে গেল বাঁক, তুমুল গতিতে প্রথম মোড়টা ঘোরার সময়েই ঘটল বিপত্তি। ইউ-বোটের লেজটা চাবুকের মত বাড়ি খেল

দেয়ালে, কেঁপে উঠল গোটা জলযান। কোর্স কারেকশনের সুযোগ পেল না রানা, দ্বিতীয় মোড়টা এসে গেছে... এই মোড়টাও ঠিকমত ঘুরতে পারল না ওরা, পার হয়ে যেতে যেতে দেয়ালের কোনায় সজোরে আঘাত হানল সাবমেরিনের নাক, ভীষণভাবে ঝাঁকি খেয়ে উঠল ভিতরের সবাই। সিলভিয়া চিৎকার করে উঠল। সংঘর্ষের আওয়াজ এমনভাবে ভিতরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যেন ডুবোজাহাজটা চার্চ বেল... এইমাত্র ঘণ্টা বাজানো হয়েছে।

বো থেঁতলে গেছে সাবমেরিনের, তবে থামল না, প্রবল আক্রোশে পাথরের দেয়াল ভেঙেচুরে বেরিয়ে গেল। দেয়ালের খণ্ড-বিখণ্ড খোলের গায়ে বৃষ্টির মত নেমে আসার শব্দ শুনে শিউরে উঠল রানা, ফাটল ধরলেই মরেছি! ঝাঁকি খেয়ে পড়ে গেছে ও, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কয়েক মিনিটের ভিতর 'এস'-এর শেষ বাঁকটা এসে যাচ্ছে, প্রয়োজনীয় কারেকশন্ দিয়ে নিতে হবে। এমন আরেকটা সংঘর্ষ হলে আর বাঁচতে হবে না ওদের।

কিন্তু কোর্সে সংশোধন দেবে কী, চার্ট অনুসারে দ্বিতীয় বাঁকটায় তো সংঘর্ষ হবার কথাই না! প্রথমটার সময় চ্যানেল একটু সরু ছিল, কিন্তু পরের বাঁকে তো সেটা অনেক প্রশস্ত হয়ে যাবার কথা। রানার সন্দেহ হলো, ভুলটা স্যামের—ঠিকমত স্টিয়ার করতে পারেনি সে। কিন্তু এই ভুলটা শুধু যে দেয়ালে বাড়ি খাবার মধ্যে সীমিত, তা নয়। সংঘর্ষে ওরা কতটুকু অফ-কোর্সে সরে এসেছে, বলার উপায় নেই। দাঁতে দাঁত পিষল রানা, এবার পুরোপুরি জুয়া খেলতে হবে ভাগ্যের সঙ্গে। অনুমানের উপর নিতে হবে মোড়টা, একটুও যদি ভুল হয়, তা হলে মুরল্যান্ডের ভাষায় "বর্শার মত" গেঁথে যাবে টানেলের দেয়ালে।

'স্যাম, অ্যালার্ট থাকুন... আপনার কাজটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ,' বলল রানা, বকাঝকা দেয়াটা উচিত হবে না বুঝতে পেরে ইঙ্গিতে হেলমসম্যানকে আরেকটু সতর্ক হতে নির্দেশ দিচ্ছে 'আপনি ডান-হাতি না বাঁ-হাতি?'

বাম হাত তুলে দেখাল স্যাম। হুঁ, তা হলে সম্ভবত একটু বাঁয়েই সরিয়ে নিয়ে গেছে জাহাজটাকে। 'দুই পয়েন্ট স্টারবোর্ডে আসুন।'

গ্যাস বেড়ে গেছে, কন্ট্রোল রুমের মেঝেতে গোড়ালি ছাড়িয়ে উঠে এসেছে ক্লোরিন-বাষ্প, বাতাসের চেয়ে ভারী বলে জমা হচ্ছে নীচে, পাক খেতে থাকা মেঘটার রঙ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি গাঢ়। সবাইকে ব্রিদার ব্যবহার করার নির্দেশ দিল রানা, তারপর বলল, 'স্যাম, আমাদের নেক্সট হেডিং কিন্তু পোর্ট সাইডে—একশো ত্রিশ ডিগ্রী ম্যাগনেটিক। মোড় নেয়ার জন্য জায়গা দরকার, স্টারবোর্ডে তিন ডিগ্রী সরে এক মিনিট যান, তারপরই একটা মোচড় মারবেন নতুন হেডিংটায়—ঠিক আছে?'

মুখে মাস্ক থাকায় কথা বলতে পারল না, তবে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল স্যাম।

কপাল থেকে ঘাম ঝরছে রানার, জায়গা পাবার জন্য স্টারবোর্ডে যে যেতে বলল, তাতে একটা বড় ঝুঁকি আছে। যদি ইতোমধ্যেই ডুবোজাহাজটা ডানের দেয়ালটার কাছাকাছি হয়ে থাকে, তা হলে তিন ডিগ্রী সরানো মাত্র ছয় নট বেগে সোজা টানেলের গায়ে গিয়ে বাড়ি খাবে ওরা। ব্যাপারটা মুরল্যান্ডও বুঝতে পেরেছে, বন্ধুর দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাকাল সে। মাস্ক সরিয়ে নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়ল রানা, 'প্রার্থনা করো।'

'ইন পজিশন!' মাস্কের ফাঁক দিয়ে জানাল স্যাম।

'টার্ন! টার্ন!!' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল রানা।

বনবন করে হুইল ঘোরাতে লাগল স্যাম, বাকিরা সবাই যে যা পারল খামচে ধরল। কাউকে বলে দিতে হয়নি, সংঘর্ষের আশঙ্কায় কাজটা নিজ থেকেই করছে তারা।

ভাগ্য এবার প্রতারণা করল না ওদের সঙ্গে, প্রায় নিখুঁতই হয়েছে রানার আন্দাজ, বিনা সংঘর্ষে ঘুরতে পারল ইউ-বোট। তবে লেজটা পিছনের দেয়ালের আট ফুটের মধ্যে এসে গেল,

প্রপেলারের ছুঁড়ে দেয়া তীব্র গতির পানি নিরেট পাথরে বাড়ি খেয়ে সহস্র বুদ্‌বুদ্‌ হয়ে ফেটে গেল, উল্টোদিকে এসে ঘিরে ফেলল গোটা খোলকে। কন্ট্রোল রুমে বসে শব্দটা শুনে মনে হলো, চারপাশে কোটি কোটি ড্রাম বাজছে। রেসিং কারের মত প্রচণ্ড বেগে মোড় নেয়ায় ভারী ক্লোরিন গ্যাস একপাশের বাল্কহেডে চড়ে বসেছে, তবে খানিক পরেই মেঝেতে এসে স্থির হলো।

চার্টের দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল রানা, টানেল সামনে নেমে গেছে হঠাৎ করে, সত্তর মিটারে নামতে হবে ওদের, নইলে সোজা গিয়ে আছড়ে পড়বে ছাদের গায়ে!

'ডাইভ, ববি, ডাইভ!' উন্মাদের মত চেঁচিয়ে উঠল ও। 'প্লেইনস্‌ ম্যাক্সিমাম!'

প্রশ্ন করল না মুরল্যান্ড, যত জোরে পারে ভালভ ঘুরিয়ে ব্যালাস্টে পানি ভরতে শুরু করল, লিয়া আর সিলভিয়া গায়ের জোরে লিভার ঠেলছে—বো'তে লাগানো ডানাগুলোকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে শেষ সীমা পর্যন্ত।

ক্র্যাশ করার ভঙ্গিতে বিপজ্জনকভাবে নাক নেমে গেল ইউ-বোটের, ভিতরের আগা থেকে লেজ পর্যন্ত ঝনঝন শব্দে কেঁপে উঠল—ছুটো-ছাটা যা জিনিসপত্র আছে, সব যার-যেমন-খুশি আছড়ে পড়ছে ডেকের উপর। হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়ে যাচ্ছিল রানা, মাথার উপর দিয়ে চলে যাওয়া একটা পাইপ ধরে ঝুলে পড়ল, জুরকিচ তার আগেই মেঝেতে গড়াতে শুরু করেছে।

তবে শেষ রক্ষা হলো না, সাবা দেহ বেঁচে গেলেও সাবমেরিনের কোনিং টাওয়ার গিয়ে আঘাত করল ঢালু হতে থাকা টানেলের পাথুরে ছাদে। ইস্পাত ছেঁড়ার গগনবিদারী আওয়াজ হলো, ভেঙেচুরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে পেরিস্কোপসহ টাওয়ারের উপরের অংশ। অবিরাম ঝাঁকুনিতে প্রাচীন ডুবোজাহাজটার প্রতিটা নাটবল্টু আর্তনাদ করছে। ফোকর দিয়ে পানি ঢুকে ভরিয়ে ফেলল সেইলের অ্যাটাক সেন্টার—মাঝখানে ওয়াটারটাইট হ্যাচটা না

থাকলে পুরো খোল ভরে যেত নোনা পানিতে।

ফ্যাদোমিটার দেখে রক্ত ছলকে উঠল রানার, সোজা গিয়ে সি-বেডে টর্পেডোর মত আঘাত হানতে যাচ্ছে ওরা। 'প্লেইনস্ নিউট্রাল... প্লেইনস্ নিউট্রাল!!' উত্তেজনায় গলার স্বর চড়ে গেছে ওর।

এই মহাবিপদেও নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায়নি লিয়া বা সিলভিয়া। অর্ডারটা পেতেই যা দেরি, সর্বশক্তিতে টানতে শুরু করল লিভার—নাকটা তোলার প্রাণান্তকর চেষ্টা।

গভীরতা-নির্দেশক ডায়ালটার দিকে তাকাতেই বুকের ভিতর খামচে ধরছে কী যেন, টানেলের তলা যেন লাফ দিয়ে উঠে আসছে উপরে। দুই প্লেইনস্-উওম্যানের চেষ্টায় কাজ হচ্ছে অবশ্য, ধীরে ধীরে তলদেশের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে আসছে ইউ-১০৬২, কিন্তু সময় নিচ্ছে অসম্ভব বেশি। প্রতি সেকেন্ডে বেড়ে যাচ্ছে গভীরতা, যে কোনও মুহূর্তে তলায় আছড়ে পড়তে পারে ওদের ডুবোজাহাজ। ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হলো ছয় আরোহীর, সৃষ্টিকর্তার নাম জপতে শুরু করল কেউ কেউ।

কিন্তু এত সহজে হার মানতে রাজি নয় লিয়া, সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিলভিয়া, অন মাই মার্ক। ওয়ান, টু... থ্রী!' শেষবারের মত প্রচণ্ড শক্তিতে লিভার ধরে টান দিল দুজনে।

এইবার হলো কাজ। সাড়া দিয়ে উঠল পুরনো সাবমেরিনটা, নাক তুলে ফেলল উপরদিকে। টানেলের তলদেশের কয়েক ফুট বাকি থাকতে সাঁই করে ধনুকের মত একটা পথে উপরে উঠে গেল।

আশি মিটারের প্ল্যান করা গভীরতায় পৌঁছে হাঁপ ছাড়ল রানা, পাইপ ছেড়ে ডেকে পা রেখে হাততালি দিয়ে উঠল। 'একসেলেন্ট জব, গার্লস। এই ডেপথটাই হোল্ড করো।'

মুরল্যান্ডের চেহারায়ও প্রশংসা। 'মেয়েরা যে এত ভাল সাবমেরিনার হতে পারে, আমার কল্পনাতেও ছিল না।'

কম্পাসের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল রানা। বলল, 'আমাদের স্যাম ভায়াও তো কেরামতি দেখিয়ে ফেলেছে দেখছি। এই নরক-গুলজারের মধ্যেও কোর্স ঠিক রেখেছে! নাহ্, ক্যাপ্টেন হিসেবে আমার ক্রুদের নিয়ে আমি গর্ব বোধ করছি।'

লাজুক হাসি হাসল স্যাম।

'ববি, ড্যামেজ রিপোর্ট,' হাসি-ঠাট্টা থামিয়ে আবার সিরিয়াস হয়ে উঠল রানা।

'যদ্দূর মনে হচ্ছে, কোনিং টাওয়ারটা গেছে। ব্যালেন্স নিয়ে ঝামেলা পোহাতে হবে।'

'লিয়া-সিলভিয়া, তোমাদের উপর নির্ভর করছে ব্যাপারটা।'

'নো প্রবলেম। আশা করি হ্যান্ডেল করতে পারব,' জানাল জার্মান রাঁধুনি।

ক্লোরিন গ্যাসটা প্রায় কোমর পর্যন্ত উঠে গেছে, ধরাধরি করে মুরকিচকে দাঁড় করাল রানা আর মুরল্যান্ড। আবহাওয়াবিদের অবস্থা সঙ্গীন, ঘন ঘন এয়ার বটল থেকে শ্বাস নিচ্ছে, ডাক্তারি ভাষায় একে হাইপার-ভেন্টিলেটিং বলে।

'পোস্ট নাও,' মুরল্যান্ডকে বলল রানা। 'দেজানকে আমি দেখছি।'

চার্ট দেখে নিল ও। আর মাত্র একটা অবস্ট্যাকল পাড়ি দিতে হবে ওদের—টানেলের মাঝখানে গজিয়ে ওঠা পাহাড়ের মত একটা চূড়া। ওটা পার হবার পর ফাঁকা রাস্তায় আরও পনেরো মিনিট ছুটতে পারলেই খোলা সাগর। এতটা সময় পাওয়া যাবে কি?

ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বিচার করল রানা। বিষাক্ত গ্যাসটা বিপজ্জনক মাত্রায় বেড়ে গেছে। সবচেয়ে সুস্থ অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও ওর নিজের নাকমুখ জ্বালাপোড়া করছে, বমি উঠে আসতে চাইছে পেট থেকে। এয়ারবটলে খুব বেশি বাতাস অবশিষ্ট নেই, অথচ জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে সবচেয়ে কম ব্যবহার করেছে ও-ই। তারমানে বাকিদেরগুলো আর অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে,

সবার আগে জুরকিচেরটা। ঘড়ি দেখল রানা—যে গতিতে যাচ্ছে, তাতে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আবহাওয়াবিদকে হারাতে চলেছে ওরা, সেই সঙ্গে হয়তো মেয়েদুটোকেও। স্যামও টিকবে কি না সন্দেহ।

একটাই উপায় আছে সবাইকে বাঁচাবার, তবে সেটা আত্মহত্যার শামিল। অনেক ভেবেও কোনও বিকল্প দেখতে পেল না। শেষে ওটাই করবে বলে ঠিক করল। চার্টের দিকে তাকিয়ে সম্পূর্ণ অনুমানের উপর নতুন একটা কারেকশন দিল।

'ববি, ম্যাক্সিমাম রেভল্যুশন!' সিদ্ধান্ত নেয়ার ভঙ্গিতে বলল রানা।

আদেশটা শুনে বিস্ময়ে সবার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। রানা ইউ-বোটের সর্বোচ্চ গতি নিয়ে শেষ দূরত্বটা পেরুতে চাইছে!

মাথা ঝাঁকাল মুরল্যান্ড, সিদ্ধান্তটার কারণ বুঝতে পারছে। প্যানেলের উপর উড়ে বেড়াল ওর হাত, কয়েক মিনিটের মধ্যেই ট্যাকোমিটারে ইঞ্জিনের আর.পি.এম দুশো বিশে গিয়ে ঠেকল। ডুবোজাহাজের দুরন্ত গতি অনুভব করা গেল এই কন্ট্রোল রুমের ভিতরে বসেও।

'আমি সিগনাল দিলেই ত্রিশ মিটারে উঠিয়ে আনবে জাহাজটাকে,' ক্রু-দের বলে দিল রানা, নিষ্কম্প কণ্ঠস্বর। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে শান্ত রেখেছে ও, কারণ ঝুঁকিটা খুব ভাল করেই জানে—যেভাবে মাত্রাছাড়া গতিতে যাচ্ছে, তাতে একশো ফুট উঁচু ডুবোপাহাড়টা পেরুনো অসম্ভব কঠিন, পরপর দুটো নিখুঁত টাইমিং প্রয়োজন হবে ওদের—প্রথমটা ঢালের গোড়ায়, পরেরটা চুড়োয় পৌঁছুনোর পর। হিসেব একটু উনিশ-বিশ হলেই শেষ—হয় ঢালের গায়ে আছড়ে পড়বে, নয়তো টানেলের ছাদে গিয়ে বাড়ি খাবে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে টাইমিং মিলিয়ে নিল রানা। চেঁচাল, 'টেন ডিগ্রী আপ অন প্লেইনস্... এখন!'

আগের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে ক্যালকুলেশনটা করেছে

রানা, এবার তাই কোনও বিপদ হলো না—ভাগ্যেরও সহায়তা পেল। চোখের পলকে উপরে উঠতে শুরু করল ইউ-বোট, ডুবোপাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো ঢাল থেকে কমপক্ষে দশ ফুট পার্থক্য থাকল সর্বক্ষণ, ত্রিশ মিটারের দূরত্বটা পেরিয়ে এল নিমেষে। ঊর্ধ্বগতি থামিয়ে ওরা যখন সোজা সামনে ছুটছে, তখন টানেলের ছাদ চল্লিশ ফুট উপরে। রানার জুয়াটা ওদের প্রায় দশ মিনিট সময় বাঁচিয়ে দিয়েছে।

সাবমেরিন তীরবেগে ছুটছে টানেলের সাগরমুখী একজিটের দিকে। মুরল্যান্ড জানাল, সারফেস হবার সঙ্গে সঙ্গে খোলের ভিতর কম্প্রেসড্ এয়ারের একটা প্রবাহ বইয়ে দেবে ও, যাতে দ্রুত গ্যাসটা বেরিয়ে যায়। ভিতরের প্রেশার ওঠানামা করবে, সবাইকে সেজন্য তৈরি থাকতে বলল।

চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করেছে রানা, একেকবার দম নিতে গিয়ে জ্বলে যাচ্ছে বুকের ভিতরটা। জুরকিচ ইতোমধ্যে অজ্ঞান হয়ে গেছে, এরপর সম্ভবত লিয়ার পালা। মেয়েটাকে মাতালের মত দুলতে দেখে নিজের এয়ার বটলটা বাড়িয়ে দিল রানা, বিশুদ্ধ বাতাস টেনে নিতে দিল।

'ববি! আর সম্ভব না। সারফেস! সারফেস!!'

মাথা ঝাঁকিয়ে ভালভ খুলে দিল মুরল্যান্ড, মেইন ট্যাঙ্ক থেকে পানি বের করে বাতাস ভরে দিচ্ছে। দিক বদলে গেল ইউ-বোটের, নাক উঁচু করে সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে ছুটছে।

'আর একটু... আর একটু...' নিজের অজান্তেই ফিসফিস করল রানা, মনকে প্রবোধ দিচ্ছে। লিয়ার কাছ থেকে ব্রিদারটা নিয়ে বাতাস টানার চেষ্টা করল, কিন্তু ওটা একেবারে শূন্য। মাথার ভিতর কী যেন বিস্ফোরিত হতে চাইছে, চরম মুহূর্তটার জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলল ও।

ঠিক তক্ষুণি লাফ দিয়ে পানি ভেদ করে বেরিয়ে এল সাবমেরিন, নাক উঁচু অবস্থা থেকে ঝাঁকি খেয়ে সমান্তরাল অবস্থায়

চলে এল। ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনল রানা, মুরল্যান্ড কম্প্রেসড় এয়ার ছেড়েছে। খোলে ঢেউয়ের বাড়ি খাওয়ার শব্দটা আগে কখনও এত মধুর লেগেছে কি না, মনে করতে পারল না।

টলতে টলতে ল্যাডার বেয়ে উঠল রানা, হুইল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল এস্কেপ হ্যাচ। প্রবল গর্জনে বেরুতে শুরু করল ভিতরের কম্প্রেসড় এয়ার, সঙ্গে জমে থাকা সবুজ গ্যাস পাক খেয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ফাঁকা পেয়ে অঝোর ধারায় নেমে এল ভাঙা কোনিং টাওয়ারে আটকে থাকা পানি, ওকে ভিজিয়ে দিল।

চোখ খুলেছে জুরকিচ। 'আমরা... আমরা বেঁচে আছি?'

হেসে উঠল রানা। 'শুধু বেঁচে নই, বহাল তবিয়তে আছি।' ল্যাডার ছেড়ে নেমে গেল ও। 'আসুন দেজান, সূর্যের আলোটা সবার আগে আপনারই প্রাপ্য।'

চেহারায় খুশির ভাব ফুটিয়ে উঠে দাঁড়াল আবহাওয়াবিদ। মুক্তি পাবার আনন্দে সবাই হাসছে, যোগ দিল সে-ও। তারপর দৌড়ে ছুটে গেল ল্যাডারের সামনে, হ্যাচ গলে উপরে উঠে গেল। হাসিমুখে সবাইকে নিয়ে রানাও তাকে অনুসরণ করল।

ভাঙা কোনিং টাওয়ারে উঠে এল অভিযাত্রীরা। বুক ভরে টেনে নিল তাজা বাতাস, গায়ে মাখল নির্মল রোদ। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। আর তখনই শুরু হলো নতুন বিপদটা।

চমৎকার পরিবেশটাকে বিদীর্ণ করে দিয়ে বৃষ্টির মত ছুটে এল গুলি, বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হতে শুরু করল ইউ-১০৬২-র বুড়ো শরীর। গুলির ঘষায় চারপাশে ফুলকি উঠছে, ছিটকাতে শুরু করেছে ভাঙা ইস্পাতের টুকরো... ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, মূর্তির মত জমে গেল ওরা, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

জুরকিচের কপালে ছিটকে যাওয়া এক টুকরো লোহা এসে আঘাত করতেই চমক ভাঙল ওদের। ভাঙা অ্যাটাক সেন্টারের ডেকের উপর উল্টে পড়ে গেল আবহাওয়াবিদ, ক্ষত থেকে রক্ত গড়াতে শুরু করেছে।

'গেট ডাউন!' রানা চেঁচাল। 'গেট ডাউন, এভরিবডি!'

মাথা নামিয়ে আহত আবহাওয়াবিদকে খোলের ভিতর নিয়ে এল ওরা, রানা ছুটল কেবিনের দিকে। একটু পরেই আবার উদয় হলো ও, হাতে দুটো লোডেড মেশিন পিস্তল, কোমরে স্পেয়ার ক্লিপ। ওকে দেখে অবাক হয়ে গেল লিয়া—বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা জড়তা নেই বাঙালি যুবকটার মধ্যে, যেন সাক্ষাৎ নরক পাড়ি দিয়ে আসার পর স্বস্তির বদলে এমন একটা হামলাই আশা করা উচিত।

কোনও কথা না বলে মুরল্যান্ডের বাড়ানো হাত লক্ষ্য করে একটা এমপি-৪০ ছুঁড়ে দিল রানা। ল্যাডার বেয়ে দুজনে উঠে গেল উপরে।

সতেরো

রোটরের ধাক্কায় ভূমি থেকে পাক খেয়ে ওঠা তুষারের মেঘের মাঝখানে ল্যান্ড করল জিয়ো-রিসার্চের বেল জেটরেঞ্জার ৪১৪ হেলিকপ্টারটা। একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ, স্নো-ক্যাট আর কার্গো স্লেজ ঢাকা পড়ে গেল উড়তে থাকা সেই তুষারের আড়ালে, কপ্টারের পাখাগুলোর ঘূর্ণন বন্ধ হবার পরও বেশ কিছুক্ষণ ভাসতে থাকল পেঁজা তুলোর মত।

কাজ শেষে ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য অপেক্ষা করছে পুরো দলটা। সমস্ত প্যান্ডোরা বক্স তুলে ফেলা হয়েছে কার্গো স্লেজে, ইস্পাতের নেট আর ওয়্যারের বাঁধনে রোটরস্ট্যাটের লিফট-অফের জন্য তৈরি। শুধুমাত্র ছোট আকারের বাক্সটা... যেটা মৃত ইঞ্জিনিয়ারের কাছে ছিল... সেটা আলাদা রাখা হয়েছে। পাহাড়ের গোড়ায় এয়ার

শাফটটার চিহ্নও নেই, অ্যান্টিচেম্বারের ফাঁকা জায়গাটা এখন বরফ আর পাথরের চাঁইয়ের দখলে। ডিনামাইট দিয়ে ধসিয়ে দেয়া হয়েছে সব।

একটা স্নো-ক্যাটে বসে আছে ইয়োহান শ্নাইডার, ভিতরটা শব্দ নিরোধক বলে হেলিকপ্টারটার আসার শব্দ শুনতে পায়নি সে, এখন ওটাকে ল্যান্ড করতে দেখে ভুরু কুঁচকে গেল। এখানে কপ্টারটার কোনও কাজ নেই, এসেছে কেন? কারণটা পরিষ্কার—ফ্রেডারিখ কার্ন বাক্সভর্তি ভয়ঙ্কর পদার্থগুলো নিজের দখলে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। অ্যাকসেস টানেলে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বেরিয়ে আসার পর গত আড়াই ঘণ্টার হিসেবে দশমবারের মত স্নো-ক্যাটের পিছনটায় তাকাল ইয়োহান, প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে সেখানে জিয়ো-রিসার্চ দলের অস্ত্র-শস্ত্রগুলো গানকেসে ভরে রাখা হয়েছে। কার্ন আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা এখন নিরস্ত্র। হাতের গ্লাভ খুলে স্নো-সুটের পকেটে হাত দিল ইয়োহান, শক্ত করে আঁকড়ে ধরল নিজের পিস্তলের বাটটা। ওটা নিয়ে আইসল্যান্ডে ঢুকতে কোনও অসুবিধেই হয়নি, কর্পোরেট জেটের আরোহীদের নিয়ে কখনওই মাথা ঘামায় না এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি।

দরজা খুলে নেমে এল ইয়োহান। হালকা বায়ুপ্রবাহ আছে, তবে বাতাসটা একদম পরিষ্কার... ধুলোবালিমুক্ত—জার্মানির শহুরে এলাকায় এটা কল্পনাও করা যায় না। পা বাড়াল সে, কার্ন দাঁড়িয়ে আছে একটু সামনে—থেলমা আর নুয়েনডর্ফের সঙ্গে মাথা নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। আকাশে একটা কালো ছায়া... চোখ তুলতেই অতিকায় রোটরস্ট্যাটটাকে উদয় হতে দেখল ইয়োহান, খাঁড়িটাকে বেষ্টন করে থাকা পর্বতমালার ফাঁক দিয়ে এগিয়ে আসছে। আর্কটিকের ম্লান সূর্য আর বিবর্ণ আকাশের পটভূমিতে ওটাকে অপার্থিব বস্তুর মত লাগছে—যেন মানুষ নয়, বাহনটা কোনও পৌরাণিক দৈত্য-দানবকে বহন করলেই বেশি মানাত। অবিশ্বাস্য আকৃতির এয়ারশিপটার তুলনায় ল্যান্ড করে থাকা হেলিকপ্টারটাকে

স্রেফ ছোট্ট একটা ফড়িঙের মত মনে হচ্ছে।

একেবারে মাথার উপর এসে থামল রোটরস্ট্যাট, ইঞ্জিন-পডগুলো ঘুরে সমান্তরাল থেকে আনুভূমিক হয়ে গেল, ধীরে ধীরে নামিয়ে আনছে আকাশযানটাকে।

কার্নের দিকে এগিয়ে গেল ইয়োহান। 'ফ্রেডারিখ, হেলিকপ্টারটা এখানে কী করছে?'

বসের দিকে ফিরল কার্ন। 'রোটরস্ট্যাটটা এখানে মুরিং মাস্ট ছাড়া ল্যান্ড করতে পারবে না। বাতাসেই ভেসে থাকবে ওটা, আমরা কেবল দিয়ে কার্গো স্লেজটা ঝুলিয়ে দেব ওটার তলায়, তারপর কপ্টারে করে পিছু পিছু যাব, বাক্সগুলোর ডাম্পিং দেখতে।'

'না!' রাগী গলায় বলল ইয়োহান, কার্নের ছলচাতুরিতে সায় দেয়ার সময় পেরিয়ে গেছে। 'পানিতে ফেলার আগ পর্যন্ত বাক্সগুলো আমি নাগালের বাইরে যেতে দেব না। আমরা সবাই রোটরস্ট্যাটে উঠছি!'

'ইয়োহান,' কার্নের গলা আশ্চর্য রকম শান্ত, 'বললাম তো, ওটা মুরিং মাস্ট ছাড়া এখানে ল্যান্ড করতে পারবে না। বাক্সগুলো সাগরে ফেলাই তো আসল কথা, তাই না? আমরা কপ্টারে থাকলাম, না এয়ারশিপের গন্ডোলায় থাকলাম—তাতে কী এসে-যায়?'

লোকটার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছে ইয়োহান, সবকিছুর পিছনে সুন্দর যুক্তি বের করে ফেলে। প্লেনভরা মানুষ মারার পরও সে চমৎকার একটা কারণ দেখিয়ে দিয়েছিল। রোটরস্ট্যাটটাকে স্যাটানস্ ফিস্ট নিয়ে আলাদা রওনা করিয়ে দেবারও যে একটা অজুহাত খাড়া করে ফেলবে, তা আর বিচিত্র কী!

এয়ারশিপটা ইতোমধ্যে নেমে এসেছে অনেকদূর, ইঞ্জিনের আওয়াজে কানে তালা লেগে যাবার জোগাড়, একজস্টের তীব্র বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে তুষার। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, সময় নেই একদম। ঝট করে পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে

ফেলল ইয়োহান, তাক করল স্পেশাল প্রজেক্টস্ ডিরেক্টরের দিকে।

'যথেষ্ট হয়েছে, ফ্রেডারিখ! আর তোমাকে আগে বাড়তে দিচ্ছি না আমি। এয়ারশিপের পাইলটকে বলো আমাদের তুলে নিতে...'

কথা শেষ করার আগেই ব্যথায় কাতরে উঠল স্যাকলিচের প্রেসিডেন্ট, পিস্তলটা উড়ে চলে গেছে দশ ফুট দূরে। চরম অবিশ্বাসে প্রথমে মচকে যাওয়া কবজি, তারপর কার্নের দিকে তাকাল সে, লোকটার মুখে হালকা একটা হাসির রেখা—কীভাবে এত দ্রুত একটা লাথি ছুঁড়েছে সেটাই আশ্চর্য।

ভুরু নাচাল ধুরন্ধর নিয়ো-নাৎসি, প্রতিপক্ষকে পিস্তলটা তোলার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। চারপাশে তাকাল ইয়োহান, প্যান্ডোরা গুহা খালি করার কাজে আসা ওয়ার্কারদের সবার হাতেই একটা করে পিস্তল বা অ্যাসল্ট রাইফেল উদয় হয়েছে—স্নো-ক্যাটের পিছনে রেখে দেয়া অস্ত্রগুলোই এদের একমাত্র সম্বল ছিল না, ইচ্ছে করেই তাকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। চরম সত্যটা হঠাৎ বুঝতে পারল সে—এখানকার একটা মানুষও স্যাকলিচের অনুগত নয়, এরা সব কার্নের নিজস্ব লোক।

এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল কার্ন। বলল, 'হাল ছেড়ে দিলে? হাঃ হাঃ হা!!' বিদ্রূপ প্রকাশ পেল তার বলার ভঙ্গিতে। 'আমাকে থামানোর চেষ্টা করায় তোমাকে দোষ দিতে পারছি না, ইয়োহান। বরং চেষ্টা যদি না করতে, তা হলেই অবাক হতাম।' ঝুঁকে পিস্তলটা তুলে নিল সে, থেলমাকে রাখতে দিল।

বোকা নয় ইয়োহান, সাময়িকভাবে পরাজয়টা মেনে নিল। বলল, 'বাক্সগুলো নিয়ে তুমি কী করবে, ফ্রেডারিখ? ওগুলো কোনও কাজে লাগাতে পারবে না। এমন আনস্টেবল এলিমেন্ট দিয়ে বোমা বানানো সম্ভব নয়।'

'কে বলল আমি বোমা বানাতে চাই?' হাসল কার্ন। 'হিটলারও চায়নি। তার প্ল্যান ছিল ভি-টু রকেটে ভরে উল্কাপিণ্ডের ছোট ছোট কয়েকটা টুকরো লন্ডনের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেবার। কেউ

কিচ্ছু বুঝতে পারত না, তখনকার হিসেব অনুসারে মাত্র ছ'টা রকেট শহরটার অ্যাটমোস্ফিয়ারে ফাটালে দু'মাসের ভিতর গোটা লন্ডনের প্রতিটা জীবিত প্রাণীকে মেরে ফেলা যেত। চমৎকার প্ল্যান, তাই না? প্যান্ডোরা গুহায় দুর্ঘটনা ঘটায় ওটা আর কাজে লাগানো যায়নি। কিন্তু এখন আমাকে বাধা দেবে কে? স্যাটানস্ ফিস্ট দিয়ে সারা দুনিয়ার যে কোনও জায়গায় হামলা চালাতে পারি, বিশ্বযুদ্ধে হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নিতে পারি, এমনকী একটু-আধটু বিক্রি করে টাকাও কামাতে পারি... এমন সুযোগ কে ছাড়ে, বলো?'

'সবকিছু নিজের জন্য ভাবছ... তা হলে তোমার সাধের পার্টির কী হবে?' ভর্ৎসনা করল ইয়োহান।

দাম্ভিক সুরে বলল কার্ন, 'ওরা সব অপদার্থের দল। আমিই হতে যাচ্ছি ফ্যাসিবাদের ভবিষ্যৎ, হিটলারের আদর্শ উত্তরসূরি। আমার দলই হবে আসল নিয়ো-নাৎসি। বুঝলে?'

'এখন তা হলে কী করবে আমাকে নিয়ে?' জানতে চাইল ইয়োহান। 'বাকিদের মত মেরে ফেলবে?'

'না, ডিয়ার ইয়োহান,' হাসল কার্ন। 'স্যাকলিচ কর্পোরেশনের প্রেসিডেন্ট বিদেশ-বিভুঁইয়ে মারা গেলে লোকে সন্দেহ করে বসবে না? যত কিছুই হোক, তুমি হলে রীতিমত হোমড়া-চোমড়া মানুষ, মরে গেলে হাজার রকমের তদন্ত হবে। আর এই গ্রিনল্যান্ডে তদন্ত হলে আমাদের সমস্ত গোমর ফাঁস হয়ে যেতে পারে—সেটা কি ঠিক হবে? না ইয়োহান, সেজন্য আয়ু একটু বাড়ছে তোমার। জার্মানিতে নিয়ে গিয়ে তোমার পাকা ব্যবস্থা করব আমি।'

'হাসুন, মি. শ্লাইডার,' বলল থেলমা। 'জন্মভূমির মাটিতে মরবেন... কত বড় সৌভাগ্য, তাই না!'

একঘণ্টা পর পেটের নীচে স্যাটানস্ ফিস্টের ভারী বোঝাটা ঝুলিয়ে রওনা হলো রোটরস্ট্যাট, বেল হেলিকপ্টারটা সেটাকে অনুসরণ করছে। পাইলট ছাড়াও পিছনে বসে আছে কার্ন আর থেলমা।

ইয়োহানকেও সঙ্গে রাখা হয়েছে, তাকে অন্য কারও জিম্মায় রাখার ঝুঁকি নেয়নি কার্ন—বলা যায় না, টাকার লোভ দেখিয়ে লোকজনকে দলে ভেড়াবার চেষ্টা করতে পারে চতুর প্রেসিডেন্ট। ওয়ার্কাররা সবাই স্নো-ক্যাট নিয়ে চলে গেছে নর্দার্ন ক্যাম্পে, সবকিছু ডিজম্যান্টল করে ফেলবে। নিজোর্ডে সমস্ত প্যান্ডোরা বক্স আনলোড করা হলে ফিরে আসবে রোটরস্ট্যাট, জিনিসপত্র শিফট করে নিয়ে যাবে ক্যাম্প ডিকেডের পাশের অরিজিনাল সাইটে।

স্যাটানস্ ফিস্টের কন্টেইনারগুলোর ওজন এয়ারশিপের ম্যাক্সিমাম লোড ক্যাপাসিটির লিমিট অতিক্রম করায় একবারে পাহাড় টপকাতে পারেনি রোটরস্ট্যাট, পুরো গ্লেসিয়ার চক্কর দিয়ে অ্যারো-ডাইনামিক লিফটের মাধ্যমে এক হাজার ফুটের প্রয়োজনীয় উচ্চতায় পৌঁছুতে হয়েছে, তারপর নাক ঘুরিয়ে রওনা হয়েছে পাহাড় টপকে সাগরের দিকে। হেলিকপ্টারটা পুরো সময় মাটিতে ছিল, রোটরস্ট্যাট নির্ধারিত অলটিচ্যুডে পৌঁছুবার পর টেকঅফ করেছে। এই মুহূর্তে পিছনের সিটে বসে আছে তিন যাত্রী, সবচেয়ে ছোট আকারের প্যান্ডোরা বক্সটা ওদের পায়ের কাছে, থেলমা পিস্তল হাতে ইয়োহানকে পাহারা দিচ্ছে।

জানালা দিয়ে বার বার নীচে তাকাচ্ছে ইয়োহান, পর্বতমালা পেরিয়ে যাবার পর তিনদিক ঘেরা একটা বিশাল খাঁড়ি দেখা গেল... কী যেন ভাসছে ওখানে। ভাল করে তাকাতেই চেনা গেল—*নিজোর্ড* ওটা, জিয়ো-রিসার্চের ট্র্যান্সপোর্টেশন শিপ, কাজের সুবিধের জন্য প্যান্ডোরা গুহার কাছাকাছি জলসীমায় নিয়ে আসা হয়েছে ওটাকে।

জাহাজটাকে কেন্দ্র করে ঘুরতে শুরু করেছে হেলিকপ্টার, ইয়োহান বুঝতে পারল, ওটাতেই সমস্ত বোঝা আনলোড করতে যাচ্ছে রোটরস্ট্যাট। যদিও ইয়োরোপের যে কোনও জায়গায় প্যান্ডোরা বক্সগুলো পৌঁছে দেবার মত ক্ষমতা আছে এয়ারশিপটার, তারপরও কেন জাহাজটাকে বেছে নেয়া হয়েছে—তা পরিষ্কার।

গোপনে জিনিসগুলো পাচার করতে চাচ্ছে কার্ন। কে জানে... হয়তো চূড়ান্ত গন্তব্য পর্যন্ত নিজোর্ডও যাবে না, পথে একাধিকবার বদলানো হবে বাহন। রোটরস্ট্যাটে নেয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না, এমনিতেই ওটা লোকের চোখে কৌতূহলের বস্তু, তার উপর তলায় সোনায় মোড়া কী জিনিস নিয়ে যাচ্ছে ওটা—যে কেউই জানতে চাইবে তা।

নিজোর্ডের সুপারস্ট্রাকচারের পিছনের আফট ডেকে বড়সড় একটা জায়গা খালি করা হয়েছে স্যাটানস্ ফিস্টের কন্টেইনারগুলো নামানোর জন্য, বেশ ক'জন ডেক হ্যান্ডও দেখা গেল হেলমেট পরে কাছাকাছি অপেক্ষা করছে আনলোডিঙের ব্যাপারে রোটরস্ট্যাটের পাইলটকে গাইড করতে।

কপ্টারের পাইলট জাহাজের উপরটা ছেড়ে দূরে সরে গেল, অতিকায় এয়ারশিপটাকে পজিশন নেবার জন্য জায়গা করে দিচ্ছে। কোয়ার্টার মাইল দূরে গিয়ে পাঁচশো ফুট উচ্চতায় স্থির হলো বেল জেটরেঞ্জার, জাহাজের দিকে একটা পাশ ফিরিয়ে রেখেছে, যাতে আরোহীরা সহজে আনলোডিংটা দেখতে পায়।

চমৎকারভাবেই শুরু হয়েছিল অপারেশনটা, কিন্তু হঠাৎ কার্নের মুখে লেগে থাকা হাসিটা অদৃশ্য হলো পানিতে আলোড়ন লক্ষ করে।

নিজোর্ড থেকে মাত্র পঞ্চাশ গজ দূরে ভীষণভাবে নড়তে শুরু করেছে সাগর, কালো মত একটা ছায়া যেন বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে। সহস্র বুদ্‌বুদ্ সারফেসে উঠে ফাটতে শুরু করল, আর সেটার পর পরই টর্পেডোর মত গতিতে পানি ভেদ করে উঠে এল একটা ধূসর রঙের টিউব আকৃতির বস্তু। নিজের দৈর্ঘ্যের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সারফেস থেকে শূন্যে তুলে ফেলল ওটা, স্থির রইল যেন একটা মুহূর্তের জন্য, তারপর আছড়ে পড়ল পানিতে, চারপাশে ছড়িয়ে গেল একরাশ নোনা জল।

'মাইন গট!!!'

সমস্বরে মাতৃভাষায় ঈশ্বরকে ডেকে উঠল কপ্টারে বসা তিন জার্মান। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না তারা—প্রাচীন একটা ইউ-বোট ওটা... ভূতের মত বেরিয়ে এসেছে অতল সমুদ্রের তলা থেকে। বিস্ময়ে চলৎশক্তি হারাল তিনজনেই, বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে রইল অপার্থিব দৃশ্যটার দিকে।

সাবমেরিনের ভাঙা কোনিং টাওয়ারের হ্যাচ খুলে মানুষ বেরিয়ে আসছে দেখে সবার আগে চমক ভাঙল ফ্রেডারিখ কার্নের, বিনকিউলার চোখে লাগিয়ে তাকাল ব্যাপারটা বোঝার জন্য। এইবার আরও অবাক হবার পালা, দিনে-দুপুরে ভূত দেখছে না তো! এ কীভাবে হয়... মাসুদ রানা আর তার সাঙ্গপাঙ্গ এখানে আসে কীভাবে? ওদের তো কয়েকদিন আগেই মরে ভূত হয়ে যাবার কথা!

বিস্মিত হলেও স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি হারায়নি কার্ন। প্রাণের শত্রুরা সাবমেরিন পেল কোথায়, তা ধরে ফেলল সঙ্গে সঙ্গে। একটাই ব্যাখ্যা পুরো ব্যাপারটার—প্যান্ডোরা গুহা থেকে এসেছে এরা, ওখান থেকেই সাবমেরিন পেয়েছে। আর তার মানে...

বাকিটুকু আর ভাবল না কার্ন। পাইলটকে বলল, 'গেট ডাউন, ওখানে নিয়ে চলো আমাদের!' তারপর ওয়াকিটকি তুলে নিজোর্ডের টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করল, 'গুলি করো! গুলি করো ওদের!!' রীতিমত চেঁচাচ্ছে সে।

বিস্ময়কর দৃশ্যটা দেখতে লোকজন আগেই আপার ডেকের রেইলের পাশে চলে এসেছিল, নির্দেশ পেতেই অ্যাসল্ট রাইফেল তুলে গুলি করতে শুরু করল। কোনিং টাওয়ারে একজনকে পড়ে যেতে দেখা গেল, আর তার পর পরই হুড়োহুড়ি করে নেমে গেল সাবমেরিনের আরোহীরা।

'রোটরস্ট্যাটের সঙ্গে কথা বলব আমি,' কপ্টারের পাইলটকে বলল কার্ন। 'লাইন দাও।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই এয়ারশিপের পাইলটের কণ্ঠ ভেসে এল। 'ব্যাপারটা দেখতে পেয়েছি আমি। কী করতে চান।'

'সাবমেরিনটার ব্যবস্থা করতে হবে আগে,' হুঙ্কার ছাড়ল কার্ন, ততক্ষণ কার্গো ট্রান্সফার বন্ধ রাখো।'

'পারব কি না জানি না। ভার্টিকাল ডিসেন্ট ঠেকাতেই ইঞ্জিনগুলোর দফা-রফা হয়ে যাচ্ছে।'

দেখাই যাচ্ছে অবস্থাটা। নিরেট সোনায় গড়া কন্টেইনারগুলোর বাড়তি লোড নিতে গিয়ে রোটরস্ট্যাটের বারোটা বেজে যাচ্ছে, ইস্পাতের তৈরি ওয়্যারগুলো কেটে কেটে বসে যাচ্ছে কেভলারের তৈরি শরীরে। যতক্ষণ চলছিল, ততক্ষণ অসুবিধে হচ্ছিল না, এয়ারফয়েল ডিজাইনের টিউবটা বাড়তি শক্তি জোগাচ্ছিল। কিন্তু আনলোডিং শুরু করার প্রাক্কালে থামানো হয়েছে এয়ারশিপটাকে, ভারী বোঝা এখন শুধু ওজন দিয়েই টেনে নীচে নামিয়ে আনছে ওটাকে। ইতোমধ্যে পানি স্পর্শ করে ফেলেছে ওটার মুরিং রোপগুলো, নেটে মোড়া কার্গোর পোঁটলাটা মাত্র পঞ্চাশ ফুট উপরে।

'অ্যাবোর্ট অপারেশন!' বলল কার্ন। 'কয়েকটা চক্কর দিয়ে হাইট বাড়িয়ে ফিরে এসো, আমরা ততক্ষণে সাবমেরিনটাকে কফিন বানিয়ে ফেলব।'

'ফ্রেডারিখ!' চেঁচিয়ে উঠল থেলমা। 'রানা বেরিয়ে এসেছে!'

'যা বললাম তা-ই করো!' এয়ারশিপের পাইলটকে নির্দেশ দিল কার্ন। 'এদিকটা আমরা সামলাচ্ছি।' টান দিয়ে হেডফোন খুলে ফেলল সে, জানালা দিয়ে তাকাল সাবমেরিনের দিকে। হ্যাঁ, থেলমার কথাই ঠিক—বেরিয়ে এসেছে তার নিখুঁত পরিকল্পনায় কাঁটা হয়ে থাকা ওই বাঙালি ছোকরাটা, সঙ্গে ববি মুরল্যান্ড। এবার নিজ হাতে দুই আপদকে নিকেশ করে দম ফেলবে কার্ন।

জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তল বের করে দুহাত থেকে গ্লাভ খুলে ফেলল সে, অস্ত্রটা ভাল করে যেন ধরতে পারে। ঝট করে দরজা খুলে ফেলতেই ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল আর্কটিকের শীতল বাতাস। চোখের পলকে গাল আর দস্তানাবিহীন হাতদুটো জমে

যেতে চাইল কার্নের। দাঁতে দাঁত পিষে ঠাণ্ডাটা সহ্য করল সে, ফ্লোরে বসে পা ঝুলিয়ে দিল, এক হাতে ধরে রাখল দরজার ফ্রেম।

নীচে সাবমেরিনের ভাঙা কোনিং টাওয়ারে দেখা যাচ্ছে দুই শত্রুকে, নিজোর্ডকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে। হঠাৎ মুরল্যান্ড হ্যাচ গলে অদৃশ্য হয়ে গেল, উপরে রানা একা। মুখে হাসি ফুটল কার্নের, ওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে রেখেছে শত্রু, টেরও পাচ্ছে না আগ্রাসী বিপদটা। ব্যাপারটা স্রেফ ছেলেখেলা এখন। পিস্তলের উপরে লাগানো বিশেষভাবে তৈরি লেজার সাইটটা অন করল কার্ন।

'রানা, এবার তুমি মরবে!'

আঠারো

দীর্ঘদিনের ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতার ফলে যে-কোনও পরিস্থিতি খুব সহজেই বুঝে নিতে জানে রানা। ডুবোজাহাজটা যখন সারফেস হলো, হ্যাচ খুলে বেরিয়ে এসে পুরো একটা মিনিটও বাইরে থাকতে পারেনি ও, গুলিবৃষ্টি শুরু হওয়ায় নেমে যেতে হয়েছে। তারপরও একটা মাত্র পলকে পুরো পরিস্থিতি পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেছে ওর কাছে। এয়ারশিপটাকে দেখতে পায়নি ও, শুধু ধরিত্রী-কাঁপানো টারবাইনের আওয়াজ শুনেছে, কিন্তু দেখতে পেয়েছে নিজোর্ডকে। তাতেই বুঝতে পেরেছে ঘটনাটা—ফ্রেডারিখ কার্নের কার্গো ট্রান্সফার অপারেশনের ঠিক মাঝখানে নাক গলিয়ে বসেছে ওরা!

অস্ত্র হাতে উপরে এসেই ব্যাপারটা মুরল্যান্ডকে জানিয়ে দিল ও। এখনও চলছে গুলিবৃষ্টি, কোনিং টাওয়ারের ভাঙা দেয়ালের আড়ালে কাভার নিয়েছে দুজনে, মাথা উঁচু করে কোথায় কী আছে

দেখে নিল রানা। বলল, 'পোর্ট সাইডে পঞ্চাশ গজ দূরে আছে নিজোর্ড। সব মিলিয়ে আট জন লোক গুলি করছে আমাদের দিকে। রোটরস্ট্যাটটা আছে ঠিক পিছনেই, আমাদের দিকে আসছে। ওটায় এখনও কার্গো ঝোলানো আছে, নামাতে পারেনি বোধহয়।'

'শালার পোড়া কপাল না হলে হারামজাদাদের ট্রান্সফার জোনে এসে উঠি?' সখেদে বলল মুরল্যান্ড।

'চলো, ওদের জীবনটা একটু বিষিয়ে দেয়া যাক,' বলল রানা।

'কীভাবে তা করতে চাও?'

'ডানের চারজনকে আমি নিচ্ছি, বাঁয়েরগুলো তোমার।'

'খবরদার, আমার ভাগে হাত দেবে না!' সকৌতুকে বলল মুরল্যান্ড।

'যদি না তুমি আমারটাতে দাও!' হাসল রানা। 'রেডি... ওয়ান, টু, থ্রী!'

এক লাফে উঠে দাঁড়াল দুই বন্ধু, মেশিন পিস্তল থেকে অঝোর ঝারায় গুলি ছুঁড়ল। ব্যাপারটা এতই অপ্রত্যাশিত যে, থমকে গেল নিজোর্ডের ডেকে দাঁড়ানো শুটাররা। শিকলের তৈরি রেইলের পাশে কোনও কাভার নেই, পাল্টা আক্রমণের আশা করেনি তারা, করবেই বা কীভাবে? ষাট বছরেরও পুরনো একটা কার্গো সাবমেরিনে তো কিছু থাকার কথা নয়। বলতে গেলে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে *"র‍্যাম্বো"*-র মত গুলি চালাচ্ছিল তারা, এবার তার মাশুল গুণতে হলো ভীষণভাবে। ব্রাশফায়ারে অকাতরে জীবনই দিয়ে দিত, শুধুমাত্র প্রাচীন অস্ত্রদুটোর ব্যবহারে রানা আর মুরল্যান্ড অনভ্যস্ত বলে সবাই মরল না।

তারপরও রানার গুলিতে মুখ বিস্ফোরিত হলো প্রথম লোকটার, পাশের জন কণ্ঠনালীতে নিল মরণ আঘাত। মুরল্যান্ডের লাইন অভ ফায়ার অবশ্য নীচে নেমে গেছে, তাতে একজনের পুরুষাঙ্গ উড়ে গেল, দ্বিতীয়জন বাম হাঁটুর বাটি হারিয়ে রেইল টপকে পড়ল

সাগরে—কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই জমে মারা যাবে। ধপাধপ ডেকের উপর আছড়ে পড়ল লাশগুলো, একই সঙ্গে ডাইভ দিয়েছে জীবিত অস্ত্রধারীরা—গড়িয়ে এমপি-৪০-এর রেঞ্জ থেকে সরে যাচ্ছে, কাভার না নিয়ে আর ফায়ার করবে না।

ভাঙা বাল্কহেডের পিছনে আবার বসে পড়ল দুই বন্ধু।

রানার চেহারায় সন্তুষ্টি। 'হিট রেট মন্দ হয়নি, কী বলো?'

'হুঁ,' মুরল্যান্ড মাথা ঝাঁকাল। 'তবে বিচি উড়ে যাওয়া লোকটা যদি কার্ন হতো, তা হলে এক্ষুণি একটা চোখ দান করে দিতাম আমি।'

রোটরস্ট্যাটের গর্জন ধীরে ধীরে বাড়ছে, এগিয়ে আসছে ওটা। মাথা তুলে ওটাকে দেখে নিল রানা, মুরিং লাইনদুটো পানিতে পড়ে আছে ওটার, বিশাল একটা "ভি" আকৃতি তৈরি করে সারফেস কেটে এগোচ্ছে। কী ঘটবে বুঝতে পারল রানা—সোজা ওদের মাথার উপর দিয়ে যাবে এয়ারশিপটা, মুরিং রোপদুটো উঠে আসবে সাবমেরিনের ডেকের উপর দিয়ে। মাথায় দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল ওর।

'ববি, জলদি গিয়ে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্ক ভরো,' বলল ও। 'আমরা ডাইভ দেব।'

'উপরে তুমি একা থাকবে?'

'হ্যাঁ। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।'

'তোমার এই ডায়লগটাকেই আমি সবচেয়ে ভয় পাই,' আতঙ্কের কৃত্রিম একটা ভাব করল মুরল্যান্ড। 'নিশ্চয়ই কোনও পাগলামি করতে যাচ্ছ!'

'যা বলছি, জলদি করো। পরে ব্যাখ্যা করব সব। আর হ্যাঁ, মেশিন পিস্তলটা রেখে যাও।'

'ঠিক আছে,' বলে নিজের এমপি-৪০ ডেকের উপর নামিয়ে রেখে হ্যাচ গলে নেমে গেল মুরল্যান্ড।

দুহাতে দুটো মেশিন পিস্তল নিয়ে আবার মাথা তুলল রানা,

নিজোর্ডের ডেক থেকে এখনও গুলি হচ্ছে না, ব্যাটারা ভালই ভয় পেয়েছে।

হঠাৎ উরুতে জ্বালা করে উঠল ওর, চোখ ফেরাতেই বিস্মিত চোখে ক্ষত থেকে তাজা রক্ত বেরুতে দেখল... তারপরই পাশে লক্ষ করল লাল বিন্দুর মত আলোটা। ঝট করে উল্টো ঘুরল ও, দৃশ্যটা দেখে আঁতকে উঠল।

পিছন থেকে প্রায় ঘাড়ে চড়ে বসেছে একটা বেল হেলিকপ্টার—প্যাসেঞ্জার কেবিনের দরজা খোলা, সেখান দিয়ে পা ঝুলিয়ে বসে আছে স্বয়ং ফ্রেডারিখ কার্ন, হাতে একটা লেজার সাইট লাগানো পিস্তল! রোটরস্ট্যাটের বিকট গর্জনে ঢাকা পড়ে গেছে কপ্টারের আওয়াজ, তার উপর এগিয়ে এসেছে পিছন থেকে—বিপদটা তাই আগে টের পায়নি রানা। দরজা খোলা অবস্থায় ব্যালেন্স ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে পাইলট, ভীষণভাবে কাঁপছে কপ্টারটা, কার্নের নিশানা ঠিক থাকেনি, শুধুমাত্র সে-কারণেই কপালজোরে বেঁচে গেছে ও।

উরু বেয়ে উঠে আসা ব্যথাটাকে কোনওমতে হজম করে নিল রানা, পিস্তলদুটো তুলে পাল্টা ফায়ার করল। কাঁপতে থাকা জেটরেঞ্জার এবার ওকেও ব্যর্থ করে দিল, কপ্টারের লেজে গিয়ে নিষ্ফলভাবে বিঁধল দুটো মাত্র বুলেট, বাকিগুলো আকাশের দিকে চলে গেছে।

কার্নের চোখে আতঙ্ক ফুটতে দেখা গেল, চেঁচিয়ে পাইলটকে কিছু বলল সে। বাঁক নিতে শুরু করল জেটরেঞ্জার, আবার গুলি করল রানা, কিন্তু অল্প কয়েকটা বেরিয়েই থেমে গেল বর্ষণ—ম্যাগাজিন শেষ হয়ে গেছে। কপ্টারের উইন্ডশীল্ডে ফাটল দেখতে পেল ও, রিলোড করার আগেই সাঁই করে রেঞ্জের বাইরে চলে গেল যান্ত্রিক ফড়িংটা।

আবার গুলি শুরু হলো এ সময়, জাহাজের ডেকে থাকা রাইফেলধারীরা নিজেদের সামলে নিয়েছে, কাভার খুঁজে নতুন করে

হামলা চালাচ্ছে। রিলোড করা হয়ে গেছে মেশিন পিস্তলদুটো, শরীরের ঊর্ধ্বাংশ তুলে পাল্টা গুলি চালাল রানা, একই সঙ্গে দেখে নিল রোটরস্ট্যাটের অবস্থান। একদম কাছে চলে এসেছে এয়ারশিপটা, বাতাস ভরা টিউবের মত বেলুনটার নাক সাবমেরিনের বো'র ঠিক উপরে ঝুলছে। যা করার দ্রুত করতে হবে, সময় নেই একদম। কিন্তু গুলিবৃষ্টিতে বিরতি দিচ্ছে না নিজোর্ডের শুটাররা, এ অবস্থা চলতে থাকলে মাঠে মারা যাবে প্ল্যানটা।

'স্যাম!' খোলা হ্যাচের কাছে মুখ নিয়ে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'উপরে এসে আমাকে সাহায্য করুন!'

জুরকিচের শুশ্রূষায় লিয়াকে সাহায্য করছিল সার্ভেয়ার্স সোসাইটি টিমের দলপতি, ওর ডাক শুনে খেপাটে গলায় বলল, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমাকে ডাকাডাকি করছেন কেন, বরং নিজে নীচে এসে হ্যাচ আটকে দিন। চেষ্টা করলে সাবমেরিনটা নিয়ে পালিয়ে যেতে পারব আমরা।'

পরামর্শটা মন্দ নয়, পরিস্থিতির বিচারে যুক্তিসঙ্গতই বলা চলে। এই মুহূর্তে কোর্স অভ অ্যাকশন ওটাই হওয়া উচিত। কিন্তু ফ্রেডারিখ কার্নের কূট উদ্দেশ্য বানচাল করে দেয়ার সুবর্ণ একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে ভাগ্যের জোরে, সেটাকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চায় না রানা। ধমকের সুরে বলল, 'কী করতে হবে, তা ভালই জানি আমি। জলদি উপরে আসুন, নইলে কিন্তু ভাল হবে না।'

শ্রাগ করল স্যাম, তারপর ল্যাডার বেয়ে উঠতে শুরু করল। আকাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল রানা, এয়ারশিপের গ্যাস বেলুনে ঢাকা পড়ে গেছে সূর্য, বিশাল একটা ছায়া ধীরে ধীরে ঢেকে দিচ্ছে সাবমেরিনকে। বিশ সেকেন্ডের ভিতরই ওদের পার হয়ে চলে যাবে আকাশযানটা, একমাত্র সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। ইচ্ছে হলো গুলি ছুঁড়তে... কিন্তু বেলুনটার শরীর বুলেটপ্রুফ

কেভলারে তৈরি, কোনও লাভই হবে না।

'ফর গডস্ সেক, স্যাম। হারি আপ!'

হ্যাচে উঁকি দিল স্যামের মাথা, চোখে নগ্ন আতঙ্ক। 'কী করতে হবে আমাকে?'

মুরল্যান্ডের এমপি-৪০টা তাকে ধরিয়ে দিল রানা। 'আমাকে কাভার দেবেন। ওই কপ্টারটা যেন কাছে ঘেঁষতে না পারে, নিজোর্ডের লোকগুলোও যেন ব্যতিব্যস্ত থাকে। ঠিক আছে?'

বোকা বোকা গলায় স্যাম বলল, 'আমি জীবনে কোনওদিন ফায়ার আর্মস ছুঁয়েও দেখিনি, আর আমাকে বলছেন গুলি করে হেলিকপ্টার ফেলে দিতে?'

'কিচ্ছু ফেলতে হবে না আপনাকে,' আশ্বাস দিল রানা। 'লোডিঙেরও ঝামেলা নেই। খালি তাক করে ট্রিগার চাপবেন... লাগল কি লাগল না, এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ওরা আমার দিকে নজর দিতে না পারলেই হলো।'

নিজের অস্ত্রটা শেষবারের মত চেক করে বেল জেটরেঞ্জারের খোঁজে চোখ বোলাল রানা—নিরাপদ দূরত্ব রেখে চক্কর দিচ্ছে ওটা। ওর মুখে চওড়া হাসি ফুটল, বেশ ভালমতই কার্নের বাচ্চার পিলে চমকে দেয়া গেছে। ওর কাছে মেশিন পিস্তল থাকবে, এটা কল্পনাও করতে পারেনি বোধহয়। এমপি-৪০ যত পুরনোই হোক, কার্নের পিস্তলের চেয়ে অস্ত্রটার রেঞ্জ অনেক বেশি। ভয়ে আর কাছেই ভিড়ছে না বদমাশটা।

রোটরস্ট্যাটের দিকে তাকিয়ে রানা বিড়বিড় করল, 'সময় হয়েছে।' তারপরই বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়াল, নিজোর্ডের দিকে তাক করে গুলি ছুঁড়ল এক পশলা। রাইফেলধারীরা কাভারের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে দেখে লাফ দিয়ে ভাঙ্গা বাল্কহেড পেরুল ও, দক্ষ জিমন্যাস্টের মত দু'পায়ে ভর রেখে ইউবোটের ফরোয়ার্ড ডেকে নামল। ছুটতে শুরু করল বো'র দিকে।

শিকারকে খোলা জায়গায় পেয়ে হামলার প্রয়াস চালাল কার্ন,

কপ্টারটা দুরন্ত গতিতে ছুটে এল সাবমেরিনের দিকে। ছুটন্ত অবস্থাতেই শরীর ঘুরিয়ে গুলি চালাল রানা, জেটরেঞ্জারের তলায় ঠকঠক করে বিঁধল সেগুলো। সাহস হারিয়ে ফেলল পাইলট সেই শব্দে, আচমকা মোড় নিয়ে দূরে সরে গেল আবার। কার্ন অবশ্য একটা গুলি করেছে, তবে সেটা সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট শট।

মাথার উপর অতিকায় পাখির মত ঝুলছে রোটরস্ট্যাট, যেন এক্ষুণি ছোঁ মারবে। সত্যি সত্যি পাখি হলে ভালই হতো, গুলি করে ফেলে দেয়া যেত ওটাকে। সম্ভব না যখন, এই মুহূর্তে অন্তত একটা মুরিং রোপ চাই ওর, কাজ হলে ওটাতেই হবে—এই তো, বো'র কাছে ঝুলছে রশিদুটো। ত্রিশ ফুট দূরত্ব পেরিয়ে ধরতে হবে, তারপর আবার টেনে নিয়ে আসতে হবে কোনিং টাওয়ারের কাছে।

হাপরের মত ওঠানামা করছে রানার বুক—যত না পরিশ্রমে, তার চেয়ে অনেক বেশি উত্তেজনায়। দূরত্বটা কম নয় একেবারে, সম্পূর্ণ আড়ালবিহীন একটা জায়গা পেরুতে হচ্ছে ওকে, নিজোর্ডের ডেকে পজিশন নেয়া শুটারদের সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছে।

ওর আশঙ্কাটাকে সত্যে পরিণত করতেই যেন গর্জে উঠল রাইফেলগুলো। রানার ছুটন্ত পায়ের পিছনে ঠং ঠং করে ইউ-বোটের লোহার খোলে বাড়ি খেতে থাকল একের পর এক বুলেট, প্রতি আঘাতে ফুলকি ছিটাচ্ছে। ডেকের উপর ডাইভ দিয়ে পড়ল রানা, লক্ষ্যস্থির করার জন্য সময় নষ্ট করল না, এমপি-৪০ থেকে শিপটার দিকে গুলি চালাল। প্রায় একই সময় স্যামও ফায়ার ওপেন করেছে।

ডেকে ছোটখাট জিনিসপত্র গুলির আঘাতে উড়তে দেখা গেল, শুটাররা কেউ আহত হয়েছে কি না কে জানে, তবে আবার লুকিয়ে পড়েছে তারা। উঠে দাঁড়িয়ে এক ছুটে সাবমেরিনের বো'তে পৌঁছুল রানা, অস্ত্রটা আড়াআড়িভাবে বুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়ে ডেকের উপর ঘষা খেতে থাকা একটা মুরিং রোপ আঁকড়ে ধরল দু'হাতে।

ম্যানিলা দিয়ে তৈরি রশিটা অসম্ভব ভারী, তার উপর পানিতে

ভিজে ওজন বেড়ে গেছে আরও। ডায়ামিটার কমপক্ষে তিন ইঞ্চি হবে ওটার... খুবই মজবুত আর শক্তিশালী, এটা দিয়ে ঠিকমত বাঁধা থাকলে সম্ভবত ক্যাটাগরি ফাইভের একটা ঝড়ও ওয়ারশিপটাকে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে পারবে না। উল্টো ঘুরে গাছের গুঁড়ি নেবার ভঙ্গিতে দড়িটাকে কাঁধের উপর ফেলল রানা, দু'হাতে চেপে ধরে রাখল যাতে পড়ে না যায়, তারপর ছুটতে শুরু করল ফিরতি পথে—কোনিং টাওয়ারের দিকে।

বেশিদূর যেতে পারল না, আবার গুলি শুরু করল নিজোর্ডের রাইফেলধারীরা, তবে প্রথমবার গুলি ছুঁড়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে স্যাম, শব্দ শুনে দেরি করল না, শরীর তুলে কাভারিং ফায়ার শুরু করল সে-ও। থেমে গেল নিজোর্ডের রাইফেলগুলো, এই সুযোগে দ্রুত পা চালিয়ে কোনিং টাওয়ারের কাছে পৌঁছে গেল রানা। পাশেই ডেকের উপর সাবমেরিনের একটা মুরিং বোলার্ড রয়েছে, দড়িটা পেঁচিয়ে বাঁধতে শুরু করল।

পিছনে পিস্তলের শব্দে চমকে উঠল ও, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতেই দেখল, ছুটে আসছে হেলিকপ্টারটা। দরজা দিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে শরীর ঝুলিয়ে রেখেছে কার্ন, নিশানা-টিশানা ঠিক করার ঝামেলায় না গিয়ে ক্রমাগত গুলি করছে—রানার মতলবটা বুঝতে পেরেছে সে, যে-কোনও মূল্যে প্রচেষ্টাটা ভেস্তে দিতে চায়।

বিপদটা আঁচ করতে পারল রানা—মেশিন পিস্তলটা ওর পিঠে এমনভাবে ঝোলানো যে বের করে গুলি করার সময় নেই, তার আগেই কার্নের হাতে মারা পড়বে। স্যামও নিজোর্ড নিয়ে ব্যস্ত, ওকে কাভার দিতে পারবে না। ঝোপ বুঝেই কোপ মারতে আসছে প্রতিপক্ষ। বাঁচার উপায় একটাই, কোনও রকম চিন্তাভাবনা না করে সেটাই করল ও। দড়ি ছেড়ে দিয়ে রেইল টপকে লাফিয়ে পড়ল পানিতে! শিকারী বাজের মত ছোঁ মারার ভঙ্গিতে কপ্টারটা উড়ে চলে গেল সাবমেরিনের উপর দিয়ে। নিষ্ফল কতগুলো গুলি শুধু আঘাত করল খোল আর পানিতে।

অসম্ভব শীতল পানিতে পড়ায় মুহূর্তেই রানার ফুসফুস থেকে সমস্ত বাতাস বের হয়ে গেল। এই ঠাণ্ডাটা বর্ণনা করার কোনও ভাষা নেই। খুলির ভিতর যেন হাজারটা সুঁচ বিঁধতে শুরু করল ওর, প্রতিটা অস্থিসংযোগে কেউ ছুরিকাঘাত করছে একই সঙ্গে। উরুর ক্ষতটা মুহূর্তেই অসাড় হয়ে গেল। শরীরের জামাকাপড় ভিজে যেন ভারী হয়ে গেছে কয়েক টন, ওকে টেনে নীচে নিয়ে যাচ্ছে। দুই পা দিয়ে পরস্পরকে খোঁচা মেরে মুনবুটদুটো খুলে ফেলল রানা, পতনের গতি কমল খানিকটা। উপরে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টায় হাত-পা পাগলের মত ছুঁড়তে শুরু করল ও। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়ছে দ্রুত, কিছুতেই ভাসতে পারছে না। শরীরের কোষে কোষে সঞ্চিত শেষ বিন্দু শক্তি একত্র করে আবার লাথি ছুঁড়ল রানা, এইবার পারল উঠে আসতে।

সারফেসে মাথা তুলে সামনেই ইউ-বোটের খোলে লাগানো সিঁড়ির ধাপ দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি আঁকড়ে ধরল সেটা, তলিয়ে যাবার আগেই। হাত কাঁপছে ভীষণভাবে, তা-ও মুঠি ছাড়ল না রানা, টেনে তুলতে লাগল শরীরটা। কয়েক ধাপ ওঠার পরেই যখন পেশিগুলো হার মানতে যাচ্ছে, তখনই লিয়াকে দেখতে পেল ও, খবর পেয়ে মেয়েটা আপার ডেকে বেরিয়ে এসেছে। দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে ধরে ফেলল ও, উপরে উঠে আসতে সাহায্য করল।

ধপ করে ডেকে শুয়ে পড়ল রানা, সারা মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীর যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে মগজ থেকে। 'থ্যাংকস!' কোনওমতে বলল ও লিয়াকে।

'দাঁড়াও,' ধরাধরি করে রানাকে উঠতে বলল লিয়া। 'আমাদের হাতে সময় নেই।'

হেলিকপ্টারটা দেখা যাচ্ছে না, স্যাম সম্ভবত ওটাকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছে। দু'পায়ে ভর দিয়ে রোটরস্ট্যাটের দিকে তাকাল রানা, ওটা সাবমেরিনের দৈর্ঘ্য প্রায় ছাড়িয়ে গেছে—মুরিং রোপটা টান খাচ্ছে... খুলে যাবার জোগাড়, লাফ দেবার আগে ঠিকমত গিঁঠ

দিতে পারেনি ও।

লিয়ার অবলম্বন ছেড়ে দিল রানা, টলতে টলতে এগিয়ে গেল বোলার্ডের দিকে, চেঁচাল, 'সাহায্য করো আমাকে, লিয়া!'

দুজনে মিলে রোপটা ভাল করে জড়াল বোলার্ডের সঙ্গে, বাড়তি অংশটা টেনে নিয়ে গেল ডেকের বিপরীত পাশের বোলার্ডের কাছে—ওখানেও গিঁঠ দিল।

'হারি আপ, রানা,' কোনিং টাওয়ার থেকে চেঁচাল স্যাম। 'ওরা আবার গুলি করলে বিপদে পড়ে যাবো! আমার ম্যাগাজিন একদম খালি।'

'হয়ে গেছে।' বলল রানা, লিয়াকে নিয়ে উঠে এল টাওয়ারে।

কট্ কট্ জাতীয় বিশ্রী শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল ওরা—মুরিং রোপের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে রোটরস্ট্যাট, ধনুকের ছিলার মত টান টান হয়ে গেছে দড়িটা, এয়ারশিপের মুক্ত হবার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছে। উপরে তাকিয়ে বিশাল আকাশ-যানটাকে অসহায় জন্তুর মত নড়াচড়া করতে দেখা গেল, ভারী কার্গোর বোঝা ওটাকে নীচে নামিয়ে আনছে।

ঠাণ্ডায় কাঁপছে রানা, তারপরও নিষ্ঠুর একটা হাসি হাসল। 'পেয়েছি তোমাকে এবার বাগে!' বাকিদের দিকে ফিরে বলল, 'সবাই নীচে চলো, কার্নের বারোটা বাজাচ্ছি আমরা।'

ঠিক একই সময় রোটরস্ট্যাটের ভিতর পাগলের মত চেঁচাচ্ছে পাইলট, 'আমরা আটকে গেছি... আমরা আটকে গেছি! মি. কার্ন, কিছু করুন জলদি! নইলে ওজনের টানে পানিতে গিয়ে পড়ব আমরা!'

'কিচ্ছু হবে না!' ওপাশ থেকে বলল কার্ন। 'পাওয়ার বাড়াও ইঞ্জিনের, ছিঁড়ে ফেলো দড়িটা।'

'লোডটা ফেলে দিই, তা হলে যদি কাজ হয়!'

'লোড যদি ফেলো, তা হলে আর কোনওদিন মাটিতে নামার

খায়েশ রেখো না!' কঠিন গলায় বলল কার্ন। 'আকাশে আছ তো, ওখান থেকেই সোজা স্বর্গে উড়াল দিয়ো।'

'কী করব তা হলে?'

'ফুল পাওয়ার! সাবমেরিনটাকে টেনে সোজা ডাঙায় নিয়ে ফেলো, তারপর আমি দেখছি।'

টপাটপ লাফ দিয়ে কন্ট্রোল রুমের মেঝেতে নামল স্যাম, লিয়া, আর সবশেষে রানা। ওর হাত-পা বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, হাইপোথারমিয়ায় আক্রান্ত হতে যাচ্ছে কিছুক্ষণের মধ্যে। তাড়াতাড়ি ওর জামাকাপড় খুলে দিতে শুরু করল লিয়া আর সিলভিয়া। স্যাম এই ফাঁকে হ্যাচটা বন্ধ করে দিল।

'দ্... দেজান কোথায়?' কাঁপতে কাঁপতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমি এখানে,' জবাব দিল জুরকিচ, চার্ট টেবিলের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে আছে সে—মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা।

'আ...আপনি ঠ্...ঠিক আছেন?'

'কথা বলবেন না, আপনার অবস্থা আমার চেয়ে খারাপ। আমি ঠিক আছি, কপালে একটা স্প্লিন্টার এসে লেগেছিল—ডা. নোভাক ড্রেসিং করে দিয়েছেন।'

জামাকাপড় খুলে রানাকে নগ্ন করে ফেলা হলো—সারা শরীর নীলচে হয়ে গেছে ওর, দেখে আঁতকে উঠল লিয়া। সিলভিয়া দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা কম্বল এনে ওর সারা গায়ে পেঁচিয়ে দিল।

এই সময় হঠাৎ কেঁপে উঠল গোটা জাহাজ, খোলে পানির আওয়াজ বদলে গেল—রোটরস্ট্যাট তার অবিশ্বাস্য শক্তি দিয়ে ওদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ভেজা জামাকাপড় খুলে কম্বল জড়ানোয় কিছুটা ভাল বোধ করছে রানা, কী ঘটছে টের পেয়ে গাল দিয়ে উঠল, 'শিট! ববি, তুমি রেডি?'

'জাদুর শব্দটা বলো খালি!' সকৌতুকে বলল মুরল্যান্ড।

'ডাইভ!' অর্ডার দিল রানা।

গলগল শব্দে ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কে পানি ঢোকার শব্দ হলো। কয়েক সেকেন্ডের ভিতর প্রচণ্ড ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ইউ-১০৬২, রোটরস্ট্যাট আর ওটাকে টানতে পারছে না, দুপক্ষের শক্তি এখন সমানে সমান।

'ববি!' চেঁচাল রানা।

'একটু অপেক্ষা করো। আমাদের ওজন বাড়ছে প্রতি মুহূর্তে, ওরা ধরে রাখতে পারবে না।'

'দেরি করার সময় নেই আমাদের, ওরা দড়িটা কেটে ফেলার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। লিয়া-সিলভিয়া, পোস্ট নাও। আমরা বো-প্লেন ব্যবহার করব!'

ঝাঁকি খেয়ে সম্মুখগতি থেমে যেতেই ব্যাপারটা কী জানার জন্য নীচে তাকাল রোটরস্ট্যাটের পাইলট, ইউ-বোটের চারপাশে পানির আলোড়ন দেখে পাথরের মত স্থবির হয়ে গেল সে। বিড় বিড় করল, 'ওহ্ গড! কী হচ্ছে এসব... এ হতে পারে না!' হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে যেন সে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে নীচে তাকিয়ে কো-পাইলটেরও একই দশা হলো। 'না-আ! কী করছে ওরা!'

'হচ্ছেটা কী ওখানে?' রেডিওতে ধমকে উঠল কার্ন।

'ওরা আমাদের ক্র্যাশ করাতে চাইছে, মি. কার্ন! সাবমেরিনটা ডাইভ দিচ্ছে।'

'ফুল পাওয়ার! ফুল পাওয়ার!!' উত্তেজিত গলায় বলল কার্ন। 'ধরে রাখো ওদের!'

'ফুল পাওয়ারেই আছি—তাতে কাজ হচ্ছে না। ওজন না কমালে হবেও না,' বলল পাইলট, পাগলাটে নিয়ো-নাৎসির প্রতি সমস্ত আনুগত্য হারিয়েছে সে। 'সরি, স্যার, দরকার হলে উপরেই উড়াল দেব, তা-ও আপনার কার্গোর জন্য সলিল সমাধিতে যাবার

ইচ্ছে নেই আমার।'

'ও-কাজ কোরো না,' উন্মাদের মত চেঁচাল কার্ন। 'পাঁচটা মিনিট হোল্ড করো, নিজোর্ড থেকে বোট পাঠিয়েছি, ওরা মুরিং লাইনটা কেটে দেবে।'

নাকে বাঁধা রোপটার টানে ইতোমধ্যে ঘুরে গেছে রোটরস্ট্যাট, সাবমেরিনের দিকে মুখ করে ক্রমশই নামছে ওটা। পরিস্থিতি দেখে আর একটা মুহূর্তও অপেক্ষা না করার সিদ্ধান্ত নিল পাইলট, সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডাম্প!'

মাথা ঝাঁকিয়ে একটা লিভার টানল কো-পাইলট, সঙ্গে সঙ্গে রিলিজ হয়ে গেল কার্গো নেটকে ধরে রাখা ক্লিপ, প্রবল গতিতে পানিতে আছড়ে পড়ল নিরেট সোনার পুরো লোডটা, নিমেষে তলিয়ে গেল।

'না-আ-আ-আ!' রেডিওতে আর্তনাদের মত শোনা গেল কার্নের গলা।

ততক্ষণে ভারী কার্গোর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বাচ্চাদের গ্যাস ভর্তি বেলুনের মত উপরে উঠতে শুরু করেছে রোটরস্ট্যাট, কিছুদূর গিয়েই আবার আটকে গেল। সাবমেরিন এবার ইঞ্জিন আর বো-প্লেন ব্যবহার করে তলিয়ে যাচ্ছে, ব্যালাস্ট ট্যাঙ্কের পাশাপাশি এই শক্তিটা যোগ হওয়ায় আবার আগের অবস্থায় চলে গেল এয়ারশিপ, হিড় হিড় করে ওটাকে পানিতে নামিয়ে আনছে ইউ-১০৬২। কন্ট্রোল কলাম নিয়ে যুঝতে শুরু করল দুই পাইলট, ইঞ্জিনের সমস্ত শক্তি দিয়ে ডুবোজাহাজটাকে রুখতে চাইছে, গোটা এয়ারফ্রেম কাঁপছে ভীষণভাবে।

রীতিমত টাগ-অভ-ওয়ার, মানে, রশি টানাটানি চলছে আকাশ আর পানির দুই যানের মধ্যে, মাঝের দড়িটা তিরতির করে এত দ্রুত কাঁপছে যে চোখেই দেখা যাচ্ছে না। তবে যুদ্ধটায় জয় হতে চলেছে সাবমেরিনের, ইতোমধ্যে পানিতে তলিয়ে গেছে ওটা, ধীরে ধীরে এয়ারশিপকে সারফেসের কাছাকাছি নামিয়ে আনছে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে সমস্ত ফুয়েল ফেলে দিল পাইলট, তাতে যদি ওজন কমিয়ে কিছুটা কাজ হয়। নিজোর্ড থেকে পাঠানো বোটটা এসে যাবে কিছুক্ষণের ভিতর, ততক্ষণ টিকে থাকতে পারলেও হয়। কিন্তু পতনের গতি কমার কোনও লক্ষণ দেখতে না পেয়ে বেচারা বুঝে গেল, তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

নীচদিকে মুখ করে পুরোপুরি খাড়া হয়ে গেছে রোটরস্ট্যাট, বিস্ফারিত চোখে উইন্ডশীল্ডে সুনীল সাগরকে লাফ দিয়ে উঠে আসতে দেখল দুই বৈমানিক। আতঙ্কিত গলায় কো-পাইলট বলল, 'হা যিশু! আমরা এখন কী করব?'

অমোঘ নিয়তিকে মেনে নিয়ে শান্ত গলায় পাইলট এক শব্দে দিল জবাবটা, 'মরব।'

তুমুল গতিতে গিয়ে সাগরের পানিতে নাক দিয়ে আঘাত করল রোটরস্ট্যাট, চারপাশে ছিটকে উঠল একরাশ পানি, প্রচণ্ড একটা ঝাঁকির সাথে পতনের গতি থেমে গেছে—পূর্ণ শক্তি দিয়েও দেড় মিলিয়ন কিউবিক ফুট হিলিয়ামের বয়ান্সিকে এখন আর হারাতে পারছে না সাবমেরিনটা। টার্গেটে বেঁধা তীরের মত থরথর করে কাঁপতে থাকল বিশাল আকাশযানটা।

ইউ-বোটের ভিতরেও ঝাঁকিটা অনুভব করল আরোহীরা। চোখে না দেখলেও কী ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছে সবাই, বাতাসভর্তি বয়ার মত কাজ করছে এখন রোটরস্ট্যাটের গ্যাস বেলুনটা, টেনে ধরেছে গোটা ডুবোজাহাজকে। এয়ারশিপের চার-চারটে ইঞ্জিন যেটা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুসারে সেটা এখন সম্ভব করে তুলেছে পানি এবং হিলিয়াম ভর্তি টিউবের মধ্যকার বিপরীতমুখী শক্তি।

হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত কাঁপছে গোটা খোল। নির্বিকার ভঙ্গিতে গা গরম করার জন্য এক ঢোক ব্র্যান্ডি গলায় ঢালল রানা। মুরল্যান্ডকে জিজ্ঞেস করল, 'ডেপথ কত আমাদের?'

'ফরটি মিটারস্ অ্যান্ড হোল্ডিং। আর যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

এয়ারশিপটার বয়াসি খুব বেশি, ওটাকে পানির নীচে আনার মত শক্তি নেই আমাদের।'

'সেটার দরকারও নেই,' নিষ্ঠুর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'সারফেস হও... যত তাড়াতাড়ি পারো।'

'এক্সকিউজ মি?' কারণটা মুরল্যান্ড ধরতে পারছে না।

'ভেসে ওঠো, মজাটা নিজ চোখেই দেখতে পাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যালাস্টে বাতাস ভরতে শুরু করল মুরল্যান্ড। দুরন্ত গতিতে সারফেসের দিকে ছুটে গেল ইউ-১০৬২, ভুস করে ভেসে উঠল এয়ারশিপের নাক থেকে চল্লিশ গজ দূরে। এয়ারশিপটার ধ্বংসের জন্য ওটুকুই দরকার ছিল।

খাড়া হয়ে নাক পানিতে গুঁজে থাকায় চারটে ইঞ্জিন আর রোটর কোনও রকম সাপোর্টই দিতে পারছিল না আকাশযানটাকে, মুরিং লাইনের টানেই শুধু স্থির ছিল। এবার সাবমেরিনটা সারফেস হবার সঙ্গে সঙ্গে ওটাতে ঢিল পড়ায় ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলল রোটরস্ট্যাট, কাত হয়ে ঝপাস করে আছড়ে পড়ল পানিতে, বাতাস ভর্তি বলের মত গড়াতে শুরু করল। জেট টারবাইনের শক্তিতে ঘুরতে থাকা প্রথম রোটরের টেফলনের পাখাগুলো পানির স্পর্শ পেতেই মটমট করে ভেঙে বর্শার মত ছুটতে লাগল চারপাশে, গ্যাস বেলুন ফুটো করে চলে গেল কয়েকটা খণ্ড। বিস্ফোরণের মত শব্দ করে দুর্নিবার ঝড়ের : ১গুতায় বেরুতে শুরু করল হিলিয়াম, রকেটের একজস্ট যেন ওগুলো—পুরো কাঠামোটাকে ঠেলে নিয়ে যেতে থাকল একদিকে। চাপটা সহ্য করতে পারছে না বেলুনের কেভলার স্কিন, বিকট আওয়াজে ফেটে বড় হয়ে যাচ্ছে ফুটোগুলো। আরেকটা রোটর পানি ছুঁলো... আবারও চতুর্দিকে শুরু হলো ভাঙা পাখার বর্শাবৃষ্টি।

নিজোর্ডের ডেকে আতঙ্কের ঢেউ বয়ে গেল, হিলিয়ামের ধাক্কায় গোটা রোস্টরস্ট্যাট সাগরের উপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে ছুটে আসছে জাহাজ লক্ষ্য করে—পথে পড়ে গেল হতভাগ্য বোটটা...

যেটা মুরিং লাইন কাটার জন্য বের হয়েছিল। ঠিক যেভাবে রুটি বেলা হয়, সেইভাবে ছোট্ট বোটটাকে এক চাপে সমান করে উপর দিয়ে চলে গেল এয়ারশিপটা, নাবিকরা মুহূর্তেই পটল তুলেছে। দৃশ্যটা দেখে সমস্ত সাহস উবে গেল নিজোর্ডের আপার ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর, স্ট্যামপিড হওয়া গরুর পালের মত দৌড়াদৌড়ি করে সুপারস্ট্রাকচারে ঢুকে পড়ল তারা।

গড়াতে গড়াতে বোউলিং প্রতিযোগিতার বলের মত জাহাজের স্টারবোর্ড সাইডে গিয়ে আঘাত করল রোটরস্ট্যাট, কাঁপিয়ে দিল গোটা খোলটাকে, একপাশে কাত করে দিল। ভিতরে ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচামেচি শুরু করল আরোহীরা—জড় বস্তু আর মানুষ... সবাই পিংপং বল হয়ে বাড়ি খাচ্ছে বাল্কহেডের গায়ে। অবশ্য হার মানল না শক্তিশালী নিজোর্ড, ধাক্কার রেশ সামলে সোজা হতে শুরু করল। আর তখনই দেখা দিল নতুন বিপদ।

ধাম ধাম করে ফাটল এয়ারশিপের বেলুনের আরও কয়েকটা জায়গা, আগের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি গ্যাস বেরুতে থাকল, আর তাতে চুপসে যেতে থাকল বেলুনটা। চাদর হয়ে নিজোর্ডের আফট্ ডেকে নেমে এল নেতিয়ে পড়া বিশাল একটা অংশ, আটকে গেল কার্গো মুভিঙে ব্যবহৃত উঁচু ক্রেনগুলোর গায়ে। এয়ারশিপের বেশিরভাগটাই পানিতে, বেলুনের বাতাস বেরিয়ে যেতেই ডুবতে শুরু করল ওটা। আটকে পড়া অংশের কারণে ক্রেনগুলোর উপর টান লাগতেই স্টারবোর্ডে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে কাত হতে শুরু করল গোটা জাহাজ, এবার রোটরস্ট্যাটের ওজনের কাছে হার মানতে যাচ্ছে... কিছুক্ষণের মধ্যেই পুরো উল্টে যাবে। হাহাকার করে উঠল ক্রু-রা, ছুরি-কাঁচি-কুঠার... যা আছে সব নিয়ে ছুটে এল ক্রেনের শরীর থেকে বেলুনটাকে মুক্ত করতে। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত এই সময় বিস্ফোরিত হতে শুরু করল টারবাইনগুলো, রোটরস্ট্যাটের ধ্বংসাবশেষে আগুন ধরে গেল... ধীরে ধীরে করাল শিখা এগিয়ে যাচ্ছে জাহাজটার দিকে।

আকাশ থেকে বিস্ফারিত চোখে ধ্বংসযজ্ঞটা চেয়ে চেয়ে দেখল অসহায় ফ্রেডারিখ কার্ন। শোকে পাথর হয়ে গেছে সে—চোখের সামনে তলিয়ে গেছে স্যাটানস্ ফিস্টের সমস্ত কার্গো, অ্যারোনটিক্স জগতে স্যাকলিচের গর্ব রোটরস্ট্যাটটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে নব্য ফ্যাসিস্ট মহানায়ক হবার সমস্ত সম্ভাবনা মিশে গেছে সাগরজলে—সব ওই মাসুদ রানার জন্য।

হঠাৎ করেই ক্রোধে উন্মাদ হয়ে গেল কার্ন। সাবমেরিনটার দিকে তাকাল, ওটার পেট থেকে আবার বের হয়ে এসেছে কয়েকজন আরোহী—ধ্বংস হয়ে যাওয়া রোটরস্ট্যাট যেন ওদেরও টেনে পানির তলায় নিয়ে না যায়, সেটা নিশ্চিত করতে মুরিং রোপটা কেটে ফেলছে। কপ্টারের পাইলটের দিকে তাকিয়ে খ্যাপাটে গলায় কার্ন হুকুম দিল, 'ওখানে নিয়ে চলো আমাকে! কুত্তার বাচ্চাগুলোর একটাকেও ছাড়ব না আমি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো, চলো!' উৎসাহ দেয়ার ভঙ্গিতে বলল ইয়োহান, টিটকিরি মারছে আসলে, ফ্যাসিস্ট বদমাশটার সাধের নীল নকশার দফারফা হতে দেখে খুশি লুকাতে পারছে না। 'এয়ারশিপ আর জাহাজের তো বারোটা বাজিয়েইছে ওরা, হেলিকপ্টারটাই বা বাদ থাকে কেন? মেশিনগান দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিলে এক্কেবারে ষোলকলা পূর্ণ হবে।'

ঝট করে মাথা ঘুরিয়ে আগুনঝরা দৃষ্টি হানল কার্ন। হিংস্র কণ্ঠে বলল, 'বুঝে-শুনে কথা বলো, ইয়োহান। খুন করে ফেলব কিন্তু!'

'করো, মানা করছে কে? তবে ওই যে... কী সব তদন্ত-টদন্তের কথা বলছিলে... ওগুলোর কথা ভুলে যেয়ো না।'

দাঁত কিড়মিড় করতে লাগল কার্ন, পিস্তলধরা হাতের মুঠি শক্ত হয়ে গেছে, যেন এখুনি গুলি করবে।

'ফ্রেডারিখ, ডিয়ার, মাথা ঠাণ্ডা করো,' অনুনয়ের সুরে বলল থেলমা। 'সবকিছু এখনও শেষ হয়ে যায়নি।' পায়ের কাছে পড়ে থাকা স্যাটানস্ ফিস্টের ছোট বাক্সটা দেখাল সে। 'এটা এখনও

আছে আমাদের কাছে।'

আগুনে যেন পানি পড়ল, থমকে গেল উন্মত্ত নয়া নাৎসি। তা-ই তো! এটার কথা তো ভুলেই গিয়েছিল একেবারে। বাক্সটা ছোট হোক, তাও স্যাটানস্ ফিস্ট ভরা তো!

'ঠিক বলেছ,' জ্বলজ্বল করছে কার্নের চোখ। 'এখনও যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি করার মত জিনিস আছে আমাদের হাতে। সুযোগ বুঝে পরে পানির তলা থেকে বাকি বাক্সগুলোও তুলে আনা যাবে। ওই মাসুদ রানা আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছে না? আমি ওর সোনার বাংলাদেশটাকেই বেছে নেব সারা দুনিয়ার সামনে স্যাটানস্ ফিস্টের ডেমোনস্ট্রেশন দেখানোর জন্য।' বাইরে চোখ ফেরাল সে—মুরিং রোপটা কেটে ফেলেছে ইউ-বোটের আরোহীরা, ভিতরে ঢুকে হ্যাচও বন্ধ করে দিয়েছে। ডুবোজাহাজটা এখন পূর্ণ গতিতে এই এলাকা ত্যাগ করছে, চলে যাচ্ছে খোলা সাগরের দিকে।

'ওরা চলে যাচ্ছে,' বলল থেলমা। 'নিশ্চয়ই কুলুসুক বা আমাসালিকে গিয়ে লোকজন নিয়ে ফিরে আসবে।'

'যা খুশি করুক,' শান্ত গলায় বলল কার্ন। 'আমরা আমাদের নিজস্ব শিডিউল ফলো করব।'

'সেই আগের প্ল্যান অনুসারে?' থেলমা অবাক।

'হ্যাঁ, আগের প্ল্যান অনুসারে,' সংক্ষেপে বলল কার্ন, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মিলিয়ে যেতে থাকা সাবমেরিনটার দিকে। আপনমনে বলে উঠল, 'মাসুদ রানা, আমার ক্ষতি করতে গিয়ে তুমি আসলে নিজের দেশটার সর্বনাশ করলে।'

উনিশ

ডিজেল-ইঞ্জিনের তৈলাক্ত ধোঁয়া আর ব্যাটারির লিক করা অ্যাসিডে সৃষ্ট গ্যাসে খোল ভরে যাওয়ায় ইউ-বোটের সবক'টা হ্যাচ খুলে দিতে বাধ্য হয়েছে যাত্রীরা। মুরল্যান্ড এখন ইঞ্জিনরুমে—পিস্টন, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, কানেক্টিং রড, অ্যাক্সেল আর ড্রাইভ ব্লক মিলে তৈরি হওয়া কল-কবজার এক জটিল জঙ্গল ঘেঁটে এভাবে ধোঁয়া বের হবার কারণ জানার চেষ্টা করছে। উদ্বেগটা বাড়ছে ক্রমেই—স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ইঞ্জিনটা এখন মরণ আর্তনাদ ছাড়তে শুরু করেছে।

দরজায় এসে উঁকি দিল রানা। 'কেমন বুঝছ?'

'ভয়াবহ,' মুরল্যান্ড বলল। 'যা বুঝতে পারছি—আইসল্যান্ড, কুলুসুক বা অন্য কোথাও যাওয়া হচ্ছে না আমাদের।' ওর গলায় তিক্ততা ফুটল। 'অন্তত দুটো সিলিন্ডারের পিস্টন রিং ভেঙে গেছে, গ্যাসকেট-ট্যাসকেট সব খুলে-টুলে একাকার। ভাগ্যিস, স্টারবোর্ড ইঞ্জিন থেকে কিছু ইঞ্জিন অয়েল স্যালভেজ করতে পেরেছিলাম। নইলে একঘণ্টাও টিকত না কিচ্ছু, উপরে গিয়ে আমাদের পাল খাটাতে হতো।'

'আপাতত তো লাগছে না,' হাসল রানা। 'একটা ডেডলাইন দিতে পারো? কতক্ষণ চালাতে পারবে ইঞ্জিনটা?'

'জানি না, চার... খুব বেশি হলে পাঁচ ঘণ্টা। যেসব জায়গায় যেতে চাই, সেগুলোর কোনওটাই কাভার করা যাবে না এই সময়ের মধ্যে। গ্রিনল্যান্ডের উপকূলে অবশ্য পৌঁছুনো সম্ভব, কিন্তু তাতে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, সেখানেই ফিরে যাওয়া হবে।'

'হুঁ, আমাদের তা হলে একটা সিদ্ধান্তে আসা দরকার।'

'সবার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করো।-সরি, আমি আসতে পারছি না, এখানেই থাকতে হবে। সবাই যা বলে, তাতেই রাজি থাকব আমি।'

ইঞ্জিনরুম থেকে বেরিয়ে কন্ট্রোল রুমে ফিরে এল রানা, হ্যাচের তলায় এসে উপরে তাকিয়ে স্যামকে ডাকল—ভাঙা কোনিং টাওয়ারে বসে সে লুকআউটের দায়িত্ব পালন করছে। এই মুহূর্তে হেলমে আছে সিলভিয়া, লিয়াও উদয় হলো—কেবিনে বিশ্রাম নিতে থাকা জুরকিচকে দেখতে গিয়েছিল ও।

ল্যাডার বেয়ে নেমে এল স্যাম। লিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'দেজান কেমন আছে?'

'ভালই,' লিয়া জানাল তাকে। 'কপালের ক্ষতটা সিরিয়াস নয় তেমন, শুধু ইনফেকশন না হলেই হয়। অ্যান্টিবায়োটিক খাইয়ে এলাম।'

'সবাই শোনো,' বলল রানা। 'ছোট একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে, পরবর্তী করণীয় ঠিক করার জন্য সবার মতামত প্রয়োজন।'

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল সিলভিয়া।

'ববি বলছে, ইঞ্জিনের অবস্থা খুব খারাপ, পাঁচ ঘণ্টা পর আমরা কোনও রকম পাওয়ার ছাড়া সাগরে ভাসতে থাকব। দুঃখের বিষয়, ওই সময়ের মধ্যে পূর্বদিকের আইসল্যান্ড, বা দক্ষিণে কুলুসুক—কোথাও পৌঁছানো সম্ভব নয়।'

'অন্য কোথাও?'

'উঁহুঁ, ওই দুটো জায়গাই এই মুহূর্তে সবচেয়ে কাছে। আর কোথাও যেতে চাইলে আরও বেশি সময় লাগবে।'

'গ্রিনল্যান্ডে আবার ফিরে যেতে পারি না?' জানতে চাইল স্যাম।

'তা পারি, কিন্তু সেক্ষেত্রে আবারও বরফের মাঝখানে দ্বীপান্তরে

পড়ব। রেসকিউ পার্টি কবে আসবে, আদৌ আসবে কি না, বা এলেও আমাদের খুঁজে পাবে কি না—যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অনির্দিষ্টকাল চলার মত খাবার-দাবারও নেই আমাদের কাছে।'

'ফায়ার আর্মস তো আছে! সিল মাছ শিকার করে খাব।'

'মুখে মুখে কাজটা সহজ, করতে গেলে যথেষ্ট কঠিন। একটানা কতদিন আপনি সিল মাছ খেয়ে আর ঠাণ্ডা সহ্য করে পড়ে থাকবেন, বলুন তো? তা ছাড়া আরও সমস্যা আছে। আমরা উপকূলের কাছে গিয়ে যখন সাবমেরিন থেকে নামব, ওটা তো থেকে যাবে পানিতে। জিয়ো-রিসার্চের হেলিকপ্টার আকাশপথে যাবার সময় স্পট করে ফেলবে ওটা, কার্ন তখন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমাদের শিকার করতে আসবে।'

চুপ হয়ে গেল সবাই। সমস্যার গভীরতা বুঝতে পারছে।

'এখন তা হলে কী করতে চাও?' সাগ্রহে প্রশ্ন করল লিয়া, মনে আশা—রানা নিশ্চয়ই কোনও পথ বের করে রেখেছে।

'দুঃখিত,' রানা মাথা নাড়ল। 'এই মুহূর্তে আমার মাথাতে কোন আইডিয়া নেই।'

'সেক্ষেত্রে আমি একটা পরামর্শ দিতে পারি?'

জুরকিচের গলা শুনে চমকে উঠল সবাই, ঘাড় ফেরাতেই দেখল, বাল্কহেড ধরে ধরে কন্ট্রোল রুমে এসে ঢুকেছে সে।

'আপনি আবার উঠে এলেন কেন?' বিরক্ত গলায় বলল লিয়া। 'বিশ্রাম নিতে বলে এসেছিলাম না?'

দুর্বলভাবে হাসল আবহাওয়াবিদ। 'সবাই মিলে মিটিং করছেন, আমি কীভাবে শুয়ে থাকি, বলুন?'

'আসুন,' একটা টুল বাড়িয়ে দিল রানা। 'এসেই যখন পড়েছেন, বসুন। কী পরামর্শ যেন দিতে চাইলেন... তাড়াতাড়ি দিয়ে ফেলুন। আমরা অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছি।'

'আগে বলুন, আজ কত তারিখ।' বলল জুরকিচ।

'পনেরো...' থেমে হিসেব করে নিল রানা। 'হ্যাঁ, পনেরোই

তো। কেন?'

'জাস্ট আ মিনিট,' চোখ বন্ধ করে কী যেন স্মরণ করার চেষ্টা চালাল জুরকিচ। তারপর রানার দিকে ফিরল। 'চার্টে আমাদের পজিশনটা দেখাতে পারেন?'

'হ্যাঁ, এই তো।' পেন্সিল দিয়ে ডেনমার্ক প্রণালীর চার্টে একটা বিন্দু দেখাল রানা, গ্রিনল্যান্ড থেকে আশি মাইল পুবে।

পেন্সিলটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিল আবহাওয়াবিদ। মনে মনে হিসেব করল কী যেন, তারপর প্রণালী বরাবর একটা লাইন টানল। বলল, 'এই লাইনের কোনও পয়েন্টে কি পাঁচ ঘণ্টার ভিতর পৌঁছুতে পারবেন?'

মন দিয়ে ওটা দেখল রানা। বলল, 'হ্যাঁ, যাবে বোধহয়। কিন্তু কেন? কী এটা?'

'এটা একটা কোর্স, মি. রানা,' জুরকিচ হাসল। 'এই কোর্স ধরে একটা জাহাজ আসছে... আমরা তাদের কাছে লিফট চাইতে পারি।'

'দাঁড়ান, দাঁড়ান, কী জাহাজ ওটা? আপনিই বা ওটার কোর্স জানলেন কী করে?'

'ওই জাহাজে আমাদের এক ভাই আছে, তার কাছ থেকেই জেনেছি। গ্রিনল্যান্ডের পাশ দিয়ে যাবে তো জাহাজটা, দরকার হলে যেন তার সাহায্য নিতে পারি, এজন্যই জানিয়ে রাখা হয়েছে কোর্স আর ভয়েজ প্ল্যান।'

'আপনার এই ভাই... ব্রাদারহুডের সদস্য?' জিজ্ঞেস করল রানা, জুরকিচ মাথা ঝাঁকাচ্ছে দেখে বলল, 'ডেনমার্ক প্রণালীতে জাহাজই চলাচল করে কদাচিৎ। সেখানে ব্রাদারহুডের একটা লোক কোন জাহাজে করে...' কথাটা শেষ না করে থেমে গেল ও। ধরতে পেরেছে ব্যাপারটা। উত্তেজিত গলায় বলল, 'ভদ্রলোক কি কোনও প্রিস্ট?'

'আপনার মত বুদ্ধিমান লোক আমি খুব কম দেখেছি, মি.

রানা,' জোরে হেসে উঠল জুরকিচ। 'ইশারা দিতে না দিতে সব বুঝে ফেলেন।'

'ব্যাপারটা কী?' বোকা বোকা গলায় বলল স্যাম।

'এই দিকে একটা জাহাজেরই আসার কথা জানি আমি,' রানা ব্যাখ্যা করল। '*সী-এম্প্রেস*—যেটায় নতুন পোপ ধর্মীয় মহাসম্মেলন করছেন। ব্রাদারহুডের এক প্রিস্ট আছেন ওটায়।' জুরকিচের দিকে ফিরল ও। 'ওখানে আপনাদের কী কাজ?'

'পঞ্চাশ নম্বর আইকনটার কথা বলেছিলাম না? যেটা লুঠ হয়ে গিয়েছিল?' জুরকিচ বলল। 'কিছুদিন আগে আমরা জানতে পেরেছি, বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে ওটা ভ্যাটিক্যানের আর্কাইভে পড়ে আছে। ইস্টার্ন অর্থোডক্স চার্চকে পোপ যেসব ধর্মীয় নিদর্শন ফিরিয়ে দিচ্ছেন, তার মধ্যে ওটাও আছে। আইকনটা রিসিভ করার জন্য গেছেন ফাদার আন্তন নভোস্কি।'

'কিন্তু ইউনিভার্সাল কনভোকেশনটা তো হাজারো নিরাপত্তায় ঘেরা। আপনারা আগেভাগে সি-এম্প্রেসের কোর্স জানলেন কীভাবে?'

'বড় বড় ধর্মীয় নেতাদের কাছে অনুমোদনের জন্য রুটটা পাঠানো হয়েছিল আগেই। তখনই ফাদার নভোস্কি তাঁর সফরদলের নেতা বিশপ আকিনফিভের অফিস থেকে গোপনে ওটার একটা কপি তৈরি করে আনেন। আমাদের টিমটা যেহেতু একই সময়ে গ্রিনল্যান্ডে থাকবে, তাই কোর্সটা জানিয়ে রাখা হয় আমাদের।'

'তার মানে এতে কোনও ভুলচুক হবার সুযোগ নেই... সত্যিই আসরে জাহাজটা এদিকে?'

'অবশ্যই।' জোর দিয়ে বলল জুরকিচ।

'হুঁ,' সি-এম্প্রেসে চড়ার সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলল রানা। 'স্যাম, ববিকে গিয়ে বলে আসুন ব্যাপারটা। যে করেই হোক, পাঁচ ঘণ্টার ভিতর আমাদের ওই শিপিং লেনে পৌঁছুতে হবে।'

সাড়ে চার ঘণ্টা পর।

মুরল্যান্ডের অক্লান্ত পরিশ্রম এখন পর্যন্ত টিকিয়ে রেখেছে শেষ অবস্থায় পৌঁছে যাওয়া ইঞ্জিনটাকে, রোবটের মত সে খেটে যাচ্ছে গত কয়েকটা ঘণ্টা। তবে বেচারার এত খাটুনি পণ্ডশ্রমে পরিণত হবে কি না, তা বোঝা যাবে কিছুক্ষণের ভিতরে।

'স্যাম! লোকেশন?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল রানা, এই মুহূর্তে কোনিং টাওয়ারের লুকআউট পজিশনে আছে ও, সি-এম্প্রেসকে স্পট করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে।

হ্যাচের ঠিক নীচে দেখা গেল স্যামকে। জানাল, 'শিপিং লেন আর দু'মাইল দূরে। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাব।'

'সেক্ষেত্রে ববিকে বলুন আর.পি.এম কমাতে, স্পিডের কারণে আমরা যেন জায়গাটা ওভারশুট না করি।'

সোজা হয়ে আবার সামনে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল রানা, জাহাজটাকে আগেভাগে দেখে ওদের পজিশন ঠিক করতে হবে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, রাতটা পরিষ্কার, আকাশে ছিঁটেফোঁটা মেঘও নেই। অরোরা বোরিয়ালিস তার সম্পূর্ণ রং-রূপ নিয়ে ঝলমল করছে। সাগরও শান্ত, আয়নার মত সমতল হয়ে আছে পানির উপরিভাগ, ঢেউ-টেউ একদমই বোঝা যাচ্ছে না। রানা শুনেছে—*টাইটানিক* ডোবার সময়ও নাকি সাগর এমনই শান্ত ছিল। ওদের কপালেও তেমন কিছু ঘটবে না তো? কিংবদন্তির জাহাজটার মত আইসবার্গে ধাক্কা খেয়ে তলিয়ে যেতে হবে না তো ওদেরকেও! অবশ্য তেমন দুশ্চিন্তা বোধ করছে না রানা, মেরুজ্যোতির কারণে চারপাশটা মোটামুটি আলোকিত বলা চলে। সামনে আইসবার্গ পড়লে আগেভাগেই দেখে এড়িয়ে যেতে পারবে।

পিছনে পায়ের শব্দ... হ্যাচ গলে বেরিয়ে এসেছে লিয়া। রানার দিকে দুটো প্রোটিন বার বাড়িয়ে ধরে বলল, 'ডিনার!'

হেসে খাবারটা নিল রানা, বলল, 'প্রার্থনা করো, যাতে এটাই আমাদের শেষ প্রোটিন বার খাওয়া হয়। উপরঅলা সাহায্য করলে

আগামী খাবারটা বিলাসবহুল একটা প্রমোদতরীতে হবে আমাদের।'

'সম্ভাবনা কতটুকু?' জিজ্ঞেস করল লিয়া। 'কিছু দেখতে পেয়েছ?'

মোড়ক খুলে একটা কামড় বসাল রানা। চিবাতে চিবাতে মাথা নাড়ল, তারপর ঢোক গিলে জানাল, 'এখনও দেখিনি, তবে আশা করছি খুব শীঘ্রি দেখতে পাবো। আকাশে আলো আছে, তা ছাড়া শিপটাতেও প্রচুর বাতি জ্বলার কথা।'

চুপ হয়ে গেল লিয়া, নীরব রইল বেশ কিছুক্ষণ, দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছে। রানার খাওয়া শেষ হলে পানির বোতলটা এগিয়ে দিল। দুই চুমুক দিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা, 'কী হয়েছে?'

'কই, কিছু না তো!'

'কিছু একটা তো বটেই,' হাসল রানা। 'কী ভাবছ খুলে বলো আমাকে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিয়া। বলল, 'নিজের কথাই ভাবছিলাম, গত কয়েকটা দিনে অনেক বদলে গেছি আমি।'

মাথা কাত করে লিয়াকে আপাদমস্তক দেখার ভান করল রানা, হালকা গলায় বলল, 'কই, আমার চোখে তো কোনও পরিবর্তন ধরা পড়ছে না। এখনও আগের মত দুই হাত, দুই পা আর একটা মাথাই দেখতে পাচ্ছি। কোনওটা বাড়ে-কমেনি।'

'ফাজলামি না, রানা। আমি সিরিয়াস। অনেক বদলে গেছি আমি। অন্যভাবে দেখতে শুরু করেছি পৃথিবীটাকে।'

'স্বাভাবিক,' সায় দিল রানা। 'যে সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছ, তাতে ভিতরটা বদলানোরই কথা। নিশ্চিত মৃত্যু আর মানুষের পৈশাচিকতা দেখে কেউ আর আগের মত থাকতে পারে না।'

'তাই বলে এতটা? গত কয়েকটা দিন সারাক্ষণ আমার মাথায় কী ঘোরে, জানো? কার্ন লোকটাকে খুন করার চিন্তা। ওকে হাতের

কাছে পেলে কীভাবে কষ্ট দিয়ে তিলে তিলে মারা যায়, এসব নিয়ে স্বপ্ন দেখি আমি। ভয়ের কথা হচ্ছে, ব্যাপারটা নিয়ে একটুও অপরাধবোধে ভুগি না, বরং আনন্দ পাই। এসব কি কোনও সুস্থ মানুষের লক্ষণ?'

'মাথায় এলোমেলো চিন্তা এলেই সেটা নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ার কিছু নেই। তুমি শুধু ভাবছ, কাজে তো পরিণত করছ না। তা ছাড়া ফ্রেডারিখ কার্ন আমাদের সবাইকে যেভাবে ভুগিয়েছে... তার কারণে আমাদের চোখের সামনে পরিচিত কয়েকটা নিরপরাধ মানুষ যেভাবে মারা গেছে, তাতে ওকে খুন করে ফেলার ইচ্ছে হলে কাউকে দোষ দেয়া যায় না। শোনো লিয়া, পৃথিবীতে মানুষরূপী কিছু পিশাচ থাকে—তাদের বধ করলে কোনও ক্ষতি হয় না, বরং পুরো পৃথিবীর উপকার হয়।'

'এভাবেই ভাবো তুমি? এভাবেই তোমার হাতে মারা যাওয়া মানুষগুলোর ব্যাপারে বিবেককে সান্ত্বনা দাও?'

'আমি নিজেকে কখনও সান্ত্বনা দিই না, লিয়া,' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল রানা। 'মানুষ হোক বা পিশাচ—প্রতিটা মৃত্যুর দায় আমি মেনে নিই। ন্যায়-অন্যায়ের বোঝা পুরোটাই আমার কাঁধে থাকে। সান্ত্বনা বা যুক্তি দেখিয়ে কখনও নিজেকে হালকা করার চেষ্টা করি না।'

'এত বড় ভার নিয়ে তুমি নিজেকে সামলাও কীভাবে?'

'যেভাবে তোমরা ডাক্তাররা নিজেদের সামলাও! যারা মরেছে, তাদের নিয়ে মাতম না করে বরং যাদের বাঁচানো গেছে, তাদের কথা ভেবে।'

'কত মানুষ মেরেছ তুমি, রানা? কতবার তোমাকে আজকের মত নিষ্ঠুর হতে হয়েছে?'

'সে হিসেব চেয়ো না, আমাকেও পিশাচ মনে হবে। তোমার চোখে নিজেকে ভালমানুষ হিসেবে জাহির করতে চাই না আমি, অনেক দোষত্রুটি আছে আমার। তবে জেনে রাখো, প্রয়োজনের

বাইরে একটা মানুষও কখনও মরেনি আমার হাতে।'

আর কিছু বলল না লিয়া, রানার কথাগুলোতে কীসের যেন বেদনার সুর... ওর হাতে হাত রাখল সে। দুজনে নীরবে তাকিয়ে রইল দিগন্তের দিকে।

কিছুক্ষণ পর বিকট শব্দ ভেসে এল নীচ থেকে, ঝাঁকি খেয়ে থেমে গেল ইউ-বোট—ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। হাত ছেড়ে কন্ট্রোল রুমে তাড়াতাড়ি নেমে এল রানা আর লিয়া।

রানা বলল, 'স্যাম, লুকআউটে চলে যান। আমি এদিকটা দেখছি।'

স্যাম ল্যাডার বেয়ে উপরে চলে যেতেই চার্ট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ও। একটু পর মুরল্যান্ড উদয় হলো। 'সরি, রানা। শালীর ইঞ্জিনটা আর কথা শুনল না, বন্ধই হয়ে গেল।'

টেবিল থেকে মাথা তুলে রানা বলল, 'এমন গালাগাল দিলে কেউ কথা শোনে! মেশিনারি আর জাহাজের সঙ্গে নরম ব্যবহার করতে হয়, এটা জানো না?'

মুরল্যান্ড মহাবিরক্ত। 'জানি, জানি। কিন্তু এ বেটি হলো জার্মান, এই জাতের সঙ্গে গালাগাল ছাড়া কাজ হয় না।' সিলভিয়া হেল্‌ম্ থেকে কটমট করে ওর দিকে তাকাচ্ছে দেখে আঁতকে উঠে বলল, 'না, না, সিলভিয়া ডিয়ার। আমি বলছিলাম যন্ত্রপাতির কথা, জার্মান মেয়েরা ভিন্ন ব্যাপার—তাদের মত লাস্যময়ী, মায়াবতী আর কোমলমতি তো হয়-ই না।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল রানা। মুরল্যান্ড হাত জোড় করে ফিসফিস করে বলল, 'মাফ করে দাও, দোস্ত। তোমার হাসিতে আমার জান চলে যাবে।'

'ঠিক আছে, থামলাম। কিন্তু জাহাজের খবর বলো। আমার হিসেব বলছে, শিপিং রুটের ঠিক মাঝখানটায় এসে গেছি আমরা।' চার্টটা বন্ধুকে দেখাল রানা। 'যদি পজিশনটা অন্তত ধরে রাখতে পারি, পিছন থেকে আসতে দেখব সি-এক্সপ্রেসকে। তবে সেজন্য

ড্রিফট ঠেকাতে হবে। ইঞ্জিন ছাড়া সেটার কোনও ব্যবস্থা করা যায়?'

'অলরেডি করে রেখেছি,' মুরল্যান্ড জানাল। 'ব্যাটারিগুলো দিয়ে স্টিয়ারিং সিস্টেমে ব্যাকআপ পাওয়ার দিচ্ছি। এখন ওগুলোই চলছে। সামনে-পিছে খুব বেশি যেতে পারবে না, তবে ড্রিফট ঠেকিয়ে এক জায়গায় থাকতে পারবে। বুদ্ধি করে হুইল ঘোরাতে হবে আরকি! স্রোতটা কাজে লাগাতে হবে।'

'সিলভিয়া, হেলম্ কাজ করছে?' জানতে চাইল রানা।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জার্মান রাঁধুনি। 'হ্যাঁ, হের রানা।'

'ধরে রাখতে পারবে পজিশনটা?'

'আশা তো করি।'

'গুড।' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'কতক্ষণ চালাতে পারবে এভাবে?'

'বেশি না, মাত্র বিশ মিনিট। সরি, রানা। ব্যাটারিগুলোর আয়ুও ফুরিয়ে এসেছে।'

'হুঁ, এখনই হতাশ হবার কিছু দেখছি না। দেজানের হিসেব যদি ঠিক থাকে, তা হলে বিশ মিনিটের আগেই এসে পড়া উচিত জাহাজটার।'

'বাই দ্য ওয়ে, এই ব্যাপারেই তোমাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম,' মুরল্যান্ডকে সিরিয়াস দেখাল। 'সী-এম্প্রেসে কীভাবে উঠবে বলে ঠিক করেছ তুমি? আমাদের রেডিও নেই, ওদের সঙ্গে কথা বলতে পারব না। নেভিগেশন লাইটও নেই যে সিগনাল দেব। বরং যেভাবে রুটের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়েছ, তাতে সাবমেরিনটাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে ওটা।'

হাসল রানা। 'সী-এম্প্রেসের ছবি দেখোনি কখনও? ওটা একটা টুইন-হালের ক্যাটামারান শেপের জাহাজ। দুই খোলের মাঝখানটা দিয়ে ছোট-খাট জাহাজ ওঠানো-নামানো যায়... এমনকী ওয়াটার লাইনের সামান্য উপরে ডকের মতও আছে।

সাবমেরিনটা শুধু অ্যালাইন করে ফাঁকটায় ঢোকাতে হবে আমাদের, তা হলে আপার ডেক থেকে লাফ দিয়েই উঠে যাওয়া যাবে ডকে।'

'সর্বনাশ! এত কিছু জানো কী করে তুমি?'

'ওমা! ইন্টেলিজেন্সে কাজ করি, ইউনিভার্সাল কনভোকেশনের মত একটা আন্তর্জাতিক ঘটনার উপর চোখ রাখব না? নিউ ইয়র্ক থেকে রওনা দেয়ার আগেই বিসিআই-এর পাঠানো সি-এম্প্রেস সংক্রান্ত রিপোর্টটায় চোখ বুলিয়ে এসেছি আমি।'

'যত যা-ই বলো, স্কুলে টীচাররা নিশ্চয়ই দু'চোখে দেখতে পারত না তোমাকে।'

'কেন?' রানা অবাক কথাটা শুনে।

'কোন প্রশ্ন দিয়েই যে আটকানো যায় না... সব কিছুরই একটা জবাব থাকে তোমার কাছে!'

হেসে ফেলল রানা আর লিয়া।

ঠিক তখুনি হ্যাচ দিয়ে শোনা গেল স্যামের চিৎকার। 'রানা! সি-এম্প্রেস!! জাহাজটাকে দেখতে পাচ্ছি আমি!!!'

দুদ্দাড় করে কোনিং টাওয়ারে উঠে এল রানা, মুরল্যান্ড আর লিয়া। স্যাম ইউ-বোটের পিছন দিকটা আঙুল তুলে দেখাচ্ছে, ওরা তাকাল সেদিকে।

মেরুজ্যোতির আলো-আঁধারিতে দিগন্তের কাছে একটা কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে—ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে ওটা, সারা শরীর জুড়ে এত আলো জ্বলছে যে, মনে হচ্ছে ঝলমল করতে থাকা একটা চাঁদোয়া ভাসছে পানিতে। মনে মনে দ্রুত হিসেব করে নিল রানা, মোটামুটি তিন মাইল দূরে আছে সি-এম্প্রেস। ঘণ্টায় যদি ছয় থেকে সাত নট গতিতে চলে, তা হলে পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে এসে পড়বে ওদের কাছাকাছি।

'ববি, টাইমিংটা একেবারে কাঁটায় কাঁটায় এসে যাচ্ছে। ব্যাটারি পাওয়ার ফেল হতে দেয়া যাবে না আমরা ওটায় না ওঠা পর্যন্ত। নীচে গিয়ে দেখো, পাঁচ-দশ মিনিট বাড়ানো যায় কি না ওগুলোর

আয়ু। বাতি-টাতি যা আছে, সব নিভিয়ে দাও।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল মুরল্যান্ড। এবার স্যামের দিকে তাকাল রানা। 'আপনি গিয়ে হেলমে বসুন। আমি উপর থেকে গাইড করছি, সাবমেরিনটাকে সি-এক্সপ্রেসের ম্যারিনার সঙ্গে অ্যালাইন করতে হবে।'

'আমি কী করব?' লিয়া জানতে চাইল।

'দেজানকে ডেকে তোলো,' বলল রানা। 'তারপর হ্যাচের নীচে এসে দাঁড়াও। স্যামকে আমি যা যা অর্ডার দেব, সব রিপিট করবে।'

স্যাম আর লিয়াও চলে গেল, বিনকিউলার তুলে চোখে ঠেকাল রানা।

দশ মিনিটের ভিতরই প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়ল সুবিশাল ক্রুজ শিপটা, এত কাছে চলে এসেছে যে পোর্টহোলগুলোর আলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার, বো'র প্রতিটা খুঁটিনাটি বোঝা যাচ্ছে। দুই হালের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া চ্যানেলটা বেশ প্রশস্ত, সাবমেরিনটাকে অ্যালাইন করতে তেমন বেগ পেতে হলো না।

আরও কয়েক মিনিট পার হতেই ওদের ধরে ফেলল সি-এক্সপ্রেস। টুইন হাল আর সেগুলোকে সংযুক্ত করা উইঙের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া গ্যাপে ইউ-বোটটা যখন ঢুকে যাচ্ছে, কোনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে রানার মনে হলো বিশাল কোনও জলরাক্ষস হাঁ করে গিলে খাচ্ছে ওদের। চোখে বিনকিউলার লাগিয়ে ইন্টেগ্রেটেড ম্যারিনাটা দেখে নিল ও। পোর্ট সাইডের খোলে ছোটখাট একটা গুহার মত ওটা—ওয়াটার লাইনের সামান্য উপরে ফাইবারগ্লাসে তৈরি জেটি আছে একটা, গুহার ভিতরে শুরু হয়ে বেরিয়ে এসেছে চ্যানেলের দৈর্ঘ্য বরাবর। জেটির অন্যপাশেই বড় বড় গ্যারাজ ডোর, ভিতরে মুভেবল স্লিপওয়েতে বসিয়ে রাখা হয়েছে সি-এক্সপ্রেসের সমস্ত এক্সকারশন বোট আর কেবিন ক্রুজার, খুব সহজে পানিতে নামানো যায়। মাথার উপরে উইঙের

তলায় বসানো একটা ক্রেনও দেখা গেল, ছোটখাট জাহাজ এবং কার্গো তাতে তুলে নেয়া যাবে।

'স্যাম, স্টারবোর্ডে আসুন। ডকের পাশে ভিড়তে হবে আমাদের, নইলে নামা যাবে না।'

লিয়া নির্দেশটা রিপিট করতেই নাক ঘোরাল সাবমেরিন, ইনার হালের কাছাকাছি চলে যাচ্ছে।

'হয়েছে!' দূরত্বটা দশ ফুটে ঠেকতেই চেঁচাল রানা। 'সমান্তরাল করুন এবার।'

চলন্ত জাহাজের সঙ্গে সঙ্গে জেটিটা এগিয়ে আসছে দ্রুত, ইউ-বোটের সবাইকে আপার ডেকে উঠে আসতে নির্দেশ দিল রানা। নিজেও কোনিং টাওয়ার থেকে নেমে বো'র কাছে চলে এল। সি-এম্প্রেসের খোলের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ঢেউ উঠে আসছে সাবমেরিনের ডেকে, একেকবার প্রায় হাঁটু পর্যন্ত ডুবিয়ে দিচ্ছে, দলের সদস্যদের পরস্পরকে ধরে রাখতে বলল ও, যাতে পানির ধাক্কায় চ্যানেলে গিয়ে না পড়ে।

এসে গেছে জেটির কিনারা, সবার আগে লাফ দিল মুরল্যান্ড, সাবলীলভাবে গিয়ে উঠল ফাইবারগ্লাসের ডকে। এরপর লাফ দিল স্যাম, লিয়া আর জুরকিচ, প্রথম দুজনের তেমন অসুবিধে হলো না, তবে আবহাওয়াবিদ ল্যান্ড করল ঠিক কিনারায়, আরেকটু হলে পড়েই যেত, তাড়াতাড়ি মুরল্যান্ড আর স্যাম তাকে ধরে ফেলল।

'ওকে সিলভিয়া, এবার তুমি,' বলল রানা।

'পারব না... আমাকে দিয়ে হবে না, হের রানা,' ভয়ার্ত গলায় বলল জার্মান রাঁধুনি, চলন্ত জাহাজটায় লাফ দেয়ার সাহস পাচ্ছে না, ভারী শরীর নিয়ে এই দূরত্ব পার হতে পারবে বলেও আত্মবিশ্বাস নেই তার মধ্যে।

'পারতেই হবে!' কড়া গলায় বলল রানা। 'হারি আপ, আমি সাহায্য করছি।'

মাথা নেড়ে দু'পা পিছিয়ে গেল সিলভিয়া, সারা শরীর কাঁপছে

রাঁধুনির—ঠাণ্ডা এবং নার্ভাসনেসে। দাঁতে দাঁত পিষল রানা—জোর করে লাফ দিতে বাধ্য করে লাভ নেই ওকে, ডকে উঠতে পারবে না, সোজা পানিতে গিয়ে পড়বে। শরীরটাও এমনই ভারী যে, রানার পক্ষেও ওকে কাঁধে তুলে লাফ দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়। কোমরে পানির স্পর্শ পেয়ে আঁতকে উঠল ও, এতক্ষণ খেয়াল করেনি—বায়ু চলাচলের জন্য খুলে রাখা হ্যাচগুলো দিয়ে প্রবলবেগে সাবমেরিনের খোলের ভিতর ঢুকছে সি-এম্প্রেসের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে ফিরে আসা পানি, ডুবে যাচ্ছে ওদের প্রিয় ইউ-১০৬২! ইতোমধ্যে তলিয়ে গেছে কয়েক ফুট, শুরুতে হাঁটু ছোঁয়া প্রবাহটা এখন উঠে এসেছে কোমরে! যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে, ওয়াটার লাইনের বেশি তলায় চলে গেলে ডকে ওঠা কঠিন হয়ে যাবে।

'কী হলো? আসছ না কেন?' মুরল্যান্ড অস্থিরভাবে জিজ্ঞেস করল।

'সিলভিয়া লাফ দিতে পারবে না।'

'শিট! কী বলছ এসব?'

'কুইক ববি, দেয়ালে কোনও লাইফবয় ঝোলানো আছে কি না দেখো।'

'এই যে!' স্যাম তার পিছন থেকে একটা খুলে ছুঁড়ে দিল রানার দিকে।

খপ করে জিনিসটা ধরে ফেলল রানা। নেড়ে চেড়ে দেখে স্বস্তি পেল—হ্যাঁ, এটার সঙ্গে লম্বা একটা লাইন সংযুক্ত আছে... জাহাজ থেকে পড়ে যাওয়া মানুষকে যাতে টেনে উঠিয়ে আনা যায়, সেজন্যই এ ব্যবস্থা। লাইফবয়টা সিলভিয়ার মাথা দিয়ে ঢুকিয়ে লুপের মত বগলের তলায় আটকে দিল ও, বলল, 'শক্ত করে ধরে থেকো, ঠিক আছে?' এরপর রশিটার অপরপ্রান্তটা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে এল ডকে। চেঁচিয়ে বলল, 'ডেক থেকে পানিতে নেমে পড়ো, সিলভিয়া।'

নার্ভাস হলেও কথামত কাজ করল জার্মান রাঁধুনি, সবাই মিলে তাকে দড়ি ধরে টেনে উঠিয়ে আনল ডকে। কয়েক সেকেন্ড পরেই ডুবন্ত ইউ-বোটটা পিছে পড়ে রইল, ওটা আস্তে আস্তে চ্যানেলের বাইরে চলে যাচ্ছে। সেদিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, বিপদের সময় বড্ড কাজ দিয়েছিল বাহনটা, এভাবে ফেলে যেতে মায়া লাগছে।

'থ্যা...থ্যাঙ্ক ইউ, হের রানা,' ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে বলল সিলভিয়া। 'আপনি না থাকলে আমার আর বাঁচতে হতো না।'

'ধন্যবাদ দিতে হবে না,' হাসল রানা। 'দয়া করে আগামীতে খাবারে চর্বির পরিমাণ একটু কমিয়ে দিয়ো, যাতে লাফ দিয়ে অন্তত পাঁচ ফুট পেরোতে পারো।'

'কথা দিচ্ছি—দেশে ফিরেই ডায়েটিং শুরু করব আমি।'

হাসল সবাই।

'জাহাজে তো উঠলাম, এবার কী?' জানতে চাইল স্যাম।

'কী আবার... এক্ষুনি একটা কেবিন দখল করতে হবে আমাদের,' বলল মুরল্যান্ড। 'রুম সার্ভিসে খবর দিয়ে আনাতে হবে গরম গরম খাবার আর স্কচ হুইস্কি... কেউ কিছু জানতে চাইলে পরে সব খুলে বললেই হবে।'

'ব্যাপারটা বোধহয় এত সহজ হবে না,' বলে উঠল লিয়া, তার গলায় ভয়ের সুর।

ঝট্ করে বাকিরা তাকাল ওর দিকে। বিস্মিত গলায় রানা জানতে চাইল, 'কেন, কী হয়েছে?'

ডক থেকে শিপের ভিতরে যাবার একটা লোহার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লিয়া, আঙুল তুলে দরজার গায়ে লাগানো একটা পিতলের ফলক দেখাচ্ছে। 'এখানে কী লেখা আছে, জানো?'

'কী?'

'জাহাজটার মালিক *রাইনস্‌মেরিন* নামে একটা কোম্পানি...

সেই সঙ্গে এটাও লিখেছে—ওটা স্যাকলিচ এজি-র একটা অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান!'

বিশ

খবরটা এমনই অপ্রত্যাশিত যে, কেউ কোনও কথা বলতে পারল না। রানাও নিশ্চুপ, এগিয়ে এসে দরজাটা পরীক্ষা করল—ওটা ভিতর থেকে তালা মারা। ইঞ্জিনে কাজ করার সময় পকেটে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার রেখেছিল মুরল্যান্ড, ওটা চেয়ে নিল ও। কিছুক্ষণের মধ্যেই তালাটা ভেঙে দরজাটা খুলে ফেলল, নীরবে সবাইকে নিয়ে ঢুকে পড়ল শিপের ভিতর।

দরজার ওপারে মাঝারি আকারের একটা বোট গ্যারাজ, এক কোণে কাঁচ-ঘেরা একটা অফিসের মতও আছে। স্ক্রু-ড্রাইভারটা মুরল্যান্ডের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অফিসটায় এসে ঢুকল রানা, শিপের ভিতরে বিরাজ করা আরামদায়ক উষ্ণতা পেয়ে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল, হাত থেকে খুলে ফেলল গ্লাভদুটো। ওর পিছু পিছু অন্যেরাও এসেছে।

নীরবতাটা অসহ্য হয়ে ওঠায় স্যাম বলল, 'রানা, কিছু বলছেন না যে?'

'কী বলব?'

'কী ভাবছেন, সেটা বলুন। স্যাকলিচ কর্পোরেশনের একটা জাহাজ এই এলাকায় ঠিক এই সময়টায় হাজির... এটা কি কো-ইনসিডেন্স?'

'তা যে হতেই পারে না, সেটা তো সবাই বুঝতে পারছেন

নিঃসন্দেহে। বড্ড ধুরন্ধর লোক এই ফ্রেডারিখ কার্ন। আমার ধারণা, সি-এম্প্রেস তার ট্রান্সপোর্ট শিপ। জাহাজের হাই-প্রোফাইল ভিভিআইপিদের লাগেজের সঙ্গে প্যান্ডোরা বক্সগুলো পাচারের জন্যই এটাকে এদিকে এনেছে সে।'

'সেটা কীভাবে সম্ভব?' লিয়া বিভ্রান্ত। 'এই জাহাজ ভ্যাটিক্যানের ভাড়া করা, রুটটাও তারাই নির্ধারণ করেছে। এটা বোলো না যে, স্বয়ং পোপ কার্নের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন।'

'তা বলছি না,' রানা মাথা নাড়ল। 'তবে তাঁকে হয়তো লেজে খেলানো হয়েছে। সাইনোডের জন্য জাহাজ খোঁজা হচ্ছিল, স্যাকলিচ থেকে হয়তো কম ভাড়ায় সি-এম্প্রেসকে দেয়ার অফার করা হয়েছিল। তা ছাড়া অরোরা বোরিয়ালিসের স্বর্গীয় আলোয় সম্মেলন করার আইডিয়াটাও স্যাকলিচই দিয়ে থাকতে পারে। কম ভাড়ায় এমন চমৎকার একটা জাহাজ, সঙ্গে আবার লোভনীয় পরিবেশে সম্মেলন করার সুযোগ... পোপের জায়গায় আমি হলেও রাজি হয়ে যেতাম।'

'এসব নিয়ে এত দুশ্চিন্তার কী আছে, বুঝতে পারছি না,' সিলভিয়া বলল। 'বাক্সগুলো তো সব সাগরে তলিয়ে গেছে, কার্নের প্ল্যানও মাটি হয়ে গেছে। এখানে জাহাজটা থাকা না থাকায় কী আর এসে যায়?'

'ব্যাপারটা অতটা সোজা মনে হচ্ছে না আমার,' রানা মাথা নাড়ল। 'বাক্স না থাকুক, কার্ন থাকতে পারে এখানে। তাড়াতাড়ি পালাতে হবে তার, অথরিটির সাহায্য নিয়ে আমরা তাকে গ্রেফতার করবার জন্য ফিরে যাবার আগেই। নিজোর্ডে করে কোথাও যেতে পারবে না, জাহাজটাকেই বরং আটক করা হবে সবার আগে। লজিক বলছে—একমাত্র সি-এম্প্রেসে করেই নিরাপদে পালাতে পারে সে ও তার বস।'

'আমরা তা হলে এখন কী করব?' জিজ্ঞেস করল লিয়া।

'সিম্পল—ওদেরকে আটকাবো।'

'তা কি সম্ভব হবে? জাহাজটা ওদের, নিজস্ব লোকজনও নিশ্চয়ই আছে।'

'তা তো থাকবেই। কিন্তু পুরো জাহাজের সিকিউরিটি দেখছে পোপের নিরাপত্তা বাহিনী। ওদেরকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারলে আমাদের আর কিছু করতে হবে না, সুইস গার্ডরাই কার্ন আর তার সঙ্গী-সাথীদের ব্যবস্থা নেবে।'

'আমাদের কথা কেন শুনবে ওরা?' হতাশ গলায় বলল স্যাম। 'চেহারা-সুরত দেখেছেন নিজেদের? রিফিউজির মত দেখাচ্ছে আমাদের, তার উপর জাহাজে উঠেছি বেআইনীভাবে। দেখামাত্র উল্টো আমাদেরকেই ফাটকে পুরবে সুইস গার্ড।'

'বুঝতে পারছি সমস্যাটা,' রানা মাথা ঝাঁকাল। 'এজন্যই ভিতরের কারও সাহায্য প্রয়োজন আমাদের... এমন কেউ, যিনি সম্মেলনের একজন সম্মানিত অতিথি।'

'দেজানের বন্ধু?'

'হুঁ,' জুরকিচের দিকে ফিরল রানা। 'ভদ্রলোককে কোথায় পাওয়া যাবে, বলতে পারেন?'

'উঁহুঁ,' আবহাওয়াবিদ মাথা নাড়ল। 'আমি তো ভাবছিলাম, জাহাজে উঠতে পারলেই চলবে। সুইস গার্ড আমাদের ধরলে তাদেরকেই বলতাম ওকে খবর দিতে।'

'এই মুহূর্তে ধরা পড়া যাবে না, তা তো বুঝতেই পারছেন। নিজেদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। কোন্ কেবিনে থাকছেন তিনি—এটা জানেন?'

'না। কেবিন অ্যালোকেশন আগে দেয়া হয়নি, জাহাজে ওঠার পর দেয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল।'

'সেক্ষেত্রে একটা পদভ্রমণের জন্য তৈরি হোন। জাহাজের সবখানে ঢুঁ মারব আমরা, ভদ্রলোককে খুঁজে বের করব।'

'সিকিউরিটি আটকালে কী জবাব দেবেন?'

'যেন না আটকায়, সেটাই নিশ্চিত করতে হবে। দেখি,

কাছাকাছি কোনও কেবিন থেকে জামাকাপড় চুরি করে সম্মেলনের অতিথি সাজব। চলুন।'

বোট গ্যারাজ থেকে বেরিয়ে কাছাকাছি প্রথম যে কেবিন পেল, সেটাতেই ঢুকে পড়ল রানারা। দেখা গেল, ওটায় সংসারত্যাগী ভারতীয় সন্ন্যাসীরা থাকছে—ক্লজিটে তাদের বাড়তি আলখাল্লা ছাড়া আর কিছু নেই, সত্যিই দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করেছে তারা। অবস্থাটা দেখে খুশিই হলো রানা। গত কিছুদিনে চুল কাটা বা দাড়ি কামানো হয়নি ওদের কারও, মাথায় পাগড়ি বেঁধে আলখাল্লা পরলে বেশভূষাটা সন্ন্যাসীদের সঙ্গে চমৎকার মানানসই হবে। এটা যদি ফিটফাট খ্রিস্টান পাদ্রীদের কেবিন হতো, তা হলেই বরং বেশি সমস্যা দেখা দিত। মুরল্যান্ড, স্যাম বা জুরকিচের গায়ের রং অবশ্য ভারতীয়দের সঙ্গে মেলে না, তবে আর্কটিকের পরিবেশের অত্যাচারে ওদের চামড়া আর আগের মত ধবল নেই। শরীর তো ঢাকাই থাকবে, মুখ যদি একটু লুকিয়ে হাঁটে, সেইসঙ্গে গার্ডরা খুব বেশি মনোযোগ না দেয়, তা হলে পার পেয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়।

সন্ন্যাসীরা সবাই সম্ভবত কনভোকেশনের কোনও অনুষ্ঠানে ব্যস্ত, কেবিনটা ফাঁকাই পেল ওরা। মেয়েদের নিয়ে একটু চিন্তায় পড়ল রানা—ওরা তো আর সন্ন্যাসী সাজতে পারবে না। একবার ভাবল কেবিনে রেখে যাবে, পরক্ষণেই আবার বাতিল করে দিল চিন্তাটা। এখানকার লোকজন ফিরে এলে ঝামেলা বাধবে। এদিকে দেখা গেল আলখাল্লাও আছে সব মিলিয়ে মাত্র তিনটে। শেষে স্যাম-সহ ওদেরকে বোট গ্যারাজে লুকিয়ে থাকতে বলে দিল ও।

দ্রুত ছদ্মবেশ নিল রানা, মুরল্যান্ড আর জুরকিচ। লিয়াদের পাঠিয়ে দিল গ্যারাজে, শেষে নিজেরাও বেরিয়ে পড়ল ফাদার নভোস্কির খোঁজে। রওনা হবার আগে ইন্টারকমে পার্সারের

অফিসে যোগাযোগ করে ভদ্রলোকের কেবিন নম্বর জানার চেষ্টা করেছিল রানা, তবে ওখান্ থেকে কাঠখোট্টা স্বরে জানিয়ে দেয়া হয়েছে—অনুমতি ছাড়া কারও অ্যাকোমোডেশনের ঠিকানা দেয়া যাবে না।

অস্ত্র বলতে সাবমেরিনে পাওয়া মাউযারটা শুধু রয়েছে রানার কাছে। মেশিন পিস্তলও এনেছিল একটা, সেটা দিয়েছে স্যামকে—আত্মরক্ষার জন্য। তবে বলে দিয়েছে, নিতান্ত বাধ্য না হলে ওটা ব্যবহার না করতে। কনভোকেশনের মধ্যে কার্ন নিজেও গোলাগুলি করবে বলে মনে হয় না, ওদের যদি পেয়েই যায়—বন্দি করবে।

'আমরা যাচ্ছি কোথায়?' হাঁটতে হাঁটতে জানতে চাইল মুরল্যান্ড। 'শিপটা বিশাল... কোত্থেকে খোঁজাখুজি শুরু করবে বলে ঠিক করেছ?'

'মেইন ডাইনিং হল থেকে,' বলল রানা। 'বারোটা বাজে প্রায়, খেয়াল করেছ? ক্রুজ শিপের ঐতিহ্য অনুসারে মাঝরাতে মিডনাইট বুফের আয়োজন থাকে। চমৎকার একটা ভোজ। অতিথিরা সবাই নিশ্চয়ই সেখানেই গেছে। কেবিন খালি—দেখলে না?'

এলিভেটরের কাছাকাছি এসে সিকিউরিটির সামনে পড়ল ওরা—দুজন গার্ড দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, অলস দৃষ্টিতে যাওয়া-আসা করতে থাকা অতিথিদের দেখছে। পাগড়ি-আলখাল্লা পরা তিনজন ভারতীয় সন্ন্যাসীর প্রতি মোটেই মনোযোগী মনে হলো না তাদের, কাছাকাছি হতেই দায়সারা ভঙ্গিতে সম্মান দেখাল, তারপর এলিভেটরের দরজা খুলে দিয়ে পথ ছেড়ে দাঁড়াল।

ভিতরে পা রেখে এলিভেটরের দেয়ালে লাগানো জাহাজের ম্যাপটা দেখে মেইন ডাইনিং হল বের করল রানা, বাটন টিপল সেখানে যাবার জন্য। পুরো সাতটা ডেক উপরে চড়তে হলো ওদের, পথে বিভিন্ন ধর্মের আরও যাজক চড়ল লিফটটাতে।

তাদের ভিড়ে নিজেদের আড়াল করে তিনটে সিকিউরিটি পয়েন্ট পার হলো ওরা, দশ মিনিটের মাথায় পৌঁছুল ডাইনিং হলে।

সুবিশাল এইট্রিয়ামটা দেখে হাঁ হয়ে গেল তিনজনে, রীতিমত একটা ফুটবল মাঠের মত বড় ওটা—চমৎকারভাবে সাজানো। পুরো হল জুড়ে বসানো হয়েছে কয়েকশো খাবারের টেবিল, তাতে শোভা পাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ঐতিহ্য অনুসারে সাজানো নানা ধরনের খাবার। গন্ধে ম ম করছে গোটা জায়গাটা।

'আঃ মরি মরি!' বলে উঠল মুরল্যান্ড। 'পাকস্থলি তো রীতিমত মোচড় মারছে হে। ফাদার নভোস্কিকে খোঁজার আগে চলো একটু পেটপুজো করে নেয়া যাক। আমাদের টেবিলটা কোন্‌দিকে হবে?'

'টেবিল না, ওয়াটার ফাউন্টেনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে,' মুচকি হাসল রানা। 'ভারতীয় সন্ন্যাসীরা পানি ছাড়া কিছু খায় না শুনেছি।'

'কী!' মুরল্যান্ডের মাথায় যেন বাজ পড়েছে।

'হ্যাঁ। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তাটা আপাতত বাদ দাও, নিয়মের বাইরে অন্যকিছু মুখে দিয়ে ফেললে লোকের নজরে পড়ে যাব। তারচেয়ে আগে ফাদার নভোস্কিকে খুঁজে বের করি, পরে যত খুশি খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।'

'কপালটাই মন্দ!' সখেদে বলল মুরল্যান্ড। 'ইন্ডিয়ান মঙ্ক না হয়ে খাবারের পূজারী কোনও ধর্মযাজকের কেবিনে ঢুকলে কী এমন ক্ষতি হতো!'

পুরো ডাইনিং হল লোকে লোকারণ্য—অতিথিরা তো আছেই, সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জাহাজের ক্রু এবং সিকিউরিটি পার্সোনেলরা—সবাই অংশ নিচ্ছে ভোজসভায়। হাজার রকমের আলাপচারিতায় পুরো জায়গাটা গুঞ্জনে ভরে গেছে। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, এত মানুষের ভিতর থেকে নির্দিষ্ট একজনকে খুঁজে বের করা সহজ হবে না। ও বলল, 'তিনজন তিনদিকে গেলে

সময় কম লাগবে। দেজান, ফাদার নভোস্কিকে চিনব কীভাবে?'

চমৎকারভাবে ব্রাদারহুডের ভাইয়ের বর্ণনা দিল জুরকিচ, কী ধরনের পোশাকে তার থাকার কথা—তা-ও জানাল। শেষে জিজ্ঞেস করল, 'চলবে?'

'হুঁ, আশা করি দেখলে চিনতে পারব। চলুন বেরিয়ে পড়ি।'

'এক মিনিট,' বলল মুরল্যান্ড, নিজের পোশাক দেখাচ্ছে। 'সত্যি সত্যি কোন ভারতীয় সন্ন্যাসীর সামনে পড়ে গেলে কী করব? হিন্দি ভাষা তো জানি না, কথা বলব কীভাবে?'

'ভাব দেখিয়ো, যেন মৌনব্রত পালন করছ,' হাসল রানা। 'চলো যাই।'

পুরো এইট্রিয়ামকে কাল্পনিক তিনটে রেখা দিয়ে ভাগ করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল ওরা। এক দিক থেকে শুরু করে যত মানুষ আছে, সবার চেহারা দেখছে। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছে গেল ওরা, তারপরও সাফল্য এল না। কাজটা অবশ্য নির্ঝঞ্ঝাটেই এগোচ্ছে, কেউ খুব একটা মনোযোগ দিচ্ছে না ওদের প্রতি। দু-এক জন যারা তাকাচ্ছে, তা-ও স্বাভাবিক কৌতূহলের বশে, কোনও রকম খুঁতখুঁতে দৃষ্টি দিয়ে নয়। সত্যিকার দুজন ভারতীয় সন্ন্যাসীকে হঠাৎ দেখতে পেল রানা, তাড়াতাড়ি ওদের এড়িয়ে সরে যাবার চেষ্টা করতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল লম্বা-চওড়া এক সিকিউরিটি পার্সোনেলের পিঠে। জার্মান ভাষায় গাল দিয়ে উঠল লোকটা, ঘুরে দাঁড়াল। চেহারাটা দেখে চমকে উঠল রানা, এই লোক তো নুয়েনডর্ফ... জিয়ো-রিসার্চের ড্রাইভার! এখানে এল কীভাবে? নিশ্চয়ই কার্ন তাকে নিয়ে এসেছে সঙ্গে করে! তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়ে ফেলল ও, বিড়বিড় করে হিন্দিতে ক্ষমা চাইল।

বিরক্ত চোখে কিছুক্ষণ নতমস্তক সন্ন্যাসীকে দেখল নুয়েনডর্ফ, শেষে একটা গাল দিয়ে চলে গেল একদিকে। মাথা নামিয়ে ফেলার আগে মাত্র এক পলকের জন্য দেখেছে সে রানাকে, তা-ও

সন্ন্যাসীর সাজে... চিনতে পারেনি।

মুরল্যান্ড আর জুরকিচকে দেখা গেল একটু দূরে, হাতছানি দিয়ে ওদের ডাকল রানা, কাছাকাছি হতেই নিচু স্বরে বলল, 'আমাদের সন্দেহই ঠিক, কার্ন পৌঁছে গেছে এখানে। এইমাত্র নুয়েনডর্ফকে দেখলাম, ব্যাটা গার্ড সেজেছে।'

'কী সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল মুরল্যান্ড। 'তোমাকে চিনে ফেলেনি তো?'

'উঁহুঁ, আমরা যে এখানে আসতে পারি, তা কল্পনাতেও নেই ওদের। চেনার কোনও চেষ্টাই করেনি।'

'কী করতে চাও এখন?'

'ব্যাটা একা আসেনি নিশ্চয়ই। চলো ওর কাছাকাছি কোনও একটা টেবিলে গিয়ে বসি, দোস্তদের সঙ্গে কী কথা বলছে, শুনতে হবে। বেফাঁস কিছু বের হলে ওদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম সম্পর্কে জেনেও ফেলতে পারি।'

'আন্তনকে খোঁজার কী হবে?' জানতে চাইল জুরকিচ।

'কার্নের লোকজনের সামনে ঘুরঘুর করা যাবে না। দেখি, খাওয়াদাওয়া শেষ হলে একজিটের কাছাকাছি বা ডেকগুলোয় খুঁজে দেখব। আসুন।'

প্লেটে করে সামান্য সাদা ভাত আর সবজি নিল ওরা—মেনুটা যদ্দূর সম্ভব সিম্পল রাখছে। তারপর এগিয়ে গেল নুয়েনডর্ফ যেদিকে গেছে সেদিকে। একটু পরই পাওয়া গেল জার্মান ড্রাইভারকে, একই রকম ইউনিফর্ম পরা আরও কয়েকজন গার্ডের সঙ্গে বসে খাচ্ছে। পাশেই ছোট একটা টেবিল দেখা গেল, সেখানে গার্ডদের দিকে পিঠ দিয়ে বসে পড়ল ওরা। রানা বলল, 'দেজান, জার্মান ভাষা আপনিই ভাল বুঝবেন। খেয়াল রাখুন কী বলে ওরা।'

মুখে সামান্য খাবার পুরে কান পেতে রইল ওরা, এমন সময় বিদঘুটে চেহারার এক দম্পতি এসে হাজির হলো টেবিলে। বয়সে

প্রৌঢ় দুজনেই, কিন্তু মহিলাটি যুবতী সাজার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। প্লাস্টিক সার্জারি করা মুখের চামড়া টান টান হয়ে আছে, সিলিকন ভরা বুকদুটো বের হয়ে আসছে জামার গলা দিয়ে—সাজসজ্জা ভয়াবহ। তার স্বামীটিও কম যায় না—কটকটে নীল রঙের একটা ব্লেজার পরেছে লোকটা, শার্ট আর প্যান্টও একই রঙের... দেখে সার্কাসের সঙের মত লাগল ওদের কাছে।

'এখানে বসি?' ভদ্রতা করল মহিলা, তবে অনুমতির তোয়াক্কা না করে বসে পড়ল রানাদের মুখোমুখি।

'গ্যাব্রিয়েল হিলার,' খাবারের প্লেট সরিয়ে ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে ধরল লোকটা। 'মিরাকল অভ জিসাস ক্রিশ্চিয়ান মিনিস্ট্রি। আপনারা মনে হচ্ছে ইন্ডিয়ান, তাই না? কিছু মনে না করলে দুটো কথা বলতে চাই...' বলে শুরু করল সে নিজের গুণকীর্তন।

অনবরত কথা বলে যাচ্ছে লোকটা, তার স্ত্রী-ও কথা যোগাচ্ছে। নিজের কথা, যিশুর কথা, ঈশ্বরের কথা... অপরপক্ষের কিছু বলার আছে কি না, তা নিয়ে মোটেও আগ্রহ নেই। মাঝে মাঝে হিন্দুদের ভগবান আর দেবতাদের নিয়ে এমন সব মন্তব্য করছে, শুনলে সত্যিকার নির্মোহ, নিরীহ সন্ন্যাসীও তাদের মারতে তেড়ে আসবে। মুরল্যান্ড আর জুরকিচ তো চরম বিরক্ত। কিন্তু মনে মনে হাসল রানা। চিনতে পেরেছে সামনে বসা মানুষদুটোকে—এরা হলো অকৃত্রিম ধর্মব্যবসায়ী। মানুষের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে টাকা বানানোই এদের লক্ষ্য, ভিন্নধর্মের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ থাকা উচিত, তার বিন্দুমাত্র নেই এদের ভিতর। এমন লোকে ভরে গেছে গোটা দুনিয়া, বাংলাদেশেও অভাব নেই। শুধু এ-দুজনের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে লাভ কী, এসব বকধার্মিকদের দাপট কমাতে হলে সাধারণ মানুষকে আগে সচেতন করে তুলতে হবে।

বিরক্ত হয়ে স্বামী-স্ত্রী'র কথা শুনতে হলো মিনিট বিশেক,

তারপর পাশের টেবিল খালি হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে উঠে পড়ল ওরা। এক কোণে খানিকটা নির্জনতা খুঁজে নিয়ে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কী বুঝলেন ওদের কথা থেকে, দেজান?'

'খবর বেশি ভাল নয়,' নার্ভাস গলায় বলল জুরকিচ। 'মনে হলো, ওরা একটা প্যান্ডোরা বক্স নিয়ে এসেছে জাহাজে।'

'হুঁ, আমিও তেমন কী জানি শুনলাম।'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল মুরল্যান্ড। 'কী বলছ তোমরা!'

'স্যাটানস্ ফিস্ট বা প্যান্ডোরা জাতীয় কিছু বলেনি,' জুরকিচ বলল। 'তবে বলছিল, কার্নের হেলিকপ্টার থেকে একটা বাক্স নামিয়েছে তারা, ওই একটাই লাগেজ ছিল ওদের সঙ্গে।'

'পালানোর সময় নিশ্চয়ই জামাকাপড়ের বাক্স আনেনি ওরা?' বলল রানা। 'অবস্থাটা বুঝতে পারছ? পরিস্থিতি ভীষণ গুরুতর হয়ে গেল, ববি। কার্নকে এমনি এমনি আটক করা যাবে না, ওকে গ্রেফতার করার চেষ্টা করলে বাক্সের সিল ভেঙে জাহাজভর্তি ধর্মীয় নেতাদের মেরে ফেলার হুমকি দেবে।'

'তা তো বুঝতেই পারছি।' মুরল্যান্ড মাথা ঝাঁকাল। 'ব্যাপারটা উভয় সঙ্কট হয়ে দেখা দিচ্ছে। বন্দি করা তো যাচ্ছেই না, আবার বাক্স নিয়ে পালাতে দিলেও পুরো দুনিয়াকে বিপদে ফেলে দেয়া হবে।'

'কিছু একটা বুদ্ধি বের করুন, রানা,' আকুতি ঝরল জুরকিচের গলায়।

'বাক্সটা কেড়ে নেয়ার একটা চেষ্টা চালানো যেতে পারে,' বলল রানা। 'কিন্তু আগে ওটা কোথায় আছে—জানতে হবে।'

'কীভাবে?'

'গার্ডদের ফলো করে। এক কাজ করো, তোমরা বোট গ্যারাজে ফিরে যাও, ওখান থেকে ইন্টারকমে খোঁজ নিতে থাকো—ফাদার নভোস্কিকে পাওয়া যায় কি না।'

'আর তুমি?' মুরল্যান্ড প্রশ্ন করল।

'ফলো করার কাজটা করব। তিনজন হলে লোক বেশি হয়ে যায়, তা ছাড়া তোমাদের গায়ের রঙও ছদ্মবেশটার সঙ্গে মানাচ্ছে কম। যাও, ওখানে অপেক্ষা করো আমার জন্য। আমি অবস্থাটা বুঝে আসি, তারপর পরামর্শ করব, কীভাবে এগোনো যায়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রস্তাবটায় একমত হলো মুরল্যান্ড আর জুরকিচ, উল্টো ঘুরে রওনা হয়ে গেল বোট-গ্যারাজের পথে। রানাও এইট্রিয়াম থেকে বেরিয়ে ওয়েদার ডেকে চলে এল, রেলিঙে ভর দিয়ে আকাশের দৃশ্য দেখার ভান করে নজর রাখল আশপাশে। একটু পরই দুজন জার্মান গার্ডকে ব্যস্ত ভঙ্গিতে হেঁটে যেতে দেখল ও—এরা নুয়েনডর্ফের সঙ্গে একই টেবিলে ছিল। একটু দূরত্ব রেখে অনুসরণ করল রানা, আলখাল্লার নীচে লুকানো পিস্তলটা ঠিকমত আছে কি না, আলতো স্পর্শে পরখ করে নিল।

কয়েকটা করিডর পেরিয়ে এলিভেটরের সামনে এসে পৌঁছুল গার্ডেরা, দরজা খুলে যেতেই তাতে চড়ে বসল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজার উপরে লাগানো ডিজিটাল ইন্ডিকেটরটা দেখল রানা, ম্যারিনার এক লেভেল নীচে গিয়ে থেমে গেল লিফট—আন্ডারওয়াটার ডেক ওটা, লোকদুটো সম্ভবত ওখানেই নামছে।

এলিভেটরের বামে দশ গজ দূরে স্টেয়ারওয়েলে যাবার দরজা আছে, দৌড়ে সেটা খুলে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ও, এক এক লাফে চার-পাঁচটা করে ধাপ পেরুচ্ছে। নির্দিষ্ট লেভেলটায় যখন পৌঁছুল, তখন পরিশ্রমে সারা শরীর ভিজে গেছে, বুকের ভিতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে অনবরত। ল্যান্ডিঙের পাশের দরজাটা দেখল ও—সেখানে লেখা: *স্টাফ ওনলি।*

দরজাটা ঠেলে ডেকের মূল অংশে পা রাখল রানা। চওড়া একটা করিডর দেখা যাচ্ছে, অন্যান্য সব ডেকের মত, তবে পার্থক্য এটাই যে, এখানে জাহাজের জৌলুস অদৃশ্য। মেঝেতে না আছে কার্পেট, বাল্কহেডেও নেই কাঠের প্যানেলিং, মাথার উপরও

দামি ঝাড়বাতি আলো ছড়াচ্ছে না। সেগুলোর জায়গা দখল করেছে সাদামাটা ইস্পাতের কাঠামো আর ইলেকট্রিক বালব। এটা জাহাজের ক্রু এরিয়া—বেশ ভালই বোঝা যাচ্ছে।

আশপাশে এই মুহূর্তে কোনও মানুষ দেখা যাচ্ছে না, তবে তারা আছে নিঃসন্দেহে। রাত কম হয়নি, হয়তো যার যার কেবিনে ঘুমাচ্ছে। তারপরও সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল রানা। ওর বেশভুষো জাহাজের অতিথির মত, ক্রু-দের ডেকে এ অবস্থায় কারও চোখে পড়লে সদুত্তর দেয়া যাবে না। সামনে যে কয়টা দরজা দেখা যাচ্ছে, সবগুলোর পাল্লায় কান পাততে শুরু করল ও, ভাগ্য ভাল বলতে হবে—চতুর্থ চেষ্টাতেই একটা নীরব কেবিন পেয়ে গেল, ভিতরে কেউ নেই, সম্ভবত নৈশভোজ থেকে ফেরেনি। ক্লজিট খুলে বোঝা গেল, ওর ধারণাই ঠিক। ভিতরে ঝোলানো আছে ইউনিফর্ম—সী-এম্প্রেসের একজন বেয়ারার কেবিন এটা। আলখাল্লাটা খুলে ডাস্টবিনে ফেলে দিল রানা, তাড়াতাড়ি পরে নিল একটা স্টুয়ার্ডের ইউনিফর্ম। তারপর বেরিয়ে এল কেবিন থেকে।

বেশিদূর এগোতে পারল না ও, সামনের একটা মোড় ঘুরতেই আচমকা ব্যথায় কুঁকড়ে গেল... ওপাশে লুকিয়ে থাকা মানুষটা ওর উরুসন্ধিতে লাথি মেরেছে। হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়ল রানা, আক্রমণকারীর চেহারা দেখার জন্য মুখ সোজা করতেই একটা হাঁটু ছুটে আসতে দেখল—থ্যাচ্ করে নাক-মুখ সমান করে দিল সেটা।

সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে নেমে এল একটা কালো পর্দা।

একুশ

ধীরে ধীরে চোখ মেলল রানা, চারপাশ দেখার আগে সয়ে নিল ব্যথাটা—ওটা এখন দু'পায়ের মাঝখান থেকে উঠে এসে তলপেটে স্থির হয়েছে। দশ থেকে পনেরো মিনিট অজ্ঞান ছিল, মনে মনে আন্দাজ করল ও, এর ভিতরও যায়নি ব্যথাটা... আক্রমণকারী তারমানে বেশ জোরেই মেরেছে ওকে। জিভ দিয়ে সামনের পাটির দাঁতগুলো পরখ করল, একটাও খোয়া যায়নি দেখে স্বস্তি বোধ করল। কপাল ভাল বলতে হবে, যে জোরে হাঁটু চালিয়েছে অদেখা লোকটা, তাতে দু'চারটে দাঁত ভেঙে পড়ে গেলে অবাক হবার কিছু ছিল না।

থেঁতলে যাওয়া নাকটাও ব্যথা করছে, সেখান থেকে রক্ত এসে ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে মুখের ভিতর। শব্দ করে রক্ত মেশানো এক দলা থুথু ফেলল রানা। সঙ্গে সঙ্গে কেউ একজনের সাড়া পাওয়া গেল—ভারি পুরুষালি কণ্ঠ, উচ্চারণে জার্মান টান।

'কে আপনি?'

জবাব না দিয়ে মাথা ঘুরিয়ে চারপাশটা দেখল রানা। ইঞ্জিনিয়ারিঙের কোনও একটা স্পেসে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে, জাহাজের একদম নীচদিক এটা। নানা রকম পাইপ, ইনসুলেশন, আর ভেন্ট দেখা যাচ্ছে, হাঁটা চলার জন্য পেট সমান উচ্চতায় রয়েছে ক্যাটওয়াক। তেমনই একটা ক্যাটওয়াকের তলায় রাখা হয়েছে ওকে, ওটার তলা দিয়ে চলে যাওয়া একটা পাইপের সঙ্গে প্লাস্টিকের স্ট্রিপ দিয়ে দু'কবজি বেঁধে রাখা হয়েছে ওর। দাঁড়ানোর মত জায়গা নেই, ওর পজিশনটা হয়ে আছে টান

আপ করে নিলডাউন হয়ে থাকার মত।

'কে আপনি?' আবার জিজ্ঞেস করা হলো।

এবারও জবাব দিল না রানা, নিঃশব্দে প্রশ্নকর্তার দিকে তাকাল—কয়েক গজ তফাতে একটা বয়লারের পাইপের সঙ্গে একই কায়দায় বন্দি করে রাখা হয়েছে সম্ভ্রান্ত চেহারার লোকটাকে। পেরিস্কোপে প্যান্ডোরা গুহায় কার্নের সঙ্গে একেই কথা বলতে দেখেছিল ও।

কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে মুখ খুলল রানা। তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'হাতের কাছে পেলে তোমাকে একটা উচিত শিক্ষা দেব ভেবেছিলাম। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, আমার হয়ে কার্নই করে দিচ্ছে কাজটা।'

'কী বলছেন এসব?' লোকটার চোখে বিস্ময় ফুটল। 'আপনি আমাকে চেনেন?'

'না চেনার কী আছে? তুমি ইয়োহান শ্নাইডার—ফ্রেডারিখ কার্নের বস... নাকি প্রাক্তন বস বললে বেশি মানাবে?'

থমকে গিয়ে কয়েক মুহূর্ত অপলক চোখে তাকিয়ে রইল ইয়োহান, দাড়ি-গোঁফের কারণে এতক্ষণ চিনতে পারেনি, এবার চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে বুঝে ফেলল। শান্ত গলায় বলল, 'আপনি মাসুদ রানা।'

ইয়োহানের দিকে আর নজর দেয়ার প্রয়োজন মনে করল না রানা, টেনে-টুনে চেষ্টা করে দেখল প্লাস্টিকের বাঁধনটা ছেঁড়া যায় কি না। লাভ হলো না, টান পড়লেই চামড়ায় আরও কেটে বসছে ওটা।

'পারবেন না,' বলল স্যাকলিচ এজি-র প্রেসিডেন্ট। 'আমি শুরুতেই পরীক্ষা করে দেখেছি—স্ট্র্যাপগুলো ছেঁড়ার জিনিস না।'

হাল ছেড়ে দিয়ে ইয়োহানের দিকে ফিরল রানা। জানতে চাইল, 'তোমার এই অবস্থা কেন? কার্নের সঙ্গে স্যাটানস্ ফিস্টের বখরা নিয়ে গণ্ডগোল লেগেছে?'

'আমাকে আপনি ভুল বুঝছেন, মি. রানা। উল্কাটার খণ্ডগুলোর প্রতি আমার কোনও আগ্রহ নেই। ফ্রেডারিখ একটা টেরোরিস্ট নিয়ো-নাৎসি—পদার্থটা নিজ স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। ওকে বাধা দিতে গিয়েই আজ আমার এই দশা।'

'ও! আপনি তা হলে একজন 'মানবতাবাদী!' টিটকিরি মারল রানা। 'পৃথিবীকে বাঁচাতে গ্রিনল্যান্ড এক্সপিডিশনের কিছু নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলেছেন, তাই না?'

'ওগুলোতে আমার কোনও হাত ছিল না, সব ফ্রেডারিখ করেছে। আমি স্রেফ একজন ব্যবসায়ী, খুনী নই। নিজের প্রতিষ্ঠানকে বাঁচানোর জন্য প্যান্ডোরা প্রজেক্টের চিহ্ন লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম, বাক্সগুলোও সাগরে নিয়ে ফেলে দেয়ার ইচ্ছে ছিল। প্ল্যানটা এমনভাবে করা হয়েছিল, যাতে কোনও রক্তপাত না হয়।'

'প্যান্ডোরা প্রজেক্ট ধামাচাপা দিতে চেয়েছ, না?' রানার গলায় রাগ ফুটল। 'ওখানে এক হাজার নিরীহ মানুষ মারা গেছে, মরার আগেও তাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। এটা কি ঘরের ময়লা, যে ঝাড়ু দিয়ে কার্পেটের তলায় লুকিয়ে ফেলবে?'

'ওটা ছিল অতীত—যারা ওইসব ঘটিয়েছে, তাদের কেউ আর বেঁচে নেই। আমাকে আপনি ওসবের জন্য দায়ী করতে পারেন না।'

'বুক ফুলিয়ে এতবড় কথা যদি বলতে পারো, তা হলে গুহাটা ধ্বংস করতে গেলে কেন?' হেসে উঠল রানা। 'না হে, শ্নাইডার মিয়া, আমার তোমাকে দায়ী করার কিছু নেই, তুমি নিজেই নিজেকে দায়ী ভাবছ।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইয়োহান। 'আমি অমানুষ নই, মি. রানা। বিবেক-বুদ্ধিও আছে। জানি, নৈতিকতার প্রশ্নে প্যান্ডোরা প্রজেক্টের দায় অস্বীকার করতে পারব না, কারণ পূর্বপুরুষদের অন্যায় পথে

অর্জিত সম্পদ আমরাই ভোগ করছি। কিন্তু ব্যবসার জগতে এসব বিবেক-নৈতিকতা অচল, আমি যা করেছি তা সম্পূর্ণই ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। আবেগ আর অতীতকে আঁকড়ে ধরে থেকে লাভ হয় না কোনও, তা ছাড়া স্যাকলিচের সঙ্গে জড়িত কয়েক লক্ষ মানুষের রুটি-রুজির কথাও মাথায় রাখতে হয় আমাকে। আপনিই বলুন, কোম্পানিটাকে ধ্বংস করে দিলে কী লাভ হবে? মরা মানুষগুলো কি জ্যান্ত হয়ে উঠবে?'

'কথার মারপ্যাঁচ খেলিয়ো না,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'যদি কিছু করার ইচ্ছেই থাকত, সত্যটা প্রকাশ করে দুনিয়ার সামনে ক্ষমা চাইতে পারতে; যারা মারা গেছে, তাদের পরিবার-পরিজনকে সাহায্য করতে পারতে। তাতে কোম্পানি লাটে উঠত না। যাক গে, বসে বসে তোমার এসব খোঁড়া অজুহাত শোনার আর কোনও ইচ্ছে নেই আমার মধ্যে, যদি কিছু বলতেই চাও, তা হলে বলো—কার্নের কাছে ক'টা বাক্স আছে? সেগুলো নিয়ে কী করার মতলব আঁটছে সে?'

'ওর কাছে একটাই আছে... ছোট আকারের, বাকিগুলো তো আপনি সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছেন। স্যাটানস্ ফিস্টকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চায় শয়তানটা। আপনার উপর খুব খেপে আছে, বলেছে—বাংলাদেশের উপরে প্রথমবারের মত ওটা ব্যবহার করবে সে।'

চমকে উঠল রানা, বলে কী এই লোক? দেশের উপর এতবড় একটা আঘাত আসতে যাচ্ছে? যেভাবে হোক, কার্নকে ঠেকাতে হবে। কোনওমতে উদ্বেগটা চাপা দিয়ে ও জানতে চাইল, 'জাহাজে কতজন লোক আছে ওর সঙ্গে?'

'বিশ থেকে ত্রিশজন গার্ড, সঠিক সংখ্যা বলতে পারব না। ওরা সবাই ফ্রেডারিখের স্পেশাল প্রজেক্টস্ ডিপার্টমেন্টে কাজ করে, ওর নিজের ভাড়া করা লোক। প্রত্যেকেই খুনে-বদমাশ।'

'গ্রিনল্যান্ড থেকে ক'জন এসেছে?'

‘শুধু নুয়েনডর্ফ। সাবমেরিন নিয়ে আপনারা চলে যাবার পর মর্দার্ন ক্যাম্প থেকে ওকে তুলে এনেছে ফ্রেডারিখ—লোকটা ওর ডান হাত, তাকে ফেলে আসতে চায়নি। কিন্তু এসব জেনে লাভ কী? আটকা পড়ে গেছেন, কার্নকে ঠেকানোর আর সাধ্য নেই আপনার।’

‘আমার সঙ্গে আরও লোক আছে...’

‘তাদের খবরও কার্নের জানা। আপনাকে যখন এখানে নিয়ে এল, তখন থেলমা একজন গার্ডের সঙ্গে কথা বলছিল—ম্যারিনার কাছাকাছি একটা কেবিন থেকে নাকি কাপড়চোপড় চুরি গেছে। কাজটা নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গীদের, তাদের খোঁজে লোক পাঠানো হয়েছে।’

ইয়োহানের কথার সমর্থনেই যেন উপরে কোথাও দড়াম করে খুলে গেল ইঞ্জিনিয়ারিং এরিয়াটার দরজা। মানুষের কলকাকলি শুনতে পেল রানা—মুরল্যান্ডের গালাগাল, সিলভিয়ার ফোঁপানি আর লিয়ার চেঁচামেচি। এসবের জবাবে থেলমার কুৎসিত হাসি কানে আসতেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল ওর। একটু পরেই মেশিনগান হাতে তিনজন গার্ডের প্রহরায় ইউ-বোটের বাকি পাঁচ আরোহী এসে হাজির হলো।

সবার পিছনে ঢুকল থেলমা, রানার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল সে। ‘জ্ঞান ফিরেছে তা হলে? লাথিটা বেশ জোরে মেরেছিলাম, ভাবলাম মরে-টরেই গেলে কি না আবার!’

‘না, না,’ হালকা গলায় বলল রানা। ‘শকুনের দোয়ায় কি আর গরু মরে, বলো?’

রাগে চোখ জ্বলে উঠল থেলমার, এগিয়ে এসে চড় কষল প্রতিপক্ষের গালে। হিসিয়ে উঠে বলল, ‘তোমার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলার দিন শেষ, রানা। নিজেকে খুব চালাক ভেবেছিলে, না? ভেবেছ সন্ন্যাসীর পোশাক পরে হেঁটে বেড়ালে কেউ আর তোমাকে চিনতে পারবে না? হুঁহ, এই থেলমা শোয়ার্জের চোখকে ফাঁকি

দেয়া অত সহজ না। তোমাদের সব্বার দৌড়ঝাঁপ খতম হয়েছে, ফ্রেডারিখ এবার তোমাদের কুকুরের মত মারবে।'

গার্ডরা নতুন বন্দিদের রানা আর ইয়োহানের মত বাঁধছে। মুরল্যান্ড তাদের অগ্রাহ্য করে বলল, 'কিচ্ছু ভেবো না, রানা। ও যত খুশি প্রলাপ বকুক, আমরা কিন্তু স্যাট-ফোনে নুমা হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করে ফেলেছি। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে কথা হয়েছে, রেইক্ইয়াভিক বেস থেকে খুব শীঘ্রি অ্যামেরিকান মেরিনদের একটা অ্যাসল্ট টিম চলে আসবে এখানে।'

'সোলার ম্যাক্সটা কেটে গেছে তা হলে?' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'যাক, সময় থাকতেই প্রকৃতি আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাল।'

ঝট করে মুরল্যান্ডের দিকে ঘুরল থেলমা। 'তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ! তোমাদের কারও কাছে স্যাটেলাইট ফোন ছিল না।'

'ধরা পড়ার আগে ওটা ফেলে দিয়েছি আমি,' নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল মুরল্যান্ড। 'কী ভেবেছ? এত সহজে ধরা দিয়েছি কি এমনি এমনি? কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের উদ্ধার করতে লোক এসে যাবে, তাই আর লড়াই করিনি।'

'তুমি একটা এক নম্বরের মিথ্যুক!' ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল থেলমা।

'যাও, সেটা ভেবে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়াও গে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে যখন এক ডজন অ্যামেরিকান হেলিকপ্টার মাথার উপর এসে যাবে, তখনও ভেবো—ওটা চোখের ভুল।'

এক এক করে সব বন্দির দিকে তাকাল থেলমা, কিন্তু সত্য-মিথ্যা বুঝতে পারল না। গার্ডদের নিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল সে।

'যাক, দস্যুরাণীর চেহারা দেখতে হবে না কিছুক্ষণ,' দুষ্টামির হাসি ফুটল মুরল্যান্ডের মুখে। 'বেটি এখন পাগল হয়ে যাবে।'

'ফোন-টোন কিচ্ছু করতে পারোনি, না?' ব্যাপারটা বুঝতে

পেরে হতাশ হলো জুরকিচ।

'কোত্থেকে করব?' ঠোঁট উল্টাল মুরল্যান্ড। 'স্যামেরটা তো হারিয়েই গেছে। আপনার বন্ধুরও খোঁজ পাইনি, তার আগেই শাকচুন্নীটা এসে হাজির হলো। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের কোনও কিছুর মায়া থাকে না—এ কথাটা বোধহয় ঠিক নয়। আমরা যাদের কাপড় চুরি করলাম, তারা নিজেদের পোশাকগুলো মনে হয় যখের ধনের মত আগলে রাখে। ডিনার থেকে ফিরে আলখাল্লাগুলো না পেয়েই সোজা শিপের সিকিউরিটি অফিসে রিপোর্ট করে দিয়েছে। আমাদের খুঁজে পেতে গার্ডদের আর সময়ই লাগেনি।'

'হুঁ, আর ধাপ্পাবাজিটাও তেমন উপকার করছে না,' রানা চিন্তিত গলায় বলল। 'ঘণ্টাখানেক পর যখন কোনও রেসকিউ টিম আসবে না, তখন পেত্নীটা ছুটে আসবে আমাদের ব্যবস্থা করতে।'

'এটা কে?' ইয়োহানকে হঠাৎ লক্ষ করে জিজ্ঞেস করল লিয়া।

'ওফ্‌ফো, বলতেই ভুলে গেছি,' রানা বলল। 'বন্ধুগণ, এ হচ্ছে ইয়োহান শ্নাইডার—কার্নের বস।'

'হাই!' অভিবাদনের সুরে বলল মুরল্যান্ড। 'আপনার উপর খোদার গজব বর্ষিত হোক!'

'সত্যিই হচ্ছে,' বলল রানা। 'সুযোগ বুঝে কার্ন ওর পিঠে ছুরি মেরেছে—অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না?'

'ওর ওটাই প্রাপ্য,' রাগী গলায় বলল লিয়া।

আর কিছু না বলে পরিস্থিতিটা বিচার করতে শুরু করল রানা। সন্দেহ নেই, খুবই জটিল আর বিপজ্জনক অবস্থায় পড়ে গেছে ওরা। কার্নের হাতে একটা প্যান্ডোরা বক্স রয়েছে, জাহাজটাও তার নিয়ন্ত্রণে, আর ওরা সবাই বন্দি। নিস্তার পাওয়া তো দূরের কথা, শেষ পর্যন্ত কেউ বাঁচবে বলেও মনে হচ্ছে না। জ্যোতিষী হবার প্রয়োজন নেই, পরাজয়টা দিব্যচোখে এমনিতেই দেখতে পাচ্ছে ও। হঠাৎ হেসে উঠল রানা।

'কী ব্যাপার, হাসছ যে?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল লিয়া।

'প্যান্ডোরার গল্পটার মূল বক্তব্যটা বুঝতে পেরেছি বলে,' বলল রানা।

'কীসের মূল বক্তব্য?'

'প্যান্ডোরার বাক্সের। গল্পটা জানো তুমি?'

'দেবতা যিউস একটা বাক্সে পৃথিবীর সমস্ত খারাপ জিনিস আটকে রেখেছিলেন। প্যান্ডোরা সেটা খুলে ফেলায় লোভ, হানাহানি, হিংসা, বিদ্বেষ, দুঃখকষ্ট আর রোগব্যাধি দুনিয়াজুড়ে ছড়িয়ে যায়, তবে শেষ পর্যন্ত বাক্সের ডালাটা যখন বন্ধ করা হয়, তাতে শুধু একটা জিনিস বাকি ছিল... আশা। মানেটা হচ্ছে, এতসব খারাপ জিনিসের মাঝেও হতাশ হবার কিছু নেই, সবসময়ই আশা থাকে—মূল বক্তব্য তো এটাই।'

'আরেকভাবে চিন্তা করো না কেন? বলো তো, এতসব খারাপ জিনিসের সঙ্গে আশাকে এক বাক্সে বন্দি করে রাখা হয়েছিল কেন? আমার কী ধারণা, জানো—আশাও একটা ধ্বংসাত্মক জিনিস। যখন সুযোগ থাকে তখন আশা তোমাকে শক্তি জোগায়। কিন্তু অসম্ভব পরিস্থিতিতে আশা আর আশা থাকে না, দুরাশা হয়ে যায়। আর সেই দুরাশা নিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে চেষ্টা করলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যায়।'

'এত সুন্দর একটা গল্পের এই অর্থ বের করলে?' বিস্মিত গলায় বলল লিয়া।

'না করে উপায় কী? এই মুহূর্তে আমি যেটা করতে যাচ্ছি, তাতে আমার হাতগুলো চলে যেতে পারে। তারপরও নিরাশ হতে পারছি না। এটা কি খারাপ ব্যাপার নয়?'

'কী করতে যাচ্ছ?'

জবাব না দিয়ে নিজের দুহাত নীচের দিকে টানতে শুরু করল রানা, প্লাস্টিকের বাঁধনটা ছিঁড়ে ফেলার ইচ্ছে। শরীরের সমস্ত শক্তি কাজটায় লাগিয়ে দিল ও। পেশি ফুলে উঠেছে, কবজিতে

বাঁধনটা কেটে বসে যাবার লক্ষণ টের পেল। ধীরে ধীরে গভীর হয়ে যাচ্ছে কাটাটা, রক্ত গড়াতে শুরু করেছে, তাও থামল না ও। চোখ বন্ধ করে... দাঁতে দাঁত পিষে ব্যথা সহ্য করে টেনে চলল।

তারপর... হঠাৎ... প্রচণ্ড শব্দে দু'টুকরো হয়ে গেল প্লাস্টিকের স্ট্রিপটা, অবলম্বন হারিয়ে ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল রানা। চোখ মেলে বোকার মত তাকাল দুই কবজির দিকে, কী ঘটেছে নিজেও বুঝতে পারছে না। কীভাবে সম্ভব হলো এটা? যত শক্তিই থাকুক, একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় বাঁধনটা ছেঁড়া। তা হলে? দৈব কোনও সঙ্কেত নয় তো যে ও, প্যান্ডোরার গল্পটার ভুল অর্থ বের করেছে?

বিস্ফারিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে বাকি ছয় বন্দি। তোতলাতে তোতলাতে ইয়োহান বলল, 'ক্... কীভাবে... আপনি...'

উপর দিকে মাথা তুলে তাকাল রানা, এবার পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্যটা। কালো পোশাক পরা শ্মশ্রুমণ্ডিত একজন দীর্ঘদেহী মানুষ দাঁড়িয়ে আছেন ক্যাটওয়াকে, হাতে একটা ফায়ার অ্যাক্স ধরা। ও যখন বাঁধনটা টানছিল, কোপ দিয়ে ওটা কেটে দিয়েছেন ভদ্রলোক।

'আপনার গায়ে লাগেনি তো?' ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জানতে চাওয়া হলো, উচ্চারণটা রাশান।

'ফাদার নভোস্কি?' চিনতে পেরে নিশ্চিত হবার জন্য বলল রানা।

'ডা,' হাসলেন নভোস্কি, সিঁড়ি ধরে নেমে এলেন নীচে। 'দুঃখিত, আরও আগে আসতে পারিনি বলে। লোকজন বেশি ছিল, গার্ডের সংখ্যা কমে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে।'

'আমাদের কোনও অভিযোগ নেই সেজন্য,' হাসিমুখে বলল মুরল্যান্ড, বাকিদের মাঝেও আনন্দটা সংক্রামিত হয়েছে। 'কিন্তু জিজ্ঞেস না করে পারছি না—কীভাবে জানলেন, আমরা এখানে?'

'ডিনারের সময় আমি তিনজন ভারতীয় সন্ন্যাসীকে ঘুরঘুর করতে দেখি এইট্রিয়ামে, তাদের একজনের হাতে দামি রোলেক্স ঘড়ি—ব্যাপারটা অস্বাভাবিক, তাই না?' নিজের কবজির দিকে তাকিয়ে জিভ কাটল মুরল্যান্ড। 'সন্দেহ হওয়ায় মুখোমুখি না হয়ে গা ঢাকা দিই আমি, লুকিয়ে লুকিয়ে অনুসরণ করতে থাকি। পরে দেখলাম সোনালিচুলের জার্মান মেয়েটা তাদের একজনকে একা পেয়ে আক্রমণ করল, বন্দি করে এখানে নিয়ে এল। দূর থেকে নজর রাখছিলাম, আপনাদের বাকিদের যখন নিয়ে এল, তখনই ব্রাদার দেজানকে চিনতে পারি। ব্যস, তারপর আর কী, বাইরের দরজায় গার্ডটা একা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম, ফায়ার অ্যাক্স দিয়ে বাড়ি মেরে ওকে বেহুঁশ করলাম, তারপর আমি এখানে!'

সঙ্গীদের বাঁধন খুলতে খুলতে রানা বলল, 'টাইমিংটা আপনার অদ্ভুত হয়েছে। হঠাৎ করে স্ট্রিপটা দু'টুকরো হয়ে যাওয়ায় আমি কী ভাবছিলাম, জানেন?'

'জানি,' হাসলেন নভোস্কি। 'আপনার সব কথা শুনেছি আমি, ইচ্ছে করেই আপনি চোখ বন্ধ করার পর পা টিপে টিপে কাছে এসে কোপ মেরেছি।'

'আপনি দারুণ রসিক লোক, ফাদার,' হেসে উঠল রানা।

'তোমার ভুল ধারণা দূর হয়েছে তো?' মুক্তি পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কবজি ঘষল লিয়া। 'আশা কখনও মানুষের ক্ষতি করতে পারে না।'

'হয়েছে। আর কখনও পুরনো প্রবাদের নতুন অর্থ বের করব না।'

'করবে না মানে?' খেপে ওঠার ভান করল মুরল্যান্ড। 'এখন থেকে সবসময় এ ধরনের পরিস্থিতিতে একটা করে ভুল অর্থ বের করবে, যাতে ঠিক এইভাবে মাটি ফুঁড়ে সাহায্য চলে আসে।'

কথাটা শুনে সবাই সমস্বরে হেসে উঠল।

অজ্ঞান গার্ডের অস্ত্রগুলো নিয়ে এসেছেন নভোস্কি—একটা

হেকলার অ্যান্ড কোচ পি.নাইন.এস. অটোমেটিক পিস্তল আর একটা কম্প্যাক্ট এমপি-ফাইভ সাবমেশিনগান—দুটোই সাইলেন্সার লাগানো। সেগুলো বাড়িয়ে ধরে তিনি বললেন, 'আশা করি এগুলো আপনাদের কাজে লাগবে।'

'নিশ্চয়ই,' বলে অস্ত্রগুলো হাতে নিল রানা আর মুরল্যান্ড।

'এবার কী?' জানতে চাইল স্যাম।

'এবার আমরা দুঃস্বপ্নটার ইতি ঘটাব,' দৃঢ় গলায় বলল রানা।

'প্ল্যান ঠিক করেছ কোনও?' জানতে চাইল মুরল্যান্ড।

'চিন্তা-ভাবনা করছি, তবে ওতে আমাদের নতুন বন্ধুর সাহায্য লাগবে। কী ইয়োহান, আছেন আপনি আমাদের সঙ্গে?'

'অবশ্যই,' প্রত্যয়ী গলায় বলল ইয়োহান। 'আমি তো বাক্সগুলো ধ্বংসই করতে চাই। তা ছাড়া গত কয়েকটা দিনে আমার চোখ খুলে গেছে। সফল ব্যবসায়ীর পরিচয়ে আর বাঁচতে চাই না আমি, চাই বিবেকবান একজন মানুষ হতে। আমার পূর্বপুরুষেরা যা অন্যায় করে গেছেন, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি আছি আমি, মি. রানা। ফ্রেডারিখের মত শয়তানকে ঠেকাতে আমি প্রয়োজনে জীবনও দেব।'

'গুড,' বলল রানা। 'সেক্ষেত্রে আমাকে আপাতত কিছু তথ্য দিয়ে সাহায্য করুন। জাহাজের সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টটা বিস্তারিত জানান, দেখি ওটা আমাদের কাজে লাগানো যায় কি না।'

'মনে হয় লাগাতে পারবেন। পোপের সুইস গার্ড পুরো সম্মেলনের নিরাপত্তা দেখছে, ফ্রেডারিখ ওদের কাউকে হাত করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। জাহাজের নিজস্ব সিকিউরিটিও পুরোপুরি তার নিয়ন্ত্রণে নয়, মাত্র বিশ থেকে ত্রিশ জন ঢোকাতে পেরেছে ওখানে। পুরো কনভোকেশনের বিশাল সিকিউরিটি ফোর্সের মধ্যে সংখ্যাটা খুবই নগণ্য। ক্যাপ্টেন বা জাহাজের অন্য কেউ ওদের সঙ্গে জড়িত নয়। আপনার একমাত্র সমস্যা হচ্ছে,

সিকিউরিটির ভাল লোকগুলোকে সত্যি কথাটা বিশ্বাস করানো নিয়ে। ক্যাপ্টেনের কাছেও যেতে পারবেন না, ফ্রেডারিখ সেদিকে নজর রাখবে। তবে একবার যদি সুইস গার্ডকে সব বুঝিয়ে বলতে পারেন, তা হলে আর চিন্তা নেই, ওরাই বাকিটা সামলাবে।'

'কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করবে না ওরা,' বলল রানা। 'অন্তত শুরুতে তো নয়ই। বরং শিপের মালিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে কার্নের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেবে।'

'ও স্রেফ একটা প্রতিনিধি,' বলল স্যাম। 'ইয়োহান তো মালিক নিজে! ও বললে ওরা বিশ্বাস করবে নিশ্চয়ই।'

'দুঃখিত,' বলল ইয়োহান। 'আমি ইচ্ছে করেই কনভোকেশন থেকে নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছিলাম, ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ভ্যাটিক্যানের সঙ্গে সব ধরনের যোগাযোগ ফ্রেডারিখ করেছে, আমাকে কেউ চেনে না।'

'চিনলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না,' বলল রানা। 'লোকটার কাছে ছোট বাক্সটা আছে, সেটা খোলার ভয় দেখিয়ে সবাইকে জিম্মি করে বসতে পারে। নাহ্, পৃথিবীর সমস্ত ধর্মীয় নেতাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাকে গ্রেফতার করতে যাওয়া যাবে না।'

'আমার মনে হয় না ও কাউকে জিম্মি করবে,' ইয়োহান মাথা নাড়ল। 'আমি ওকে চিনি তো! মাথায় বুদ্ধির অভাব নেই। ও খুব ভাল করেই জানে, জিম্মি করে কখনও জেতা যায় না।'

'তা হলে অবস্থা বেগতিক দেখলে কী করবে সে?'

'সোজা লেজ তুলে পালাবে,' হাসল ইয়োহান। 'বিশেষ করে সঙ্গে যখন থেলমা আছে। ফ্রেডারিখ মাথা গরম করলে ওই মেয়েটাই তাকে শান্ত করে।'

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তা হলে ওকে শিপ থেকে তাড়ানো যাবে।' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল ও। 'সুসংবাদ, কী বলো? আমরা জাহাজের ভিআইপিদের বিপদমুক্ত করতে পারছি।'

'খালি হাতে যাবে না ও,' বলল জুরকিচ। 'বাক্সটাও নিয়ে

যাবে।'

'তা তো যাবেই।'

'ওকে বাক্স নিয়ে পালাতে দেবেন?' জুরকিচ চোখ কপালে তুলল।

'পালাক না! যাবে আর কোথায়?' রানার মুখে হাসি ফুটল।

'মানে!'

জবাব না দিয়ে ইয়োহানের দিকে ফিরল রানা। 'আপনারা হেলিকপ্টারে এসেছেন, তা-ই না?'

মাথা ঝাঁকাল ইয়োহান। 'হ্যাঁ।'

'ওটা নিয়ে সরাসরি আইসল্যান্ডে চলে যাননি কেন?'

'ওটায় এত লম্বা জার্নি করার মত ফুয়েল ধরে না।'

'কিন্তু এখানে ল্যান্ড করার পর নিশ্চয়ই রি-ফুয়েলিং করা হয়েছে?'

'তা তো বটেই।'

'গুড। তা হলে ধরে নিতে পারি, কার্ন পালাবার সময় হেলিকপ্টারটাই ব্যবহার করবে। ববি!' মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'তোমাকে হেলিকপ্টার ডেকে যেতে হবে... সবার চোখ এড়িয়ে। পারবে?'

'আশা করি,' মুরল্যান্ড বলল। 'জাহাজের আপার ডেকে যাবার জন্য নিশ্চয়ই ফায়ার-এস্কেপের টানেল আছে।'

'সেটা কোথায়, খুঁজে বের করতে পারবে?'

'ইঞ্জিনিয়ারিং ডেকে থাকার এই এক সুবিধা,' হাসল মুরল্যান্ড। 'পুরো জাহাজের ব্লু-প্রিন্ট পাওয়া যায় এখানে।'

'চমৎকার।'

'কী প্ল্যান আঁটছেন, খুলে বলুন তো!' স্যাম জানতে চাইল।

'তেমন কিছু না,' বলল রানা। 'জাহাজে আমরা এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করব, যাতে ঝামেলার হাত থেকে বাঁচতে কার্ন সোজা পালিয়ে যায়।'

'কীভাবে সেটা করবেন?'

'সিম্পল,' কুটিল হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। 'সী-এম্প্রেসকে হাইজ্যাক করব আমরা!'

বাইশ

থেলমার সঙ্গে ফ্রেডারিখ কার্নের সম্ভোগটা হয় টরচার সেলের খণ্ড খণ্ড মুহূর্তের মত—প্রেমিকার উপর চড়াও হয়ে তাকে আহত ও রক্তাক্ত করাটাই তাদের সান্নিধ্যের সবচেয়ে একান্ত সময়টার সংজ্ঞা। স্যাডিস্ট মনোভাবের এই দুই নরনারীর চিরাচরিত পন্থাটা আজই প্রথম বদলে গেল। সত্যিকার অর্থে দুজন মানুষ যেভাবে পরস্পরকে ভালবাসে, ঠিক সেইভাবে জীবনে প্রথমবারের মত মিলিত হলো তারা, শুরুটা যদিও ঠিক সেভাবে ছিল না।

সী-এম্প্রেসে উঠে সেকেন্ড অফিসারের কেবিনটা দখল করেছে কার্ন। হেলিকপ্টার নিয়ে ল্যান্ড করতে তেমন কোনও অসুবিধেই হয়নি। স্যাটানস্ ফিস্টের সমস্ত বাক্স শিফট করার জন্য আগে থেকেই সুইস গার্ডের ক্লিয়ারেন্স নেয়া ছিল। ওদের বলা হয়েছিল, আইসল্যান্ডের কাছাকাছি এলে সি-এম্প্রেসে কিছু রি-সাপ্লাই তোলা হবে। নিজোর্ডে সেরকম কিছু সাপ্লাই সত্যি সত্যি রাখাও হয়েছিল, প্যান্ডোরা বক্সগুলো সেগুলোর আড়ালেই তুলে ফেলা হতো জাহাজে। শেষ পর্যন্ত রি-সাপ্লাইয়ের জাহাজের বদলে কেন হেলিকপ্টারে করে কার্ন তার সঙ্গীসাথী নিয়ে সি-এম্প্রেসে এসেছে, এ ধরনের প্রশ্ন অবশ্য জেগেছিল সিকিউরিটির মনে, তবে নিজেদের শিপের অ্যাডভান্স টিম বলে

চালিয়ে দিয়েছে ওরা। ইয়োহান শ্নাইডারের চেহারা কাউকে দেখতে দেয়া হয়নি—সবাইকে জানিয়ে-শুনিয়ে স্যাকলিচের প্রেসিডেন্টকে বন্দি করে রাখা সম্ভব নয়।

সব ঝামেলা মিটে যাবার পর কেবিনে এসে ঢুকেছে কার্ন। বসে বসে মদ গিলছিল, মাঝরাতেরও অনেকক্ষণ পর হাজির হলো থেলমা, মুখে মিটিমিটি হাসি নিয়ে। বলল, 'তোমার জন্য সুসংবাদ আছে।'

'কী?' নিরাসক্ত গলায় জানতে চাইল কার্ন।

'বিছানায় এসো, তারপর বলছি।'

'কীসের বিছানায় আসাআসি? যা বলার এখনই বলো।'

'উঁহুঁ,' দুষ্টু হাসি থেলমার মুখে। 'কাছে না এলে বলব না।'

'না বললে পিটিয়ে কথা বের করব!'

'পিটালে তো আরও ভাল!' কামনার আগুন জ্বলজ্বল করছে থেলমার চোখে। 'এসো না!'

নাগালের মধ্যে থাকলে একটা লাথি কষত কার্ন, কিন্তু মেয়েটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে হলো না, তাই নরম গলায় সে বলল, 'আগে বলো, তারপর আসব।'

'ঠিক তো? কথা দিচ্ছ কিন্তু!'

'দিলাম কথা।'

এগিয়ে এসে প্রেমিকের কাঁধে দুহাত রেখে ঝুঁকল থেলমা। 'নীচে গিয়ে আমি কয়েকজন খুব ইন্টারেস্টিং মানুষের খোঁজ পেয়েছি, তাদের ধরে শ্নাইডারের সঙ্গে বন্দিও করে রেখে এসেছি।'

'গড ড্যাম ইট, থেলমা! কাদের তুমি বন্দি করেছ? জাহাজের কাউকে পাওয়া না গেলে বিরাট ঝামেলা দেখা দেবে।'

'কিচ্ছু হবে না, এরা সবাই অনাহূত অতিথি।'

'কারা?'

'মাসুদ রানা!' প্রেমিককে চমকে দিল থেলমা। 'আর তার পাঁচ

সঙ্গী—ববি মুরল্যান্ড, লিয়া নোভাক থেকে শুরু করে দেজান জুরকিচও আছে। মনে হলো প্লেন ক্র্যাশ থেকে শুধু এ-ক'জন বেঁচেছিল, সাবমেরিনেও ছিল এরাই।'

'বলো কী?' প্রায় লাফিয়ে উঠল কার্ন। 'এখানে এল কী করে? আমাদের প্ল্যান জেনে আসেনি তো?'

'উঁহুঁ, সাবমেরিনটা নিয়ে সম্ভবত আইসল্যান্ডে যেতে পারেনি, সেজন্যই সি-এম্প্রেসে এসে উঠেছে।'

'দ্যাটস্ গুড!' কার্নও হাসল। 'এবার তা হলে ওদের উপর মনের সুখে মেটানো যাবে মনের ঝাল।'

'শুধু তা-ই নয়,' বলল থেলমা। 'ওরা ধরা পড়ায় আরও কত লাভ—সেটা ভেবে দেখো। আমরা ছাড়া বাইরের আর কারও জানা থাকল না, কোথায় স্যাটানস্ ফিস্টের কার্গোটা ডুবে গেছে। নিশ্চিন্তে ওটা স্যালভেজ করে আনতে পারব। বাধা দেয়ার কেউ থাকবে না।'

ঠিক বলেছে মেয়েটা, সম্পূর্ণ অন্যদৃষ্টিতে প্রেমিকার দিকে তাকাল কার্ন। কামনা বা ভোগের দৃষ্টি নয়, এটা নিখাদ প্রশংসার। প্যান্ডোরা অপারেশনের শুরু থেকে চমৎকার কাজ দেখিয়ে যাচ্ছে থেলমা, মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করায় তার তুলনা হয় না। এমনকী সি-এম্প্রেসে কার্গো বহন করার বুদ্ধিটাও ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছিল। আজ তো রীতিমত কামাল করে দিয়েছে—নিজ থেকে ধরে ফেলেছে মাসুদ রানাকে, যে লোকটা তার জীবনে শনি হয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। শুধুমাত্র রানার কারণে সমস্ত পরিকল্পনা মাটি হয়ে যাচ্ছিল, পরাজিত হতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু কয়েকটা ঘণ্টার ব্যবধানে আবারও সবকিছু আগের মত হয়ে গেছে, জয়ী হতে চলেছে কার্ন—শুধুমাত্র থেলমার কারণে। সাগরের তলা থেকে সব বাক্স তুলে এনে আবার পরিকল্পনামত এগিয়ে যেতে পারবে সে, ফ্যাসিবাদের নতুন মহানায়ক হয়ে! সব এই অদ্ভুত মেয়েটার গুণে।

'কী, তুমি খুশি হয়েছ?' আগ্রহ নিয়ে জানতে চাইল থেলমা।

জবাব না দিয়ে প্রেমিকাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল কার্ন, বিছানায় নিয়ে ফেলল। তারপর শুরু হলো গভীর আর আবেগঘন ভালবাসাবাসি... এমনটি আগে কখনও হয়নি ওদের। সময় নিয়ে পরস্পরকে উপভোগ করল দুজন, সব শেষ হয়ে যাবার পরেও একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল।

হঠাৎ এই চমৎকার পরিবেশটার ছন্দপতন ঘটল দরজায় জোরে জোরে টোকা পড়ায়। কোনওমতে গায়ে কাপড় জড়িয়ে পাল্লা খুলল কার্ন। নুয়েনডর্ফকে দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

'কী হয়েছে?' ধমক দিয়ে জানতে চাইল কার্ন।

'সরি, স্যর,' ঢোক গিলল নুয়েনডর্ফ। 'মাসুদ রানা আর অন্যেরা... ওরা পালিয়েছে!'

'কী!'

'হ্যাঁ, স্যর।'

'কী ব্যাপার?' থেলমাও এগিয়ে এল।

'তোমার ওই মাসুদ রানা পালিয়েছে!' রাগী গলায় বলল কার্ন।

'অসম্ভব!' জোর দিয়ে বলল থেলমা। 'ওদের যেভাবে বেঁধে রেখে এসেছি, তাতে ছোটা কিছুতেই সম্ভব নয়। তা ছাড়া দরজায় একজন গার্ডও ছিল।'

'গার্ডকে বেহুঁশ অবস্থায় পেয়েছি আমরা,' বলল নুয়েনডর্ফ। 'জ্ঞান ফেরার পর বলল, তাকে নাকি একজন পাদ্রী আক্রমণ করেছিল।'

'পাদ্রী!'

'হ্যাঁ। আমার মনে হচ্ছে, জাহাজে নিশ্চয়ই মাসুদ রানার কোনও কন্ট্যাক্ট আছে।'

'রানার না,' গম্ভীর গলায় বলল কার্ন। 'জুরকিচের। পাদ্রী যখন, তারমানে ব্যাটা ব্রাদারহুডের কোনও লোক।'

‘তারপরও কোনও লাভ নেই রানার,’ বলল থেলমা। ‘এই জাহাজ থেকে পালাতে পারবে না। ব্রিজ থেকে অপারেট না করলে কোনও বোট পানিতে নামাতে পারবে না সে, হেলিকপ্টার ডেকে যাবার পথেও প্রতিটা করিডরে সুইস গার্ডদের পাহারা আছে। আমরা শুধু প্রচার করে দেব যে, জাহাজে অবাঞ্ছিত লোক উঠেছে, তাতেই সিকিউরিটির সামনে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের দশা হবে ওর।’

‘কী করব এখন, স্যর?’ জিজ্ঞেস করল নুয়েনডর্ফ।

‘থেলমা ঠিকই বলেছে,’ নিষ্ঠুর গলায় বলল কার্ন। ‘সুইস গার্ডদের গিয়ে খবর দাও, রানা আর তার দোস্তদের খুঁজে বের করো। দেখামাত্র গুলি করে মারবে, যাও!’

কী করতে হবে, তা সঙ্গীদের বুঝিয়ে দিয়েছে রানা। প্ল্যানটা শুনে প্রথমে সবাই একটু গাঁইগুঁই করছিল, তবে ওর অকাট্য যুক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে ওরা।

রানার কথাই ঠিক, এ মুহূর্তে সুইস গার্ডের কাছে যেতে পারবে না ওদের কেউ, দেখামাত্র অ্যারেস্ট করা হবে। ক্যাপ্টেনের কাছে যেতে পারলে হয়তো ইয়োহান তাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে পারত, কিন্তু কার্নের কারণে সেখানেও যাওয়া যাবে না। পথ একটাই—জাহাজে টেরোরিস্ট হামলার নাটক সাজানো, যাতে ভিতরে থাকা সাংবাদিকদের কল্যাণে সারা দুনিয়ায় খবর রটে যায়। ইটালিয়ান যে ডেস্ট্রয়ারটা সি-এম্প্রেসকে অনুসরণ করছে, সেটা ছুটে আসবে সবার আগে, তারপর অন্যান্য দেশও স্ট্রাইক টিম পাঠাবে। এতসব ঝামেলা পোহাবার ঝুঁকি নেবে না কখনও কার্ন, কারণ তখন প্যান্ডোরা বক্স সরানো তো দূরের কথা, নিজেও জাহাজ ছেড়ে যেতে পারবে না। পিঠ বাঁচাতে যত তাড়াতাড়ি পারে, পালিয়ে যাবে সে। আর লোকটা জাহাজ থেকে দূরে চলে গেলে রানারা সুইস গার্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করবে। নিঃসন্দেহে গ্রেফতারকৃতদের দেখতে আসবে ক্যাপ্টেন, আর তখনই তাকে

সব খুলে বলবে ইয়োহান।

এই মুহূর্তে সবার পজিশন নেয়া হয়ে গেছে। খালি এইট্রিয়ামের একপাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রানা, ওর সঙ্গে লিয়া আর ইয়োহান; রাত হয়ে যাওয়ায় বিশাল হলরুমটা একদম শূন্য হয়ে আছে। ফাদার নভোস্কি, জুরকিচ আর সিলভিয়া সহ স্যাম গেছে থিয়েটারে—সেখানে রাতভর একটা অপেরা চলার কথা। মুরল্যান্ডকে পাঠানো হয়েছে হেলিকপ্টার ডেকে, বিশেষ একটা দায়িত্ব দিয়ে। ইতোমধ্যে নিঃসঙ্গ কয়েকজন গার্ডকে বেহুঁশ করে সবার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

ঘড়ি দেখে ডেডলাইন মেলাল রানা। যখন সন্তুষ্ট হলো, বাল্কহেডে লাগানো ফায়ার অ্যালার্মের সুইচ টিপে দিল ও। প্রথমে কয়েকটা মুহূর্ত কিছু ঘটল না, তারপরই তারস্বরে বাজতে শুরু করল পাগলাঘণ্টি। তাড়াতাড়ি টবে লাগানো কয়েকটা ফুলগাছের আড়ালে আশ্রয় নিল ওরা। একটু পরই পায়ের শব্দ শোনা গেল, তড়িঘড়ি করে ড্যামেজ কন্ট্রোল টিম আসছে আগুন নেভাতে।

'গেট রেডি!' সঙ্গীদের চাপা গলায় বলল রানা।

সামনেই উদয় হতে দেখা গেল ছোট্ট দলটাকে, পুরোদস্তুর ফায়ার ফাইটিং গিয়ার পরে ছুটতে ছুটতে আসছে। পিস্তল আর এমপি-৫ তুলে গুলি করল রানারা... লোকগুলোর মাথার উপর দিয়ে। ইতোমধ্যে সাইলেন্সারগুলো খুলে নিয়েছে ওরা, যাতে জোরালো শব্দ হয়।

সফল হলো উদ্দেশ্যটা, প্রচণ্ড আওয়াজ হলো গুলি করার, বিশাল এইট্রিয়ামের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো আরও কয়েক গুণ বেশি হয়ে। পাগলের মত ফ্লোরে ঝাঁপ দিল লোকগুলো। আবারও গুলি চালাল রানারা, ঠ্যাক ঠ্যাক করে বাল্কহেডে বিঁধল কিছু, ভেঙে পড়ল বিশাল একটা ঝাড়বাতি।

ক্রল করে পিছিয়ে যেতে শুরু করেছে আক্রান্ত দলটা। রানা

চেঁচিয়ে উঠল, 'আমরা *অ্যাকশন ফ্রন্ট অভ লিবারেশনের* সদস্য। ধর্মীয় গোঁড়ামি নিপাত যাক!' আরেক পশলা গুলি ছুঁড়ল ও।

'ইয়োহান, আপনি আলাদা হয়ে যান,' বলল রানা। 'ব্রিজে পৌঁছুতে পারেন কি না দেখুন। গোলাগুলি করবেন না, স্বাভাবিকভাবে যাবেন। ক্যাপ্টেনকে যত তাড়াতাড়ি পাওয়া যায় ভাল। যদি দেখেন কার্ন ভেগে গেছে, তা হলে শিপের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেমে ডাক দেবেন আমাদের।'

'ঠিক আছে,' বলে অস্ত্র ফেলে দিয়ে ছুটে চলে গেল ইয়োহান।

'আমরা কী করব?' জানতে চাইল লিয়া।

'আমরা আমাদের টেরোরিস্ট অ্যাটাকের পরিধি আরেকটু বাড়াব,' চওড়া হাসি হাসল রানা। 'এসো।'

সঙ্গিনীকে নিয়ে একটা করিডরে ঢুকে পড়ল রানা। কিছুদূর এগোতেই পাশের একটা দরজা খুলে বেরিয়ে এল বিশালদেহী এক সিকিউরিটি পার্সোনেল, দেখেই লোকটাকে চিনতে পারল রানা—ওদেরকে বন্দি করার সময় থেলমার সঙ্গে ছিল এই ব্যাটা। হঠাৎ সামনে ওদেরকে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লোকটা, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে পিস্তল তুলতে শুরু করল। দেরি করল না রানা, গার্ডের পেট লক্ষ্য করে ডাইভ দিল।

পেটে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে গুঙিয়ে উঠল লোকটা, চিৎ হয়ে পড়ে গেল ডেকে। উঠে দাঁড়িয়ে এক লাথিতে লোকটার অস্ত্র ধরা কবজি ভেঙে দিল রানা। ব্যথায় আর্তনাদ করে উঠল সে।

খপ করে পরাজিত প্রতিপক্ষের কলার চেপে ধরল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'ক'জন আছে তোদের লোক? ঠিক করে বল্, নইলে বাকি হাত-পাও ভেঙে দেব।'

'বিশ... বিশজন আমরা,' কাঁপতে কাঁপতে বলল গার্ড।

'কীভাবে চিনব ওদের?'

ভাল হাতটা দিয়ে নিজের বুকে লাগানো একটা হলুদ ইনসিগনিয়া দেখাল গার্ড। 'এই জিনিস পরে আছে সবাই।

আপনাদের মারতে বেরিয়েছি তো, কেউ যেন নিজের লোককে ভুল করে গুলি করে না দেয়, সেজন্য এই ব্যবস্থা।'

'আমাদের মারতে বেরিয়েছে?' তাজ্জব হয়ে গেল লিয়া।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল গার্ড। 'দেখামাত্র গুলির হুকুম দিয়েছেন হের কার্ন।'

'তাই নাকি?' বলে লোকটা অন্য হাতের কবজিটা ধরল রানা, এক মোচড়ে ভেঙে দিল সেটাও।

আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল গার্ড, ঘাড়ে একটা কারাতে চপ মেরে তাকে বেহুঁশ করে ফেলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, লিয়া বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'তুমি বড্ড নিষ্ঠুর,' বলল সে।

'এসব জানোয়ারগুলোকে মায়া দেখিয়ে কী ফল, বলো?' রানা বলল। 'শুনলে না, আমাদের গুলি করে মারতে বের হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল লিয়া।

'কেউ আমাকে শিকার করতে বের হোক, তা আমি একদম পছন্দ করি না,' রানার চেহারায় ভয়ঙ্কর একটা অভিব্যক্তি ফুটল। 'যারা এ ধরনের ইচ্ছা নিয়ে বের হয়, তাদেরই উল্টো শিকার করি আমি।' হাসল ও। 'হলুদ ইনসিগনিয়া পরে ওরা আসলে নিজেদের বাঁচাচ্ছে না, উল্টো আমাকে টার্গেট চিনিয়ে দিচ্ছে। আমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হবে না। এসো।'

লিয়ার হাত ধরে টেনে ছুটতে শুরু করল রানা।

ফায়ার অ্যালার্মের শব্দ শুনে চমকে উঠল ফ্রেডারিখ কার্ন। খবর জানাবার জন্য কেউ আসে কি না ভেবে অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ, কিন্তু গুম গুম করে দূর থেকে ভেসে আসা গোলাগুলির চাপা শব্দ শুনে আর স্থির থাকতে পারল না। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, দৌড়ে কেবিনের দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে এল। কিছুদূর যেতেই নুয়েনডর্ফকে দৌড়ে আসতে দেখা গেল।

'হচ্ছেটা কী?' চেঁচিয়ে উঠল কার্ন।

'জাহাজে টেরোরিস্টরা হামলা করেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল প্রাক্তন র‍্যালি ড্রাইভার। 'কী এক *লিবারেশন ফ্রন্ট* যেন। ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে পৃথিবীকে বাঁচাতে চায়।'

'কী ধরনের ফাজলামি এটা?' কার্ন রাগান্বিত।

'আমি সিরিয়াস, স্যর। ফায়ার অ্যালার্ম বাজিয়ে মেইন হলে ড্যামেজ কন্ট্রোল টিমকে আনিয়েছে, তারপর সোজা গুলি করতে শুরু করেছে। ওয়্যারলেসে সুইস গার্ডের কমান্ডার কীভাবে চেঁচাচ্ছে, কল্পনাও করতে পারবেন না।'

'এখানে টেরোরিস্ট আসবে কোত্থেকে?' কার্ন কিছু বুঝতে পারছে না।

'টেরোরিস্ট না,' বলল থেলমা, ওর পিছন পিছন এসেছে সে। 'ওটা রানার কাণ্ড। রানা ছাড়া আর কেউ না। আমার কাছে চাপা মারছিল, বাইরে সাহায্য চেয়ে ফোন করেছে। আমি বিশ্বাস করিনি, করার প্রশ্নই ওঠে না। ওদের পক্ষে সম্ভব ছিল না কোথাও যোগাযোগ করার। সেজন্যই টেরোরিস্ট হামলার নাটক সাজাচ্ছে, যাতে টেরোরিস্ট ঠেকাতে বাইরে থেকে লোক এলে আমাদের গ্রেফতার করাতে পারে।'

'লোকটা আমার জীবন নরক বানিয়ে ছাড়ছে,' তিক্ত গলায় বলল কার্ন। 'এমন নাছোড়বান্দা মানুষ আমি জীবনে দেখিনি, কোথায় চুপচাপ লেজ গুটিয়ে পালাবে, তা না, আমার পিছনে লেগেই আছে।'

'ওর প্ল্যান কাজে লাগছে কিন্তু, স্যর,' ভয়ার্ত গলায় বলল নুয়েনডর্ফ। 'সুইস গার্ডদের এটা-সেটা বলে বুঝ দিয়ে দেয়া যাবে, আফটার অল, আমরাও তো সিকিউরিটির লোক। কিন্তু বাইরে থেকে রেসকিউ টিম এলে পার পাওয়া যাবে না, সত্যি সত্যিই আটকা পড়ে যাবো আমরা।'

'ততক্ষণ আমরা এখানে থাকলে তো!' হেসে উঠল কার্ন।

‘কিচ্ছু করতে পারবে না কেউ। রানা সের হলে আমি সোয়া সের। কপ্টারটা কি এমনি এমনি রি-ফুয়েল করে রেখেছি? যত খুশি লোক আনাক ও, আমরা ততক্ষণে পগার পার হয়ে যাবো।’

হাসি ফুটল থেলমার মুখেও। ‘ঠিক বলেছ, ডার্লিং। রানাকে এখানে বসিয়ে মাছি মারতে রেখে যাবো আমরা। নুয়েনডর্ফ, চলো কেবিন থেকে স্যাটানস্ ফিস্টের বক্সটা নিয়ে আসি।’

‘আমাদের লোক যারা রানাকে মারতে গেছে, তাদের কী হবে?’ জানতে চাইল নুয়েনডর্ফ। ‘রানা ওদের বাগে পেলে ছেড়ে দেবে না।’

‘মরুক গর্দভগুলো,’ সখেদে বলল কার্ন। ‘রানাকে যখন ঠেকাতে পারেনি, তখন ওটাই ওদের শাস্তি।’

দৌড়াতে দৌড়াতে জাহাজের স্পা এরিয়ায় এসে পৌঁছুল রানা আর লিয়া। কাঁচের দেয়ালের ওপাশে মস্ত বড় এক জিমনেশিয়াম আর একটা অলিম্পিক সাইজ সুইমিং পুল চোখে পড়ল রানার। হলওয়ের শেষ মাথায় একটা ফায়ার অ্যালার্ম সুইচ আছে, ছুটে গিয়ে সেটা টিপে দিল ও। স্যামের টিমকেও একই নির্দেশ দেয়া আছে—থিয়েটারের দর্শকদের ভয় দেখানোর পর মুভমেন্টের উপর থাকবে ওরা, যত ফায়ার অ্যালার্ম আছে, সবগুলোর সুইচ টিপে দেবে। নার্ভ কাঁপিয়ে দেয়ার জন্য তারস্বরে বাজতে থাকা ফায়ার অ্যালার্মের চেয়ে ভাল আর কোনও জিনিস হয় না।

স্পা-র অ্যালার্ম বাজিয়ে আবার লিয়াকে নিয়ে ছুটল রানা। পথে বেশ কিছু অতিথির দেখা পেল ওরা, সবাই যার যার কেবিন থেকে বেরিয়ে এসেছেন কী ঘটছে দেখার জন্য। অস্ত্রগুলো জামার আড়ালে লুকিয়ে জায়গাটা পার হলো ওরা, শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোকে ভয় দেখাতে চায় না।

সামনে পড়া একটা দরজা ঠেলে পা বাড়াতেই খোলা ডেকে বেরিয়ে এল রানা আর লিয়া, সেখানে জাহাজের বেশ [illegible]

অফিসার লাইফবোট চেক করছে, সত্যি সত্যি আগুন লেগে থাকলে যাত্রীদের নামিয়ে দিতে হবে বলে। আকাশের দিকে এমপি-৫ তুলে একটা ব্রাশফায়ার করল রানা, অফিসারদের পাগলের মত ডেকের উপর লাফ দিয়ে গড়াতে দেখল। উল্টো ঘুরে আবার সুপারস্ট্রাকচারের ভিতর ঢুকল দুজনে।

সিঁড়ি ধরে উপরের ডেকে যেতেই বিপদ উদয় হলো। কার্নের দলের গার্ডরা সম্ভবত রানারা কোন্ রুট ধরে এগোচ্ছে, তা বুঝতে পেরেছে। সিঁড়ি দিয়ে মাথা তুলেই চমকে গেল রানা, ছ'জন গার্ড বিশ গজ দূরে পজিশন নিয়ে অস্ত্র তাক করে রেখেছে সিঁড়ির ল্যান্ডিঙের দিকে। রানাকে মাথা তুলতে দেখেই ফায়ার করতে গেল তারা।

বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন রানার গায়ে, ধাক্কা দিয়ে লিয়াকে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিল, তারপর ঝট করে সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল নিজে। মাথার উপর বৃষ্টির মত বুলেট ছুটতে দেখল ও, দেরি করল না একটুও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে। লাইন অভ ফায়ার আর ল্যান্ডিঙের ফ্লোরের মাঝখানে ইঞ্চিছয়েক তফাত আছে। ফাঁকাটুকুতে এমপি-৫টা কাত করে শুইয়ে দিল ও, ওই অবস্থাতেই শুধু কবজিটা তুলে ট্রিগার চাপল। ফ্লোর ছোঁয় ছোঁয় এভাবে বুলেটবৃষ্টি হলো, আক্রমণটা এতই অপ্রত্যাশিত যে পাল্টা কিছু করার রইল না শত্রুদের। উঁচুতে গুলি হলে বসে বা শুয়ে আত্মরক্ষা করা যায়, কিন্তু রানার এই মাটি কামড়ানো গুলি থেকে বাঁচতে স্রেফ উড়তে হবে ওদের। বলা বাহুল্য যে, সেটা সম্ভব নয় কারও পক্ষে।

এমপি-৫-এর নির্দয় গুলিতে যারা নিল ডাউন ছিল, তাদের হাঁটু উড়ে গেল, দাঁড়ানোরা হারাল পায়ের আঙুলসহ পাতা। তীব্র আর্তনাদ করে ধপাধপ মেঝেতে আছড়ে পড়ল ছয় শত্রু, অস্ত্র ফেলে দিয়ে আঘাত পাওয়া জায়গাগুলো চেপে ধরে কাতরাতে শুরু করল। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে লোকগুলোকে এক পলক

দেখল রানা। চোখের সামনে সঙ্গে সঙ্গে ভেসে উঠল ডিসি-থ্রী'র ক্র্যাশে মারা যাওয়া নিরীহ মানুষগুলোর চেহারা, মনে কোনও করুণা অনুভব করল না ও এদের জন্য।

রানাকে দেখে ব্যথা ভুলে গেল দুজন গার্ড, মেশিনগান তুলে ফায়ার করার চেষ্টা করল। কিন্তু রানা অনেক বেশি ক্ষিপ্র, চোখের পলকে হাতের এমপি-৫ দিয়ে দুটো সিঙ্গল শট নিল। কপালে তৃতীয় নয়ন নিয়ে চিরশান্তির দেশে পাড়ি জমাল দুই দুঃসাহসী গার্ড।

সামনে হুল্লোড় শুনে সচকিত হলো রানা, মোড় ঘুরে আরও চারজন গার্ডকে আসতে দেখল ও—সবার বুকে হলুদ ইনসিগনিয়া। নির্দ্বিধায় ব্রাশফায়ার করল রানা, ছিন্নভিন্ন লাশ হয়ে চারদিকে ছিটকে পড়ে গেল নতুন গ্রুপটা।

প্রথম দলের আহত চারজন বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সাক্ষাৎ যমদূতের দিকে, অপেক্ষা করছে ভবলীলা সাঙ্গ হবার। রানা চোখে আগুন নিয়ে ওদের দিকে তাকাল। বলল, 'মরছ না তোমরা, পঙ্গু হয়ে বেঁচে থাকবে। যত মানুষকে চেনো, সবাইকে বলে দিয়ো, তোমাদের মত ভুল যেন তারা কেউ না করে। শয়তানের সঙ্গে যেন হাত না মেলায়, বুঝেছ?'

লিয়া উঠে এসেছে, কোমর ডলছে—সিঁড়ি থেকে পড়ার সময় ব্যথা পেয়েছে জায়গাটায়। উহ্ আহ্ করে বলল, 'বলে-কয়ে ধাক্কাটা দিলে পারতে।'

'কী করব,' বলল রানা। 'এই লোকগুলো ওটুকু ভদ্রতা করার সময় দিল না।'

'মাগো!' লাশগুলো দেখে আঁতকে উঠল লিয়া। 'মেরেই ফেললে?'

'যার যা প্রাপ্য, তা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দিতে কার্পণ্য করি না আমি,' শান্ত গলায় বলল রানা।

পিছনে ধুপধাপ শব্দ হলো, নীচতলার ল্যান্ডিঙে একজন [illegible]

গার্ডের ইউনিফর্ম দেখে চমকে উঠল ও। লিয়াকে হাত ধরে টান দিল, 'এসো।'

দৌড়ে করিডর পেরিয়ে বৃত্তাকার একটা স্কোয়্যারে বেরিয়ে এল দুজনে। মাঝখানটা ফাঁকা, রেলিঙের উপর ঝুঁকে নীচে বিশাল সুইমিং পুলটা দেখতে পেল রানা, স্পা-র ঠিক উপরে উঠে এসেছে ওরা। ডানে-বামে দৃষ্টি ফেরাতেই দুপাশেই বিভিন্ন করিডর থেকে সুইস গার্ডদের বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল ও, পিছন থেকেও আসছে একটা দল। ফাঁদে পড়ে গেছে ওরা।

'সাঁতার কাটতে জানো তো?' সঙ্গিনীকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'মানে!' লিয়া অবাক, রানাকে নীচের দিকে ইঙ্গিত করতে দেখে আঁতকে উঠল। 'ওহ্... না!'

'হ্যাঁ,' বলে রেলিং টপকাল রানা, সোজা ঝাঁপ দিল নীচে। ঠোঁট উল্টে লিয়াও পিছু নিল।

ঝপাস ঝপাস করে পানিতে পড়ল ওরা, পতনের গতিতে ডুবে গেল অনেকটা। উপর থেকে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল সুইস গার্ডরা। ডুব সাঁতার দিয়ে দুই শিকারকে সুইমিং পুলের কিনারায়ও চলে যেতে দেখল।

ভুস করে মাথা তুলে সুইমিং পুলের ধার আঁকড়ে ধরল রানা, দুহাতে ভর দিয়ে উঠতে যাবে, এমন সময় চোখের সামনে নিশ্চিত মৃত্যুর মত কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্রের নল দেখে স্থির হয়ে গেল। বোঝা যাচ্ছে, কেন উপরতলা থেকে গুলি করা হয়নি। নীচে একটা গ্রুপ আছে আগে থেকেই।

কঠোর চেহারায় এক ইতালিয়কে দেখা গেল সুইস গার্ডদের নেতৃত্ব দিচ্ছে। ভাসতে থাকা দুই বন্দিকে উদ্দেশ্য করে সে বলল, 'প্লিজ, কোনও চালাকি নয়।'

ঠিক তখুনি শিপের অ্যানাউন্সমেন্ট সিস্টেমে ভেসে এল একটা গুরুগম্ভীর গলা। 'মি. রানা, দয়া করে আত্মসমর্পণ করুন। আমি ইয়োহান শ্লাইডার বলছি, ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে,

আমার। তিনি আপনাদের সবার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

'থ্যাঙ্ক গড! ছোটাছুটি করে আর পোষাচ্ছিল না,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, তাকাল সুইস গার্ডের নেতার দিকে। 'দয়া করে উঠতে একটু সাহায্য করবে নাকি, ভায়া? বড্ড ক্লান্ত হয়ে গেছি!'

তেইশ

ব্রিজে নিয়ে আসা হলো রানা আর লিয়াকে। ইয়োহান শ্নাইডার আর সি-এম্প্রেসের ক্যাপ্টেন ওদের জন্য অপেক্ষা করছেন ওখানে। দেখা গেল হাজির আছে স্যামের দলও—ওরা আগেই ধরা পড়েছে। রানারা পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পর মুরল্যান্ডকেও নিয়ে এল সুইস গার্ডদের আরেকটা গ্রুপ। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল রানা।

'সব ঠিকঠাক আছে,' মৃদু হাসল মুরল্যান্ড। 'আমার সামনে দিয়েই টেকঅফ করেছে কার্ন, থেলমা আর নুয়েনডর্ফ। প্যান্ডোরা বক্সটাও ছিল। সুন্দর করে বিদায় দিয়েছি ওদের... অবশ্য আড়াল থেকে।'

হাসল রানা।

একটু পরেই ব্রিজে হাজির হলেন ভ্যাটিক্যানের সেক্রেটারি অভ স্টেট কার্ডিনাল সাইমন পাগনানি, সঙ্গে সুইস গার্ডের কমান্ডার জিয়ামপোলো অগাস্টিনো। ভিতরে পা দিয়েই পাগনানি জানতে চাইলেন, 'এখানে হচ্ছেটা কী, জানতে পারি?'

এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল ইয়োহান, নিজের পরিচয় দিল।

'স্যাকলিচ এজি-র প্রেসিডেন্ট!' অবাক হলেন পাগনানি।

'আপনি এখানে কী করছেন? ট্রাভেলার্স ম্যানিফেস্টোতে তো আপনার নাম দেখিনি। আর এসেছেন ভাল কথা, এরা কারা? আমাদের মহৎ প্রচেষ্টাটাকে কেন বানচাল করতে চাইছে?'

'আমরা কিছুই বানচাল করতে চাইছি না, স্যর,' বলল রানা। 'বরং সম্মেলনের সবার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছি এতক্ষণ।'

'গোলাগুলি করে আর মানুষ মেরে? ভালই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, মিস্টার। কে আপনি?'

'জী... আমার নাম মাসুদ রানা।'

'রানা?' কী যেন ভাবলেন পাগনানি। 'নামটা চেনা চেনা লাগছে কেন?'

কমান্ডার অগাস্টিনো অবশ্য বুঝে ফেলেছেন সঙ্গে সঙ্গে। 'আপনি কি রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা?'

'ঠিকই ধরেছেন।'

'এবার চিনেছি,' পাগনানির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'আপনি তো রীতিমত বিখ্যাত লোক... এখানে কী করছেন?'

'লম্বা গল্প, দয়া করে যদি হাতকড়াটা খুলে দিতে বলতেন...'

ইতস্তত করলেন কার্ডিনাল। তিনি খবর পেয়েছেন, এরা অন্তত ছ'জন সিকিউরিটি পার্সোনেলকে খুন করেছে। এমন খুনীদের হাতকড়া খুলে দেয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না।

'আমরা আপনাদের কারও ক্ষতি করতে আসিনি, স্যর,' বলল রানা। 'নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, যারা খুন হয়েছে আপনাদের কেউ নয় তারা—খুন হয়েছে নিয়ো-নাৎসিদের জনাকয়েক বদমাশ। যদি ডেলিগেটদের কাউকে মারতে চাইতাম, তা হলে শুরুতেই তাদের লক্ষ্য করে গুলি করতে পারতাম।'

ওর গলার স্বরে দৃঢ়তা লক্ষ করে অবাক হয়ে গেলেন কমান্ডার অগাস্টিনো। সারাটা জীবন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত আছেন তিনি, অপরাধী আর নিরপরাধের কথা বলার ধরন শুনেই বুঝতে পারেন সব। রানাকে কয়েক সেকেন্ড খুঁটিয়ে দেখলেন

অভিজ্ঞ কমান্ডার। তারপর অধীনস্থ একজনকে ইতালিয় ভাষায় আদেশ দিলেন সবার হ্যান্ডকাফ খুলে দিতে।

'বলুন এবার আপনাদের গল্প,' বললেন পাগনানি।

'তার আগে গার্ড আর ব্রিজ ক্রু-দের চলে যেতে বলুন দয়া করে,' বলল রানা। 'ব্যাপারটা শুধু আপনি, কমান্ডার অগাস্টিনো আর জাহাজের ক্যাপ্টেন ছাড়া আর কাউকে জানাতে চাই না আমরা।'

অগাস্টিনোর দিকে তাকিয়ে ইশারা করলেন কার্ডিনাল, তিনি সবাইকে ব্রিজ থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন। একে একে বেরিয়ে গেল সব লোক। চুপচুপে হয়ে ভেজা রানা ও লিয়াকে দুটো কম্বল দেয়া হলো শরীরে জড়াবার জন্য।

এবার শুরু থেকে পুরো ঘটনা ধীরে ধীরে খুলে বলল রানা, মুরল্যান্ড আর লিয়া। শুনতে শুনতে উপস্থিত সবার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। কাহিনি শেষ হবার পরও অনেকক্ষণ কথা ফুটল না কারও মুখে। শেষে পাগনানি বললেন, 'মাই গড! এতই শক্তিশালী ওই উল্কাপিণ্ডটা?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আর সেটার হাত থেকে গোটা দুনিয়াকে বাঁচানোর জন্যে আপনারা নিজের জীবন তুচ্ছ করে নিয়ো-নাৎসিদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন?'

'ইয়ে... মানে... ঠিক ওরকম কৃতিত্ব দাবি করছি না। তবে হ্যাঁ, লড়াই করতে হয়েছে আমাদের।'

'ওয়েল ডান, মি. রানা,' প্রশংসা ফুটল পাগনানির গলায়। 'আপনাদের মত মানুষ পুরো মানবজাতির গর্ব। কিছু মনে না করলে আপনাদের আমি সাইনোডে একটা জায়গা দিতে চাই। পোপও সব শুনলে একই প্রস্তাব দেবেন বলে নিশ্চিত আমি।'

'কিন্তু আমরা তো কেউ ধর্মযাজক নই!' প্রতিবাদ করল লিয়া।

'তা হতেই হবে কেন? আমরা যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই

সম্মেলনটা শুরু করেছি, তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনারা। গোটা পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য কীভাবে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ আর গোত্রের মানুষ একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারে, তা দেখিয়ে দিয়েছেন আপনারা। আমি তো বলব, সাইনোডে হাজির হওয়া সমস্ত নেতাদের উচিত আপনাদের উদাহরণ অনুসরণ করা।'

'দুঃখিত, অন্যদের কথা বলতে পারি না, তবে এই সম্মানটা আমার পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কার্ডিনাল,' বলল রানা। 'নিজেকে আমি আর যা-ই মনে করি, অন্তত ধর্মীয় নেতাদের সারিতে বসার যোগ্য মনে করি না, তাঁদের শিক্ষা দেবার তো প্রশ্নই ওঠে না। আপনি যতটা প্রশংসা করলেন তা-ই আমার জন্য যথেষ্ট, দয়া করে আর কিছু বলে লজ্জা দেবেন না।'

দেখা গেল বাকিরাও একই মত পোষণ করছে।

হাসলেন পাগনানি। 'বেশ, আপনারা যদি না চান, তা হলে আর জোর করব না। তবে নাম প্রকাশ না করার শর্ত মেনে নিয়ে ঘটনাটা সবাইকে জানাতে পারি তো? ওটা শুনলে সবার যে উপকার হবে, তাতে আমি নিশ্চিত।'

এবারও নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'সেটাও উচিত হবে না, স্যর। স্যাটানস্ ফিস্টের কথা জানাজানি হলে মহা সঙ্কটে পড়ে যাবে গোটা মানবসভ্যতা। আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে সেটা বুঝতে পেরেছিলেন রাসপুটিন, আজও পরিস্থিতিটা বদলায়নি, তাই আমি তাঁর সঙ্গে একমত। সবাইকে ব্রিজ থেকে বের করে দিয়েছি সেজন্যই। কিছু কিছু জিনিস আছে, কার্ডিনাল, যেগুলো মানুষের হাতে পড়ার জন্য সৃষ্টি হয়নি। যা দিয়ে ক্ষতি করা যায় তার কথা মানুষের জানারও দরকার নেই।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন পাগনানি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মি. রানা। ব্যাপারটা এভাবে ভেবে দেখিনি আমি। ঘটনাটা প্রকাশ করা আসলেই উচিত হবে না। তবে শুধু আমরা মুখ বন্ধ রাখলেই কি হবে?

নিয়ো-নাৎসিরা জানে স্যাটানস্ ফিস্টের কথা, যেখানে বাক্সগুলো ডুবে গেছে, সেখান থেকে তুলে আনাও নিশ্চয়ই একেবারে অসম্ভব কাজ নয়?'

'ব্রাদারহুড ওদের ঠেকাবে,' দৃঢ় গলায় বললেন নভোস্কি।

'মাত্র বিশ-পঁচিশজন ধর্মযাজক আর বিজ্ঞানীর একটা দল নিয়ে আপনারা কী-ই বা করতে পারবেন ওদের মত টেরোরিস্টদের বিরুদ্ধে?'

'ওঁরা একা নন,' রানা বলল। 'বিসিআই, রানা এজেন্সি আর নুমার সাহায্য নিয়ে আমি আর ববিও আছি।'

'শুধু আপনারা থাকবেন কেন?' বলে উঠল ইয়োহান। 'আমিও আছি সঙ্গে... পুরো স্যাকলিচ কর্পোরেশন নিয়ে।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে সবাই তাকাল তার দিকে। নভোস্কি চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আপনি আমাদের হয়ে নিয়ো-নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন?'

'যুদ্ধ-বিগ্রহ আমি পছন্দ করি না, ফাদার,' বলল ইয়োহান। 'আপনাদের সাহায্য করার আরও ভাল একটা পন্থা আছে। আমি একটা স্যালভেজ অপারেশন স্পনসর করব, যেটা ব্রাদারহুডের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। বাক্সগুলো তুলে নিয়ে আপনারা পৃথিবীর সবচেয়ে গভীর সমুদ্রখাদে ফেলে দিয়ে আসতে পারবেন, যেখান থেকে কেউ কোনওদিন সেগুলো আর তুলে আনতে পারবে না।'

'এটা তো খুবই ভাল একটা প্রস্তাব!' নভোস্কি [illegible] করলেন।

'শুধু তা-ই নয়,' বলে চলল ইয়োহান, 'বিশ্বযুদ্ধে [illegible] পরিবারগুলোর পুনর্বাসন আর ক্ষতিপূরণের জন্য [illegible] করা দরকার, সব করব আমি। আমার [illegible] জানি—পূর্বপুরুষদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার [illegible] পথ। নিজের বিবেকের কাছেও ভারমুক্ত হতে পারব [illegible]

'আপনার কোম্পানির বাকি লোকরাও কি একইভাবে মেনে নেবে ব্যাপারটা?' জানতে চাইল জুরকিচ।

'সেসব নিয়ে আমাকে ভাবতে দিন,' ইয়োহানের কণ্ঠে স্থির প্রতিজ্ঞা। 'ওদের কীভাবে রাজি করাতে হয়, সেটা আমি দেখব।'

'তারপরও কিন্তু সবকিছুর সমাধান হলো না,' বললেন অগাস্টিনো। 'গ্রিনল্যান্ডে নিজোর্ড আর জিয়ো-রিসার্চের সঙ্গে ফ্রেডারিখ কার্নের যে লোকগুলো রয়ে গেছে, তারা তো পার পেয়ে যাচ্ছে। আর কার্নও যে একটা বাক্স নিয়ে পালাল, তার কী হবে? আপনারা গল্প বলায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ওদিকে লোকটা তো পালিয়ে যাচ্ছে।'

'ভাববেন না,' রানার ঠোঁটে মুচকি হাসি। 'গ্রিনল্যান্ডে যারা আছে, তাদেরকে ড্যানিশ সরকারের মাধ্যমে গ্রেফতার করানো যাবে। আমাদেরকে শুধু অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের মাধ্যমে একটা খবর পাঠাতে হবে। শিপের সিকিউরিটিতেও কার্নের আরও কিছু লোক আছে, তাদের ভার আপনার উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আর কার্ন? বেশিদূর যেতে পারবে না সে।'

'মানে!'

মুরল্যান্ডের দিকে তাকাল রানা। 'কী, ববি? সময় হয়েছে?'

ঘড়ি দেখল মুরল্যান্ড। 'হ্যাঁ। কথা বলা যেতে পারে এবার ওর সঙ্গে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। 'কিছু মনে করবেন না, ক্যাপ্টেন। আপনার রেডিও সেটটা একটু ব্যবহার করতে পারি?'

গত চল্লিশ মিনিট ধরে উড়ছে বেল জেটরেঞ্জার হেলিকপ্টারটা, আইসল্যান্ডের দিকে অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছে ইতোমধ্যে। ভিতরে বসে জানালা দিয়ে উদাসভাবে নীচের সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে ফ্রেডারিখ কার্ন। লেজ গুটিয়ে সি-এম্প্রেস থেকে পালিয়ে আসতে হয়েছে বলে তার মনটা বড়ই খারাপ, মাসুদ

রানাকে খুন করতে পারলে শান্তি পেত। কিন্তু করার কিছু ছিল না। তবে এখনও শেষ হয়নি কিছু, পাল্লা এখনও তার দিকেই ভারী। যথাসময়ে বাংলাদেশের উপর আঘাত হানবে সে, তারপর তিলে তিলে মারবে মাসুদ রানা নামের ওই বেয়াড়া বাঙালিটাকে। আপনমনেই হেসে উঠল সে।

'হের কার্ন,' সামনের সিট থেকে কথা বলে উঠল পাইলট। 'সী-এম্প্রেস থেকে একটা ট্রান্সমিশন রিসিভ করছি আমি। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে।'

'কে?'

'মাসুদ রানা... আপনাকে চাইছে।'

কুটিল একটা হাসি ফুটল কার্নের মুখে, বাঙালির বাচ্চাটা নিশ্চয়ই তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিরস্ত করতে চাইছে। ব্যাটার মুখের উপর দুটো কথা শোনাবার লোভটা সংবরণ করতে পারল না সে। বলল, 'দাও কানেকশন।'

হেডফোনে মৃদু খসখসে আওয়াজের মাঝ দিয়ে শোনা গেল রানার কণ্ঠস্বর। 'হ্যালো কার্ন! দিস ইজ মাসুদ রানা।'

'বরং বলো, মাসুদ রানা দি গ্রেট!' খোঁচা মেরে প্রত্যুত্তর দিল কার্ন। 'হঠাৎ কী মনে করে?'

'তোমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করার জন্যে যোগাযোগ করেছি। সরি, তোমার সাজানো-গোছানো নীল নকশাটার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি, না?'

হেসে উঠল কার্ন। 'হ্যাঁ বাপু, তুমি সত্যিই যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। ভালই খেল্ দেখিয়েছ গত কয়েকটা দিন। আফসোস, তারপরেও জিততে পারলে না।'

'পারিনি বুঝি?' রানার গলায় কৌতুক।

'উঁহুঁ, একটা প্যান্ডোরা বক্স রয়ে গেছে আমার কাছে, বাকিগুলোও তুলে আনতে পারব। আর হাতেরটা দিয়ে কী করতে চলেছি, তা নিশ্চয়ই ইয়োহান তোমাকে জানিয়েছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানিয়েছে।'

'বটে! সেজন্যই তুমি এখন কমিউনিকেট করছ, তাই না? মাফ চেয়ে অনুরোধ করতে যাচ্ছ, যাতে তোমার সাধের দেশটাকে আমি রেহাই দিই—ঠিক বলেছি?'

'একদম না,' রানা বলল। 'বরং একেবারে উল্টো অনুমান করছ।'

'উল্টো!'

'আমি আসলে তোমার মুখ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা শুনতে চাইছি।'

'তোমার মাথা-টাথা ঠিক আছে তো?' খেপে উঠল কার্ন। 'আমি কেন ক্ষমা চাইব... তাও তোমার মত একটা নরকের কীটের কাছে?'

'নরকের কীট আমি নই—তুমি,' রানার গলা আশ্চর্য রকম শান্ত। 'মানুষ নামের কলঙ্ক তুমি একটা, সঙ্গেও জুটিয়েছ একই রকম একটা কলঙ্কিনীকে।'

কানে হেডফোন থাকায় কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে কপ্টারের সমস্ত যাত্রী। থেলমা চেঁচিয়ে উঠল, 'মুখ সামলে কথা বল্, কুত্তার বাচ্চা! নইলে তোকে আমি নিজ হাতে খুন করব!'

'দুঃখিত, জীবনে খুন যা করার ইতিমধ্যেই সব করে ফেলেছ তোমরা,' বলল রানা। 'আর কাউকে মারার সুযোগ পাবে না কোন দিন।'

'সেটা সময়ই বলে দেবে, রানা,' বলল কার্ন।

'হ্যাঁ, সময়,' হাসল রানা। 'এই মুহূর্তে ওটারই বড্ড অভাব তোমাদের।'

'কী বলতে চাইছ?' সতর্ক হয়ে উঠল কার্ন।

'তোমার পাইলটকে জিজ্ঞেস করো তো, টেকঅফের সময় সবকিছু ঠিকমত চেক করে উঠেছে কি না? বিশেষ করে ইঞ্জিনের ভিতরটা?'

'কী!'

‘ওফ্‌ফো, চেকলিস্টে তো ইঞ্জিন খুলে দেখার কিছু থাকে না—সেটা মনেই ছিল না।’

‘কী হয়েছে ইঞ্জিনের?’ শঙ্কিত গলায় জানতে চাইল কার্ন।

‘ইয়ে... কী আর বলব, তোমার আরেকটু সতর্ক হওয়া দরকার ছিল, ডিয়ার ফ্রেডারিখ!’ কপট সুরে বলল রানা। ‘আফটার অল, তোমার মনে রাখা উচিত ছিল—আমাদের সঙ্গে একজন ইঞ্জিনিয়ার আছে, যে জাহাজ-সাবমেরিন থেকে শুরু করে গাড়ি-অ্যারোপ্লেন পর্যন্ত সব ধরনের ইঞ্জিনের ওপর তুলনাহীন জ্ঞান রাখে, এক কথায় সুপার বিশেষজ্ঞ।’

‘ববি মুরল্যান্ড! কী করেছে সে?’

‘তেমন কিছু না, ইঞ্জিনে সামান্য কারিগরি ফলিয়েছে ও—যাতে টেকঅফ করার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বিকল হয়ে যায় ওটা। উড়ন্ত অবস্থায় ক্রটিটা মেরামতের কোনও সুযোগ নেই, আর আমার হিসেব বলছে—এই সময়ের ভিতর তুমি এমন এক জায়গায় পৌঁছেছ, যেখানে ত্রিসীমানায় ল্যান্ড করার মত কোনও জায়গা পাওয়া যাবে না। ঠিক বলেছি?’

‘তুমি... তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ, মাসুদ রানা!’ মুখে বলছে বটে, কিন্তু কথাটা মিথ্যে বলে কার্ন নিজেও বিশ্বাস করছে না।

‘ধাপ্পা কি না, তা এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে,’ হাসল রানা। ‘বাই দ্য ওয়ে, টাইমিং আর ওই সময়ে হেলিকপ্টারটা কতটুকু ডিসট্যান্স কাভার করবে, সেটা কিন্তু খুব হিসেব করে বের করা। যতকিছুই হোক, ক্র্যাশের পর যদি কোনওভাবে প্যান্ডোরা বক্সটার ড্যামেজ হয়, তাতে যেন সি-এম্প্রেস বা মেইনল্যান্ডের কাছাকাছি রেডিয়েশন না পৌঁছে—সেটা মাথায় রাখতে হয়েছে আমাদের।’

‘না-আ! তুমি মিথ্যে হুমকি দিচ্ছ, রানা! এই কাজ তুমি...’

‘করেছি, কার্ন। করতে বাধ্য হয়েছি,’ এবার রানার গলা কঠিন হয়ে উঠল। ‘আমাকে আরও ভালমত স্টাডি করা উচিত ছিল তোমার। নরপশুদের আমি কখনও ছাড় দিই না, এটা জানতে

পারতে তা হলে। রোজালিন গুডজনসেনের মত নিরীহ একজন বৃদ্ধাকে খুন করেছ তুমি, গ্রিনল্যান্ডেও প্লেন-ক্র্যাশ করিয়ে সাতজন মানুষকে খুন করেছ; তবে, বাংলাদেশের চোদ্দো কোটি মানুষকে খুন করবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তুমি সবচেয়ে বড় ভুল করেছ, কার্ন। আমার দেশকে যারা এ-ধরনের হুমকি দেয়, তাদের বেশিরভাগই কেন যেন বেঘোরে মারা পড়ে।'

মুখের ভাষা হারিয়েছে কার্ন, কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে গোঙানির মত আওয়াজ বেরুল শুধু।

রানা বলল, 'কেন ক্ষমা চাইতে বলেছি, বুঝতে পারছ এবার? তোমার সময় শেষ হয়ে এসেছে... তোমার সঙ্গী-সাথীদেরও। পোয়েটিক জাস্টিস বলতে পারো—বিমান ক্র্যাশ করিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে না? এবার হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করে নিজে মরো! আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলে তখন, তাই আমিও জানাচ্ছি—গুড বাই, ফ্রেডারিখ কার্ন! হ্যাভ আ নাইস ফ্লাইট টু হেল!'

'না-আ-আ!' চেঁচিয়ে উঠল কার্ন।

কিন্তু আর কিছু বলল না রানা, রেডিও নীরব হয়ে গেছে।

রোটরের আওয়াজ থেমে গেল এই সময় হঠাৎ করে। 'হের কার্ন!' আতঙ্কিত গলায় বলল পাইলট। 'ইঞ্জিন ফেল করেছে!'

কিছু বলতে পারল না মহাপ্রতাপশালী নিয়ো-নাৎসি, বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল শুধু।

'ফ্রেডারিখ! কিছু করো!' চেঁচাল থেলমা।

'বস! বাঁচান আমাদের!!' নুয়েনডর্ফও গলা মেলাল।

কিন্তু কারও কিছু করার নেই, অমোঘ নিয়তির মত সাগরের বুকে আছড়ে পড়ল হেলিকপ্টারটা। সাগরপৃষ্ঠের সঙ্গে প্রচণ্ড ধাক্কায় ফিউজলাজ দুমড়ে-মুচড়ে গেল, ফেটে গেল সব কাঁচ। কিছুক্ষণের জন্য ভেসে রইল ধ্বংসাবশেষটা, তবে দ্রুতবেগে পানি ঢুকতে শুরু করেছে, তলিয়ে যাবে এখনই।

বাল্কহেডের সঙ্গে বাড়ি খেয়ে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে কার্ন,

পায়ে পানির স্পর্শ পেয়েই ধড়মড় করে উঠে বসল। তাড়াতাড়ি বের হতে হবে, ভেসে থাকতে হবে যতক্ষণ সম্ভব, হয়তো উদ্ধারের একটা ব্যবস্থা হয়েও যেতে পারে। অবশ্য সে-আশা খুব ক্ষীণ, রানা বুঝেশুনেই ক্র্যাশ করিয়েছে ওদের, কোনও রকম রেসকিউ পার্টি আসতে পারবে না। তারপরও চেষ্টা করতে দোষ কী?

দুর্বল বোধ করছে কার্ন, হাত বাড়াতে গিয়ে তাতে ছোপ ছোপ রক্ত দেখতে পেল, আহত হয়েছে নিশ্চয়ই। পাশে ঘড়ঘড় করে বিশ্রী একটা জান্তব শব্দ শুনে মুখ ঘোরাতেই চমকে উঠল—থেলমা মারা যাচ্ছে। এ কী অবস্থা মেয়েটার! নাক-কান-মুখ... এমনকী চোখের মণির চারপাশ দিয়েও রক্ত বেরোতে শুরু করেছে অঝোর ধারায়! সামনে তাকাতেই পাইলট আর নুয়েনডর্ফেরও একই দশা দেখতে পেল।

ভয়ার্ত দৃষ্টিতে মেঝের দিকে নজর ফেরাল কার্ন। নিরীহদর্শন প্যান্ডোরা বক্সটা পড়ে আছে ওখানে, একদিকে কাত হওয়া অবস্থায়—মাঝখানটায় ছোট্ট একটা ফাটল! সম্ভবত কপ্টারটা আছাড় খাওয়ার সময় কিছুর সঙ্গে বাড়ি খেয়ে চিড় ধরেছে ওখানটায়।

নিজের মুখের ভিতর রক্তের লোনা স্বাদ অনুভব করল নব্য ফ্যাসিবাদের স্বপ্নদ্রষ্টা, চোখের সামনেও নেমে আসছে লাল একটা পর্দা। তীব্র আতঙ্কে সিটের ভিতর সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করল ফ্রেডারিখ কার্ন, পারল না। যেটুক সেঁধাল, সেটা শরীরের প্রতিটা ফুটো থেকে বেরিয়ে আসা থইথই রক্তে।

একটু পরেই চারটে মৃতদেহ থেকে বেরিয়ে আসা রক্তের রং ফিকে হতে থাকল, লোনা জল এসে মিশে যাচ্ছে ওগুলোর সাথে। ধীরে ধীরে অতল সমুদ্রে তলিয়ে গেল হেলিকপ্টারটা।

ওদের সবার জন্য কেবিন বরাদ্দ করা হলো। একে একে ঘুমোতে গেল সবাই। কমিউনিকেশন রুম থেকে সবার শেষে বেরোল রানা।

লিয়াকে করিডরে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো রানা। বিস্মিত গলায় বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে যে? ক্যাপ্টেন এখনও কেবিন দেননি? বিশ্রাম নিচ্ছ না কেন?'

'দিয়েছেন, কিন্তু সবার আগে বিশ্রাম দরকার তোমার,' বলল লিয়া। 'চলো আমার কেবিনে।' রানার বামহাতের তালুতে নিজের ডানহাতের তালু রাখল লিয়া, আঙুলের ফাঁকে আঙুলগুলো ভরে মুঠি পাকাল শক্ত করে।

'কী ব্যাপার?' ভুরু নাচাল রানা, 'গ্রেপ্তার করছো মনে হচ্ছে?'

'তাই তো করছি,' হাসল লিয়া। টানল রানাকে নিজের কেবিনের দিকে। হঠাৎ ওর কোমর জড়িয়ে ধরে গভীর একটা চুমো খেল ঠোঁটে। চুমো খেতে খেতে হাঁটছে ওরা, পায়ে পা জড়িয়ে যাচ্ছে।

'আরে!' একটু সুযোগ পেয়ে আপত্তি জানাল রানা, 'এ মেয়ে তো বিশ্রামের নাম করে খাটিয়ে মারবে বলে মনে হচ্ছে! তুমি যদি...' আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, থেমে গেল মোড় ঘুরেই সিলভিয়াকে দেখে—নিজের কেবিনের দরজা খুলে মুখ বের করেছে বাইরে।

ওদের ওই বেসামাল অবস্থায় দেখে লিয়ার দিকে চেয়ে ভুরু কোঁচকাল বক্সার রাঁধুনি, তারপর হাসল, 'আজও পথ ভুল করছ না তো, মেয়ে?'

'না, সিলভিয়া,' রানার ঠোঁটে আরও একটা চুমো দিয়ে গাঢ় স্বরে বলল লিয়া, 'আজ আমি ঠিক পথই বেছেছি।'

(শেষ)

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যস
মজার আলোচনা, মতামত, কোনও রো
অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক
বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কা
পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম ব
বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠি
আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন: স্থ
হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হ গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা. আ. হোসেন।

এ.এইচ. রাকিন, ২৫২ (৫মতলা), আমতলা, উঃ শাহজাহানপুর, ঢাকা। মোবা: ০১৯১৬-০৩৫৮১২

আমার সালাম ও শ্রদ্ধা নিবেন। আমি আপনার দশ বছরের পুরনো ভক্ত। কিছুক্ষণ আগে 'জলরাক্ষস' পড়লাম। যেহেতু বরফের কাহিনি আমার প্রিয়, তাই এই বইটিও ভাল লেগেছে। প্রচ্ছদও আসাধারণ হয়েছে। আমি রানার ভক্তদের সাথে বন্ধুত্বে আগ্রহী।

✯ আশা করি অনেকেই আপনার সঙ্গে বন্ধুত্বে আগ্রহী হবেন।

মোঃ শাওন হোসেন (রাজু), বোয়ালমারী পোঃ অঃ সংলগ্ন, থানা ও পোস্ট: বোয়ালমারী, ফরিদপুর। মো: ০১৭১৭-৯৮২০২৩

ভাল লাগার কিছুকে যুক্তি-তর্কের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোটা বড্ড কঠিন মনে হয় আমার কাছে। আর তাই কেউ যখন প্রশ্ন করে, কেন মাসুদ রানার বই পড়ি, এটা না বলে পারি না—কেন পড়ব না তা-ই বলুন না!

মনে পড়ে ২০০৩ সালের কোনও একদিন আমার প্রিয় বন্ধু আব্দুল্লাহ আল কাফি আমার হাতে তুলে দিয়েছিল রানা সিরিজের চমৎকার একটি বই অনুপ্রবেশ-১ ও ২। ভাল লেগে গেল। সেই থেকে আজ অবধি মাসুদ রানার বই আমার সঙ্গী। কারণ তারুণ্যের প্রেরণা তো মাসুদ রানার মাঝেই, তাই না?

জানুয়ারীর ২২ তারিখে হাতে পেলাম হৃদয় পাগল করার মত আরও একটি রানার নতুন বই মৃত্যুশীতল স্পর্শ-১। আবারও পুরানো সেই রানাকে ফিরে পেলাম মনের কাছে, বইয়ের মাঝে। ধন্যবাদ কাজীদা আপনাকে, চমৎকার প্রচ্ছদ-এর জন্য ইসমাইল আরমান ভাইকে, প্রিয় চরিত্র রানাকে, সেবাকে এবং সেবার সব্বাইকে।

✯ আমাদের সব্বার তরফ থেকে আপনাকেও ধন্যবাদ।

মাসুদ রানা

মৃত্যুশীতল স্পর্শ-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

পাঠক, তৈরি হোন রুদ্ধশ্বাস কাহিনির শেষটুকু জানার জন্য।
রুদ্র প্রকৃতি, ভয়ঙ্কর শত্রু আর নিশ্চিত মৃত্যুকে
কীভাবে ফাঁকি দেয় মাসুদ রানা, দেখতে চান? খোলস ভেঙে
লিয়া নোভাক আর দেজান জুরকিচের ভিতরে উঁকি দেবেন?
এয়ারশিপ আর সাবমেরিনের মধ্যে
টাগ-অভ-ওয়ার দেখেছেন কখনও?
স্যাটানস ফিস্ট, রাসপুটিন আর প্যান্ডোরা প্রজেক্টের
আসল রহস্য জানতে চান?
শত্রুদের বিরুদ্ধে রানার নির্মম প্রতিশোধ? আছে তো!
এসবের মধ্যে প্রমোদতরীতে পোপের ধর্মীয় মহাসম্মেলন
আসে কীভাবে? আরে, শেষ লড়াইটা তো ওখানেই!
পাতায় পাতায় চমক, সাসপেন্স আর পাগল করে দেয়া
অ্যাকশন—আছে সবই। নেই শুধু দম ফেলার ফুরসত।
সাবধান! তাই বলে শ্বাস নিতে ভুলবেন না আবার!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০